আল্লামা তাকী উসমানী

ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা

অনুবাদ
আবু সালেহ্ মুহাম্মদ তোহা
দাওরায়ে হাদীস,কামিল (ফিক্বহ্),বি,এ,(সম্মান) এম, এ.
এম, ফিল ফেলো,রা,বি।

আল-কাউসার প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার
১১, বাংলাবাজার
ফোন- ৭১৬৫৪৭৭

পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০, বাংলাবাজার ঢাকা
মোবা ০১৭১৬৮৫৭৭ ২৮

প্রকাশক

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
বাসা-২১৭, ব্লক "ত"
মিরপুর ১২, পল্লবী, ঢাকা
ফোনঃ ৯০০৯৫২৯
মোবাঃ ০১৭১-৩৯ ১৬ ৯৭

প্রকাশকাল
মার্চ ২০০৩ ইং

মূল্য
২০ টাকা মাত্র

অক্ষর বিন্যাস
আল-আমীন কম্পিউটার্স
৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট
৪র্থ তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রিন্টিং ঃ
মুহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস.
লালবাগ-ঢাকা

প্রসঙ্গ কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى -

বর্তমান বিশ্বে ব্যবসা বাণিজ্যর নিত্যনতুন পদ্ধতি ও তার নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বব্যাপী গবেষণা চালিয়ে এগুলোর বিভিন্ন সমাধান পেশ করা হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে অর্থনীতি ও বাণিজ্য একটি স্বতন্ত্র বিদ্যায় পরিণত হয়েছে। আল্লাহ্ পাকের শুকরিয়া, পশ্চিমা বিশ্বের চাপিয়ে দেয়া অর্থ ব্যবস্থার ত্রুটি থেকে মুক্তি পেতে অর্থনীতিকে ইসলামী ধারায় প্রতিষ্ঠিত করার অনুভূতি বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে।

ব্যক্তিগতভাবে অনেক দ্বীনদার মুসলমান নিজের কারবার যথা সম্ভব ইসলামী শিক্ষার আলোকে পরিচালনা করতে আশাবাদী। সমষ্টিগত ভাবেও বিভিন্ন দেশে অর্থনীতিকে ইসলামী আহকাম অনুযায়ী পরিচালনা করার প্রচেষ্টা চলছে; উভয় চেষ্টা সফল করতে কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইসলামী ফিক্বহর দূরদর্শী আলেমের পথনির্দেশনা একান্ত জরুরী। কিন্তু পশ্চিমা আধিপত্যের যুগে ওলামা ও আধুনিক শিক্ষিতদের মাঝে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে। উভয়ের চিন্তাধারা ও ভাষা-পরিভাষা ভিন্নতর। এজন্য এ সমস্যাগুলো নিয়ে পারস্পারিক আলোচনা ও উপকৃত হওয়ার কোন পথ নেই। কমপক্ষে অর্থনৈতিক সমস্যায় এই বিভেদ দূর করা, উভয় স্তরের মধ্যে পরস্পরকে কাছাকাছি করার ও আলোচনা সমালোচনার পথ খোলার জন্য مركز الاقتصاد الاسلامى মারকাযুল ইক্বতেসাদুল ইসলামী নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে দারুল উলুম করাচীর সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ব্যবসায়ী, শিল্পী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অর্থনীতির অন্যান্য শাখা-প্রশাখার ব্যক্তিবর্গের জন্য বেশ কিছু কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রচলিত ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত লেনদেনের ব্যাপারে ইসলামের মৌলিক আহকামের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর মেহেরবাণীতে কোর্সগুলো যথেষ্ট সফল হয়েছে। অনেক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কোর্সগুলোতে অংশগ্রহণ করে নিজ নিজ শাখার ইসলামের মৌলিক আহকাম সম্পর্কে অবগত হয়েছেন।

বেশ কিছু কোর্স ওলামায়ে কিরাম ও ফতওয়ার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের

জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা, সমকালীন কারবারের বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রকৃতির উপর আলোচনা করা হয়েছে। কোর্সের মূল উদ্দেশ্য ছিল-অর্থনীতি ও বাণিজ্যে ফিক্বহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত অংশগুলির শরয়ী সিদ্ধান্ত খুঁজে বের করা। প্রাথমিক অভিজ্ঞতার পর নিজেই এই কোর্সের দায়িত্ব নিলাম। আমাকে সহায়তা করেছেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাবেক চীফ অর্থনীতিবিদ বন্ধুবর জনাব আরশাদ জামান সাহেব ও চার্টার্ড একাউনটেন্স এর চেয়ারম্যান বন্ধুবর জনাব সাইয়েদ মুহাম্মদ হুসাইন সাহেব।

আল্লাহর ফজলে তাঁদের সহযোগিতায় সফলতার সাথে কোর্স শেষ হয়েছে। প্রথমে কোর্সকে দারুল উলুম করাচীর শিক্ষক মণ্ডলী ও উচ্চতর গবেষণা বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছিল।

ফায়সালাবাদের মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ মুজাহিদ সাহেবও (দা. বা) কোর্সে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুরা কোর্সকে টেপরেকর্ডারের সাহায্যে ধারণ করে লিখে সংরক্ষণ করেছেন।

পরবর্তী বছরে কোর্সকে আরো ব্যপক করা হয়েছে। সারা দেশের বিজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম অংশগ্রহণ করেছেন। কোর্স শেষে পরীক্ষা নিয়ে সনদও প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় কোর্সকে পূর্বের অভিজ্ঞতা ও নতুন অবস্থাদীর আলোকে প্রত্যেক পাঠে সংশোধন ও সংযোজন করার সুযোগ হয়েছে। কোর্স শেষে বন্ধুমহল থেকে কোর্সের আলোচিত বিষয়বস্তুকে কিতাব আকারে প্রকাশ করার জন্য ব্যাপক আবেদনের প্রেক্ষিতে মুফতি মুজাহিদ সাহেবের লিখিত পাণ্ডুলিপি দ্বিতীয় দফা সংযোজন ও বিয়োজন করে প্রকাশ করা হল। বিভিন্ন ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিক্বহ্‌য় সরাসরি কোন সিদ্ধান্ত না পাওয়ায় নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা পেশ করেছি। এটিই ফতওয়া বা শেষ কথা নয় বরং বিজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের জন্য এ ব্যাপারে চিন্তা ও গবেষণার পথ উন্মোচন করাই উদ্দেশ্য।

পাঠকমহল বইটি পড়ে সামান্য উপকৃত হলেও আমি আমার মেহনতকে সার্থক মনে করবো।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে দ্বীনের সঠিক বুঝ প্রদান করুন এবং আমল করে পৃথিবীতে তা বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

মুহাম্মদ তাকী উসমানী
দারুল উলুম করাচী-১৪
পাকিস্তান

অনুবাদকের কথা

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

অর্থনীতি একটি জটিল বিষয়। প্রতিটি মানুষ অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত। অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হওয়ার জন্য সবাই দিনরাত অবিরাম পরিশ্রম করে যাচ্ছে। কেয়ামতের ময়দানে অর্থনৈতিক বিষয়ে দুটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া ছাড়া এক ধাপও সামনে যেতে দেয়া হবে না।

জিজ্ঞাসা করা হবে- কিভাবে উপার্জন করেছ আর কোথায় খরচ করেছ?

১৯৯৮ সালে বগুড়া জামিল মাদরাসায় জামাতে উলায় (মিশকাত) পড়া অবস্থায় শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মাওলানা আব্দুল হক হাক্কানী সাহেব (দা. বা) অর্থনীতির ক্লাসে অর্থনীতির বিভিন্ন দিক সমস্যা ও ইসলামী সমাধান নিয়ে বিভিন্ন মুখী আলোচনা করতেন। সেখান থেকেই অর্থনীতির প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করি। শিক্ষাবর্ষের শেষ প্রান্তে তিনি "ইসলাম আওর জাদীদ মায়ীশত ওয়া তিজারত" নামক গুরুত্বপূর্ণ বইটি আমার হাতে তুলে দেন। তাৎক্ষণিক অবশ্য বইটি পড়ার সুযোগ হয়ে উঠেনি। ২০০০ সালে ঢাকায় মাদরাসা দারুর রাশাদে "ইদারাতুল মাআরিফ বিভাগে" ভর্তি হওয়ার পর বইটি পড়া আরম্ভ করি। এক পর্যায়ে অনুবাদ করার প্রবল ইচ্ছা জাগে। বিভাগের নাযীম মাওলানা লিয়াকত আলী সাহেবের সাথে পরামর্শ করে ২৮/০৭/২০০০ শুক্রবার অনুবাদের কাজ আরম্ভ করি।

এ বিষয়ে জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে অল্পতেই হোঁচট খাই। বিভিন্ন বইয়ের সহায়তা নিয়েও অগ্রসর হতে দারুন কষ্ট অনুভব করি। এক পর্যায়ে বিচলিত হয়ে রেখে দেই।

২০০১ সালে জামেআ রহমানিয়া রাজশাহী মাদরাসায় খিদমতের সুযোগ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর আবারো অনুবাদের কাজ আরম্ভ করি। ২৫/০৩/২০০২ সোমবার অনুবাদ শেষ হয়েছে। ঘটনা ক্রমে দিনটি ছিল ১০ই মুহাররম

১৪১৩ হিঃ। আল কাউসার প্রকাশনার সত্ত্বাধিকারী মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেবকে ব্যাপারটি অবিহিত করলে তিনি প্রকাশনার ইচ্ছা ব্যাক্ত করেন।

বইটি অনুবাদের ক্ষেত্রে আরবী ও ইংরেজী পরিভাষার সাথে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত পরিভাষা উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তান ভিত্তিক আলোচনার সাথে বাংলাদেশের অবস্থাও সংযোজন করা হয়েছে। পাঠক, পাঠিকাগণ বইটির দ্বারা সামান্য উপকৃত হলেও আমি আমার দীর্ঘ শ্রমকে সার্থক মনে করবো। বইটি নির্ভুল করার চেষ্টায় ত্রুটি করিনি। এরপরও জ্ঞানের স্বল্প পরিসরে ভুলভ্রান্তি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সে সম্পর্কে অবগত করলে কৃতজ্ঞ থাকবো। শ্রদ্ধেয় উস্তাদ যিনি বইটি হাতে তুলে দিয়েছেন, যারা বিভিন্ন ভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, যিনি প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছেন আমি সকলের কাছে চির কৃতজ্ঞ।

আল্লাহ্ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। পরিশেষে সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা তিনি যেন অধমের এই নগন্য খিদমত টুকু কবুল করেন। আমীন।

বিনয়াবনত

০১.০৭. ২০০২ ইং
জামিআ রাহমানিয়া
শিরোইল কলোনী, রাজশাহী-৬১০০

আবু সালেহ্ মুহাম্মদ তোহা
শান্তনীড়,গালিম পুর
বাগাতী পাড়া
নাটোর ৬৪১০

মোবাইল ০১৭১ ৮৬ ৭৭ ৭ ২ ১

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ও সর্ব প্রথম দ্বীনি বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম-এর পরিচালক

আল্লামা আহমদ শফি সাহেব (দা.বা.) এর

দোআ

মুফতী তকী উসমানী (দাঃবাঃ) এর লিখিত اسلام اور جديد معيشت وتجارت বইটি বর্তমান সমাজে অত্যান্ত প্রয়োজনীয়। আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র আবু সালেহ মুহাম্মদ তোহা বইটির অনুবাদ করেছে। বইটির দ্বারা বাংলাভাষা ভাষী সর্বস্তরের জনগণ উপকৃত হবে বলে মনে করি। আল্লাহপাক তার এই খেদমতকে কবুল করুন।

আহমদ শফি

০১/০৫/২০০২ ইং

বেফাকুল মাদ্‌রিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (বাংলাদেশ কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড)-এর মহাসচিব মাওলানা আবদুল জববার সাহেব (দাঃবাঃ) এর

অভিমত

নাহমাদুহু ওয়া নুছল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম

অর্থনীতির উপর চর্চার পরিমানটা খুবই কম হয়েছে। কারণ দীর্ঘদিন যাবত বিশ্বে কোন ইসলামী রাষ্ট্র বিদ্যামান নাই ফলে ইসলামী অর্থনীতির চর্চাও নাই। বিশ্বে বর্তমানে প্রভাবশালী অর্থনীতি হচ্ছে পাশ্চাত্যের সুদ ভিত্তিক পূঁজিবাদী অর্থনীতি। যা মুসলিম বিশ্বকেও গ্রাস করে রেখেছে। পূঁজিবাদী অর্থনীতির শোষণ থেকে বাঁচার জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিক প্রতি ঝুঁকে নিয়েছিল বিশ্ব। এখন বিশ্ব ইসলামী অর্থনীতির প্রতি আকৃষ্ট হতে চলেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ইসলামী অর্থনীতি বিষয়টি অধ্যয়ন চর্চা গবেষণা করার মত পর্যাপ্ত বই পুস্তক প্রণীত হয় নাই। যৎকিঞ্চিত যা হয়েছে তাও আরবী ভাষায়। ইদানিং উর্দূ ও বাংলায় কিছু কিছু তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের একজন খ্যাতনামা ফকীহ্ গবেষক পাকিস্তানের জাষ্টিস মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী ইবন মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী উসমানী (রহঃ) অর্থনীতির মোকাবেলায় ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা "ইসলাম আওর জাদীদ মায়ীশাত ও তিজারত" নামে একখানা পুস্তক প্রণয়ন করে বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী পুস্তকের বাংলা অনুবাদ পেশ করার উদ্যোগ নিয়েছেন নবীন লেখক জামেয়া রহমানিয়া রাজশাহীর শিক্ষক মাওলানা আবু সালেহ মুহাম্মদ তোহা। নবীন হলেও লেখক তার চেষ্টা ও সাধনায় বইটির সফল অনুবাদ পেশ করতে অনেকখানি সক্ষম হয়েছেন বলে আমার মনে হল।

বইটি বাংলা ভাষাভাষী ইসলামী অর্থনীতির পাঠকবর্গের নিকট বিশেষভাবে কওমী মাদরাসার গ্রাজুয়েশন ডিগ্রির ইসলামী অর্থনীতির সিলেবাসের সহায়ক হবে বলে সন্দেহ নেই।

আহকার মুহাম্মদ আবদুল জব্বার
মহাসচিব
বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ
(বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড)
৮৯/১/ই, নয়াপল্টন, ঢাকা-১১০০

২/১১/০২ইং

তানযীমুল মাদারিসীদ্দীনিয়া আল কুওমীয়া বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান, বেফাকুল মাদারিসীল আরাবিয়া বাংলাদেশ ও ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশ-এর ভাইস চেয়ারম্যান, আল জামেয়াতুল ইসলামীয়া কাসেমুল উলুম জামিল মাদ্‌রাসার পরিচালক আল্লামা ইউসুফ নিজামী সাহেব (দা ঃ বাঃ) এর অভিমত

ইসলাম লেনদেন ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি বৈধভাবে সম্পাদন করার ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফে এ গুলোর মূলনীতি সমূহ বর্ণিত হয়েছে। ফিক্বাহর কিতাব সমূহে সুবিন্যস্তভাবে আলোচিত হয়েছে। যুগের পরিবর্তনে অর্থনীতি বর্তমানে একটি স্বাতন্ত্র বিষয়ে পরিনত হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যের নিত্য নতুন পদ্ধতি চালু হয়েছে। কুরআন, হাদীস ও ফেক্বাহ্‌র মূলনীতি সমূহ অনুসরণ করে ইসলামী অর্থনীতির শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা, ব্যবসা বাণিজ্যের নিত্য নতুন পদ্ধতি ও এগুলোর বিকল্প ইসলামী পদ্ধতি বিশ্লেষন করা একজন আলেমের জন্য সময়ের দাবী। আল্লামা তকী উস্‌মানী (দা. বা.) এর গবেষণা ধর্মী اسلام اور جدید معیشت وتجارت গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করে আমার স্নেহধন্য ছাত্র মাও, আবু সালেহ্ মুহাম্মদ তোহা বাংলা ভাষী মুসলমানদের সামনে উপস্থাপন করেছে যা এ অধ্যায়ে এক নতুন সংযোজন। বইটি ফজিলত শ্রেণীর অর্থনীতি বিষয়ের মূলগ্রন্থ হিসেবে অনেকটাই উপযোগী হবে এবং সন্ধিৎসু পাঠকের গবেষনার দ্বার উন্মোচন করবে বলে আমি মনে করি। আল্লাহ্‌পাক তার এই খিদমতকে কবুল করুন আমীন।

ইউসুফ নিজামী

২৬/৯/২০০২ ইং

জামেয়া শারইয়া মালীবাগ, ঢাকা-এর ভাইস প্রিন্সিপাল বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক হযরত মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া সাহেবের

অভিমত

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার যিনি মানুষের জীবন সম্ভারে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন ভু-পৃষ্ঠকে এবং দরুদ ও সালাম আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর যিনি জীবন সম্ভারের ভারসাম্য পূর্ণ বন্টন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থাকে আম্যধর্মী করে তোলার পথকে উন্মুক্ত করে গেছেন। পৃথিবী আজ পুঁজি কাজের নিয়ন্ত্রনহীন শোষনের যাতা বলে একদিকে যেমন পিষ্ট অপরদিকে সমাজতন্ত্রের সাম্যের পানি টানতে গিয়ে ব্যক্তি স্বাধীনতাও ব্যক্তি অভিলাষ পূরনের স্বাভাবিক অধিকার থেকে মারাত্মক ভাবে বঞ্চিত। অথচ ইসলাম মানুষের বৈষয়িক জীবনের জন্য যে বারসাম্যপুর্ণ অর্থনেতিক বিধান নিয়েছে। তা আত্মনিরপেক্ষ এবং দূরান্ত ভাবে ভারসাম্যপূর্ণ্য মুসলমানরা রাষ্ট্র ব্যবস্থা হারানোর ফলে মুসলিম বিশ্বের ইসলামী অর্থনীতির চর্চা না হওয়ার কারণে পৃথিবী আজ এই মহা নিয়ামত থেকে বঞ্চিত। আজ অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, সাধারন মুসলমানরা তো দূরের কথা অনেক আলেম উলামও ইসলামের অর্থনীতি সম্পর্কে একটু ধারনাও রাখেন না।

হযরত মাওলানা তকী উসমানী (মদ্দাঃ) এযুগের একজন প্রজ্ঞাবান আলেম ও গবেষক। ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে তার বহু গ্রন্থ রয়েছে। তার اسلام اور جديد معيشت وتجارت নামক পুস্তকটি ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে একটি সুন্দর পুস্তক। আমি পুস্তকটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। আমার কাছে বইট খুব চমৎকার মনে হয়েছে। এই বইটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সামনে আসা প্রয়োজন এই অনুভুতি বইটি পাঠের সময়ই আমার হয়েছিল। রাজশাহী জামিয়া রাহমানিয়ার শিক্ষক মাওঃ আবু সালেহ মুহাম্মদ তোহা বইটির অনুবাদ করেছেন। আমি প্রান্ডলিপির বেশ কিছু অংশ পড়ে দেখেছি। অনুবাদক অর্থনীতির পরিভাষা সমূহ বেশ আয়াত করেই অনুবাদ করেছেন। প্রথম অনুবাদ হিসাবে আমি তাকে মুবারকবাদ জানাই। কোথাও কোথাও সামান্য ভাষার ছন্দপতন ও শব্দ সংযোজন এদিক সেদিক হওয়ার বিষয়টি বাদ দিলে বইটি অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদক যথেষ্ট আন্তরিকতা দেখিয়েছেন। বইটি বাংলা ভাষাভাসী পাঠকদের অর্থনীতির জ্ঞান বৃদ্ধিতে যথেস্ট গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অনুবাদককে আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের খিদমতে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আবুল ফাতাহ
২/১১/০২ইং

বিষয় পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ -

বর্তমান বিশ্বে নিত্যনতুন যে লেনদেনগুলো বিস্তার লাভ করেছে এগুলোর সাথে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যেন এগুলোর শরয়ী আহকাম বিশ্লেষণ করা যায়। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন :

مَنْ جَهِلَ بِاَهْلِ زَمَانِهٖ فَهُوَ جَاهِلٌ (شرح عقود رسم المفتى ص ৭৮)

"যে ব্যক্তি স্বযুগের মানুষের জীবন যাপন, চালচলন, রীতি নীতি, অর্থনৈতিক লেনদেন এবং মানসিকতা সম্পর্কে অবগত নয় সে মূর্খ। একজন আলেমের জন্য যেমন কুরআন ও সুন্নাহর আহকাম সম্পর্কে অবগত হওয়া জরুরী তেমনি যুগের প্রথা, রীতি-নীতি, অবস্থা সম্পর্কে জানাও জরুরী। তাছাড়া এগুলোর ব্যাপারে শরয়ী সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীতি হওয়া মুশকিল।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান শাইবানী (রহঃ) এর জীবনীতে পাওয়া যায় তিনি ফিক্বাহ্ সংকলনের সময় নিয়মতান্ত্রিক বাজারে গিয়ে ব্যবসায়ীদের পাশে বসতেন। তাদের লেনদেন বুঝতেন এবং বাজারে প্রচলিত পদ্ধতি অবলোকন করতেন। ব্যবসা করা তাঁর আদৌ উদ্দেশ্য ছিল না।

একজন আলেম ও ফক্বীহ্র জন্য এসব জানা আবশ্যক যেন এ ব্যাপারে তার কাছে প্রশ্ন করা হলে প্রশ্নের প্রেক্ষাপট বুঝে সঠিক সমাধান দিতে পারেন।

প্রেক্ষাপট জানা ছাড়া সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

এমনও বলা হয়েছে যে, যদি কোন এলাকায় নাজায়েজ কারবার বৃদ্ধি পায় তখন আলেম বা মুফতি শুধু এ কথা বলে দিলে হবে না যে, অমুক কাজটি হারাম বা না জায়েজ। বরং দায়ী হিসাবে হারাম বলার পাশাপাশি তার বিকল্প হালাল পথও বলে দিতে হবে। আবার এ বিকল্প পদ্ধতিও শরীয়তের আহকাম অনুযায়ী হতে হবে। যেমন জেল খানায় হযরত ইউসুফ

(আঃ) এর কাছে বাদশার পক্ষ থেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলার আগে স্বপ্নের মাধ্যমে যে বিপদের দিকে ইংগিত দেয়া হয়েছে তা থেকে মুক্তির পথ বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন----

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِىْ سُنْبُلِهٖ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ (سورة يوسف)

বলল : তোমরা সাত বছর উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে। অত:পর যা কাটবে, তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে তা ছাড়া অবশিষ্ট শস্য শীষ সহ রেখে দেবে। (সুরা ইউসুফ -৪৭)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল দায়ী শুধু হারামকে হারাম বা কোন বিপদের সংবাদ দিলেই হবে না বরং সাধ্যমত মুক্তির পথও বলে দিতে হবে।

এ পথ তখনই বলা সম্ভব যখন মানুষের রীতিনীতি, চালচলন ও লেনদেন সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক লেনদেন, ক্রয়বিক্রয় সম্পর্কীয় একটি পাঠ উচ্চতর ইসলামী শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে সংযোজন একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে অর্থনীতি একটি ভিন্ন বিষয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। এখানে পুরা অর্থনীতি পড়ানো বা এর বিশেষজ্ঞ করে তোলা উদ্দেশ্য নয়।

বরং একজন আলেম ও মুফতির জন্য প্রয়োজনীয় অংশটুকু অবহিত করাই উদ্দেশ্য।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়ঃ মুদ্রা (Money)

চতুর্থ অধ্যায় ব্যাংকিং (Banking)

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায় ঃ বীমা (Insurance)

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ সরকারী অর্থ ব্যবস্থা (Public Finacing)

প্রথম অধ্যায় ঃ অর্থনীতি

অর্থনীতির ব্যাখ্যা ঃ

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত বিভিন্ন অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে দুটি অর্থব্যবস্থা বেশী পরিচিত। একটি ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা (Calpitalism) যাকে আরবীতে اَلرَّأْسُمَالِيَّة বলে। অপরটি সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা (Socialisom) যাকে আরবীতে اَلْاِشْتِرَاكِيَّة বলে। যার শেষ অবস্থা কমিউনিজম (Communism) যাকে আরবীতে اَلشُّيُوْعِيَّة বলে।

পৃথিবীর সকল কারবার ও লেনদেন এ দু' অর্থব্যবস্থার মাধ্যমেই সংঘঠিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর "সোসালিজম" রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিলুপ্ত হলেও অর্থনৈতিক মতবাদ হিসেবে আজও পৃথিবীর অন্যান্য অর্থনৈতিক মতবাদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী হয়ে আছে। তাই এ অর্থব্যবস্থাকে জানাও আবশ্যক। প্রথমে এ দুই অর্থব্যবস্থার পরিচিতি তুলে ধরা হচ্ছে। এরপর এগুলোর বিপরীতে ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোকপাত করা হবে।

অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাবলী ঃ

প্রথমে অর্থনীতি ও তার মূল সমস্যাগুলো জানা দরকার। আমরা যাকে অর্থনীতি বলি, বস্তুত তা ইংরেজী (Economics) এর অনুবাদ। অর্থনীতি শব্দে ইকোনোমিক্সের বাস্তব অর্থ চিত্রায়িত হয় না। আরবী اقتصاد শব্দেই চিত্রায়িত হয় ইকোনোমিক্সের সঠিক অর্থ।

স্বীকৃত সমস্ত অর্থনৈতিক মতবাদে মেনে নেয়া হয়েছে যে, মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা উৎপাদনের উপকরণ থেকে অনেক বেশী। প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় প্রয়োজন শব্দটি বললে চাহিদা এমনিতেই এসে যায়। যাই হোক, মানুষের উপকরণ সীমিত। এর তুলনায় প্রয়োজন ও চাহিদা অনেক বেশী। এখন প্রশ্ন, এই অসীম প্রয়োজন ও চাহিদা সীমিত উপকরণ দ্বারা কিভাবে পুরা করা হবে? একতেছাদ ও ইকোনোমিক্স শব্দদ্বয়ের অর্থ হলো ঃ- ঐ উপকরণ গুলো এমন ভাবে ব্যবহার করতে হবে যেন তার দ্বারা অধিকাংশ প্রয়োজন পুরা হয়ে যায়। একারণেই এ বিদ্যাকে ইকোনমিক্স বা ইক্তেছাদ বলা হয়। এ দৃষ্টিকোন থেকে প্রত্যেক অর্থনীতিতেই কিছু মৌলিক সমস্যা আছে যার সমাধান ছাড়া কোন অর্থ ব্যবস্থাই চলতে পারে না।

সাধারণত মৌলিক সমস্যা ৪টি

১. আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ ঃ (Determination of priorities)

প্রথম সমস্যা যাকে অর্থনীতির পরিভাষায় আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ বলা হয়। এর সারমর্ম হলো মানুষের প্রয়োজন সীমিত। সীমিত উপকরণ দ্বারা প্রয়োজন ও চাহিদা পুরা করা সম্ভব না। এজন্য কিছু প্রয়োজন ও চাহিদাকে অন্যের উপর প্রাধান্য দিতে হয়। কিন্তু কোন প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

মনে করি, আমার কাছে ৫০ টাকা আছে। এ ৫০ টাকা দিয়ে চাল ক্রয় করতে পারি, কাপড় ক্রয় করতে পারি, কোন রেস্তোরায় বসে উন্নতমানের খাবার খেতে পারি। এ ৪/৫টি ইচ্ছা (Options) আমার সামনে বিদ্যমান। এখন আমি এ ৫০টাকা কোন কাজে ব্যয় করবো? একেই আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ বলে।

একজন ব্যক্তি যেমন এ সমস্যার সম্মুখীন একটি দেশ ও রাষ্ট্রও এর সম্মুখীন হয়। যেমন আমাদের দেশে কিছু প্রাকৃতিক, কিছু মানবিক, কিছু খনিজ ও কিছু নগদ উপকরণ আছে। এ সমস্ত উপকরণ সীমিত। এর বিপরীত প্রয়োজন ও চাহিদা অসীম। এখন নির্ধারণ করতে হবে যে, এ সমস্ত উপকরণ কোন কাজে ব্যয় করা হবে? এবং কোন জিনিসের উৎপাদনকে প্রাধান্য দেয়া হবে? এ সমস্যার নামই আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ।

২. উপকরণ বিভাজন (Allocation of Resourees)

দ্বিতীয় সমস্যা হলো 'উপকরণ বিভাজন' আমাদের নিকট উৎপাদনের উপকরণ আছে অর্থাৎ মূলধন, শ্রম, জমি এগুলোকে আমরা কোন কাজে কি পরিমাণ ব্যয় করবো? মনে করি, আমাদের জমি আছে। এখন কতটুকু জমিতে গম, কতটুকুতে ধান এবং কতটুকুতে তুলা উৎপাদন করবো? তেমনি আমাদের কারখানা তৈরীর সামর্থ আছে। আমরা কাপড়ও তৈরী করতে পারি, স্যান্ডেল তৈরী করতে পারি, পানাহারের দ্রব্যও তৈরী করতে পারি। এখন কয়টি কারখানাকে কাপড় তৈরীতে কয়টিকে স্যান্ডেল তৈরীতে এবং কয়টিকে পানাহার সামগ্রী তৈরীতে ব্যবহার করবো? এ প্রশ্ন নির্ধারণকে অর্থনীতির পরিভাষাতে 'উপকরণ বিভাজন' বলে।

৩. আয়ের বন্টন (Distribution of income)

তৃতীয় সমস্যা আয় বা উৎপাদনের বন্টন। অর্থাৎ উপরোল্লিখিত উপকরণগুলোকে কাজে লাগানোর পর অর্জিত উৎপাদন বা আয়কে সমাজে কিভাবে কিসের ভিত্তিতে বন্টন করা হবে? একে অর্থনীতির পরিভাষায় আয়ের বন্টন বলে।

৪. উন্নয়ন (Development)

চতুর্থ সমস্যা 'উন্নয়ন' অর্থাৎ অর্থনৈতিকউৎপাদনকে কিভাবে উন্নত করা হবে? যেন উৎপাদিত দ্রব্য মান ও পরিমাণগত দিক দিয়ে উন্নত হয় এবং কিভাবে নতুন নতুন পদ্ধতি এবং কারিগরী কৌশল আবিষ্কার করা যায়? যেন অর্থনীতির উন্নয়ন হয়, জনগণের উপায় উপকরণ বৃদ্ধি পায় এবং জনগণের আয়ের বিভিন্ন উৎস সৃষ্টি হয়। এ সমস্যাকে অর্থনীতির পরিভাষায় 'উন্নয়ন' বলা হয়। এ চারটি মৌলিক সমস্যা, প্রত্যেক অর্থব্যবস্থাতেই এগুলোর সমাধান জরুরী। অর্থাৎ

১. (প্রয়োজনের) আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ;

২. (উৎপাদন) উপকরণের বিভাজন;

৩. আয়ের বন্টন ও

৪. উন্নয়ন।

এগুলো যদিও জন্মগত সমস্যা কিন্তু নীতিগতভাবে এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা এগুলোর সমাধান অন্বেষন করা শেষ শতাব্দী গুলোতে খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে দুটি পরস্পর বিরোধী মতবাদ আমাদের সামনে এসেছে। একটি ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা (Copitalism) অপরটি সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা (Socialism)

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা
(Capitalism)

প্রথমে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে দেখবো যে, উহা কিসের ভিত্তিতে সমস্যাগুলির সমাধান দেয়ার দাবী করে? এবং তার সমাধানের জন্য কোন দর্শন পেশ করে? ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সমস্যগুলির সমাধানের একটিই মাত্র পথ। তাহলো প্রত্যেককে বাণিজ্যিক ও শৈল্পিক ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য একেবারে মুক্ত ছেড়ে দেয়া হবে এবং বেশীর চেয়ে বেশী লাভবান হওয়ার জন্য যে কোন পদ্ধতি অবলম্বনের ব্যাপারে ছাড় দেয়া হবে। এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক চারটি সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। কেননা যখন বেশী মুনাফা অর্জনই প্রত্যেকের লক্ষ্য হবে তখন প্রত্যেক ব্যক্তি অর্থনীতির ময়দানে এমন কাজ করবে সমাজে যার প্রয়োজন। ফলে প্রত্যেকটি সমস্যার পর্যায় ক্রমে সমাধান হয়ে যাবে। এখন প্রশ্ন; চারটি সমস্যা কিভাবে সমাধান হয়ে যাবে? এ প্রশ্নের উত্তরে একটু বিশাদ আলোচনা হওয়া দরকার। এজন্য নিম্নে বর্ণিত আলোচনাগুলো প্রণিধানযোগ্য

১. বস্তুত এ ধরার বুকে অনেক প্রাকৃতিক নিয়মাবলী কাজ করছে যা সর্বদা এক ধরনের ফলাফল প্রদান করে। এ নিয়মাবলীর মধ্যে যোগান (Supply) ও চাহিদাও (Demand) একটি।

বাজারে কোন দ্রব্যের বিক্রয়যোগ্য পরিমাণকে যোগান বলে। চাহিদা ক্রেতার বাজারে কোন পণ্য একটি নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় করার সামর্থ ও ইচ্ছাকে বলে। এখন চাহিদা ও যোগানের প্রাকৃতিক নিয়ম হলো বাজারে যে পণ্যের যোগান চাহিদার তুলনায় বেশী তার দাম হ্রাস পায়। আর যে পণ্যের চাহিদা যোগানের তুলনায় বেশী তার দাম বৃদ্ধি হয়। যেমন গ্রীষ্মকালে গরম বৃদ্ধি পেলে বরফ ক্রেতা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ বরফের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এখন যদি বরফের সামগ্রীক উৎপাদন অথবা বাজারজাত বরফের সামগ্রীক পরিমাণ চাহিদার তুলনায় কম হয় তবে অবশ্যই বরফের দাম বৃদ্ধি পাবে। তবে যদি সে সময় বরফের উৎপাদন চাহিদার মত বৃদ্ধি পায় তাহলে দাম বাড়বে না।

অপর দিকে শীতকালে বরফ ক্রেতা কম হয়। অর্থাৎ বরফের চাহিদা হ্রাস পায় এখন যদি বাজারে বরফের সামগ্রীক পরিমাণ তার চাহিদার তুলনায় বেশী হয় তাহলে অবশ্যই বরফের দাম কম হবে। এটা একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। যাকে যোগান ও চাহিদা নীতি (Low of Demand and Supply) বলে।

২. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার দর্শন বলে, যোগান ও চাহিদার এ প্রাকৃতিক নীতিই বাস্তবে কৃষকদের নির্ধারণ করে দেয় যে, সে কি উৎপন্ন করবে, কারিগর ও ব্যবসায়ীদেরকে নির্ধারণ করে দেয় যে সে কোন জিনিস কি পরিমাণে বাজারজাত করবে। এমনিভাবে অর্থনীতির উল্লেখিত চারটি সমস্যা অবলীলায় সমাধান হয়ে যাবে।

৩. চাহিদা ও যোগান নীতির দ্বারা আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ এভাবে হবে যে, যখন আমরা প্রত্যেককে বেশীর থেকে বেশী মুনাফা অর্জনের জন্য মুক্ত করে দেব তখন প্রত্যেকে মুনাফার জন্য এমন পণ্যই বাজারজাত করার প্রচেষ্টা করবে যার প্রয়োজন ও চাহিদা বেশী। যেন সে বেশী মুনাফা অর্জন করতে পারে।

কৃষকেরা এমন পণ্যের উৎপাদনকে প্রাধান্য দিবে বাজারে যার চাহিদা বেশী। কারিগরগণ এমন পণ্য তৈরীতে মনোযোগ দিবে বাজারে যার চাহিদা বেশী। কেননা যদি তারা এমন জিনিস বাজারজাত করে বাজারে যার চাহিদা কম তাহলে মুনাফা অর্জিত হবে না। ফলে প্রত্যেকে যদিও নিজ নিজ লাভের জন্য কাজ করছে কিন্তু চাহিদা ও যোগানের প্রাকৃতিক শক্তি তাকে সমাজের চাহিদা ও প্রয়োজন মেটাতে বাধ্য করছে। এমনকি যখন কোন দ্রব্যের উৎপাদন বাজারে বৃদ্ধি পেয়ে তার চাহিদার সমপর্যায়ে হয়ে যায় তখন সে জিনিসের বেশী উৎপাদন ব্যবসায়ী ও কারিগরের জন্য লাভজনক নয় সেহেতু তারা তার উৎপাদন বন্ধ করে দেবে ঠিক তেমনি সমাজের এমন বস্তুই উৎপাদন হবে সমাজে যার চাহিদা হবে। এমন পরিমাণে উৎপাদন হবে যার মাধ্যমে সমাজের প্রয়োজন যথাসাধ্য পূরণ হয়ে যায়। এরই নাম আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ।

৪. উপকরণের বিভাজন (Allocation of Resources) এর সম্পর্ক ও বাস্তবে অপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণের সাথে। যখন কোন ব্যক্তি সঠিকভাবে আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ করে তখন উপস্থিত উপকরণ গুলোও বিভিন্ন কাজে লাগায়। যোগান ও চাহিদার নীতি যেমন আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ করে ঠিক তেমনি উপকরনের বিভাজনের ও সমাধা করে। ফলে প্রত্যেকে নিজের উপকরণ অর্থাৎ জমি, পুঁজি, এবং শ্রমকে এমন কাজে লাগায় যেন সে ঐ সমস্ত বস্তু বাজার জাত করতে পারে যার চাহিদা বাজারে বেশি এবং বেশি মুনাফা অর্জন করতে পারে। তাই যোগান ও চাহিদার নীতি দ্বারা উপকরণের বিভাজনের সমস্যা অবলীলায় সমাধা হয়ে যায়।

৫. তৃতীয় সমস্যা হলো আয়ের বন্টন। কিছু উপকরণ কাজে লাগানোর মাধ্যমে যা উৎপাদন বা আয় হয়, সমাজে তা কিসের ভিত্তিতে বন্টন করা হবে। ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার কথা হলো উৎপাদনের উপাদান গুলোর মধ্যে বন্টন করতে হবে।

ধনতান্ত্রিক দর্শন অনুযায়ী উৎপাদনের উপাদান ৪টি ঃ

১ ভূমি ২. শ্রম, ৩. মূলধন, ৪. সংগঠন।

সংগঠন ঐ ব্যক্তি যিনি কোন কিছু উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ভূমি, শ্রম, ও মূলধন একত্রিত করেন, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন এবং উৎপাদনের যাবতীয় ঝুকি বহনসহ সত্যিকারভাবে উৎপাদন কার্য্য তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করেন। অর্থাৎ প্রত্যেকের বিনিময় তাদের চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে হবে। যার চাহিদা বেশী হবে তার বিনিময়ও বেশীহবে।

মনে করি জায়েদ একটি কাপড়ের কারখানা দিতে চাচ্ছে। যেহেতু সেই উদ্যোক্তা, তাই লাভক্ষতির ঝুকি নিয়ে উৎপাদনের উপাদান গুলি একত্রিত করার দায়িত্ব তারই। এজন্য অর্থনীতির পরিভাষায় তাকে (Entrepreneur) উদ্যোক্তা বলে। কারখানার জন্য প্রথমে জমি দরকার যদি তার জমি না থাকে তাহলে অন্যের কাছ ভাড়া নিতে হবে। এখন ভাড়া জমির যোগান ও চাহিদা অনুসারে হবে। অর্থাৎ যদি জমি ভাড়া প্রদান কারীর সংখ্যা বেশী হয় এবং সে তুলনায় গ্রহিতা কম হয় তাহলে জমিরভাড়া অবশ্যই কম হবে। এর উল্টো হলে ভাড়া বেশী হবে। তাই যোগান ও চাহিদাই জমির ভাড়া নির্ধারক। এরপর তার কারখানায় কাজ করার জন্য শ্রমিক প্রয়োজন। যাকে অর্থনীতির পরিভাষায় শ্রম বলে। তাদের মুজুরী দিতে হবে। এ মজুরী নির্ধারণ যোগান ও চাহিদার ভিত্তিতে হবে। অর্থাৎ শ্রমিকের সংখ্যা বেশী হলে শ্রমের যোগান বেশী হবে তাই তাদের মুজুরী কম হবে। কিন্তু যদি কারখানায় কাজ করার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রমিক

পাওয়া না যায় তাহলে শ্রমের যোগান কম তখন তাদের মুজুরী বেশী হবে। তাই, যোগান ও চাহিদানুসারে উভয়ের আলোচনার মাধ্যমে মুজুরী নির্ধারিত হবে।

তদ্রূপ কারখানার মেশিনারী ও কাঁচা মাল ক্রয়ের জন্য পুঁজির প্রয়োজন। ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় তাকে সুদ দিতে হবে। এ সুদের পরিমাণও চাহিদা ও যোগান অনুসারে হবে। যদি বিনিয়োগকারী বেশী হয় অর্থাৎ পুঁজির যোগান বেশী হলে সুদের হার কম আর বিনিয়োগকারী কম হলে সুদের হার বেশী হবে। এভাবে যোগান ও চাহিদার ভিত্তিতেই ভাড়া, মুজুরী এবং সুদের পরিমাণ নির্ধারিত হয় এবং কারখানার উৎপাদনের ভিত্তিতে আয়ের অবশিষ্ট্য অংশ মুনাফা হিসেবে উদ্যেক্তা পায়। তাই বুঝা গেল উৎপাদিত আয়ের বন্টনের সমস্যার সমাধানও ধনতন্ত্র অর্থব্যবস্থায় চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতেই হয়ে থাকে।

৬. চতুর্থ সমস্যা উন্নয়ন। প্রত্যেক অর্থব্যবস্থাই নিজের উৎপাদনের উন্নয়ন, এবং গুণগত ও পরিমাণগত মান বৃদ্ধির প্রতি জোর দিয়ে থাকে। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার দর্শনে এ সমস্যা ও চাহিদা ও যোগান নীতির অধিনে সমাধান হয়।

কেননা যখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে বেশীর থেকে বেশী মুনাফা অর্জনের জন্য মুক্ত করে দেয়া হবে তখন চাহিদা ও যোগানের প্রাকৃতিক নীতি এমনিতেই তাকে নতুন নতুন পণ্য ও উন্নততর কোয়ালিটি বাজারজাত করতে বাধ্য করবে। যেন তার উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা বেশী হয় এবং মুনাফা বেশী অর্জন করা যায়।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার নীতি সমূহ

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মৌলিক নীতি ৩টি ঃ

১. সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা (Private property) প্রত্যেকে ব্যক্তি মালিকানায় সম্পদ ও উৎপাদন উপকরণ রাখতে পারে। সমাজতন্ত্রে নিজস্ব ব্যবহারিক দ্রব্য ব্যক্তি মালিকানায় স্বীকৃতি হলেও উৎপাদনের উপকরণ অর্থাৎ ভূমি অথবা কারখানা স্বীকৃত নয়। কিন্তু ধনতন্ত্র অর্থব্যবস্থায় সর্বপ্রকার ব্যবহারিক দ্রব্য, উৎপাদনের উপকরণ সবকিছু ব্যক্তি মালিকানায় স্বীকৃত।

২.মুনাফা অর্জন- (Profit Motiv) ধনতন্ত্রের দ্বিতীয় মূলনীতি হলো উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে উদ্দেশ্যে কাজ পরিচালিত হয তা হলো, প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন। মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন পরিচালনা। অর্থাৎ প্রত্যেক উৎপাদন কারীর লক্ষ্য হলে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা।

৩. রাষ্ট্রের অনুপস্থিত (Laissez Faire) ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার তৃতীয় মূলনীতি হলো রাষ্ট্র ব্যবসায়ীদের ব্যবসা প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে না। সে যেভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এর মধ্যে বাধা দেয় না। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোন প্রকার

বিধিনিষেধ আরোপ করতে হয় না। সাধারণত এ নীতির জন্য LaissezFaire ব্যবহার হয়। এটি ফান্সী শব্দ অর্থাৎ রাষ্ট্রের অনুপস্থিতির পলিসি। এর অর্থ করতে দাও। অর্থাৎ রাস্ট্রকে বলা হচ্ছে যারা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে লিপ্ত আছে তারা যেভাবেই কাজ করে করতে দাও এর মধ্যে কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি করো না। রাষ্ট্রের অধিকার নাই যে, সে মানুষকে আদেশ দেবে এমন কাজ কর এমন কাজ করো না। এমন বলারও অধিকার নাই যে, এই পদ্ধতিতে ব্যবসা করো; এই পদ্ধতিতে করো না। যদিও পরবর্তীতে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে ক্রমান্বয়ে এ পলিসিকে সীমিত করা হয়েছে। "রাষ্ট্রের অনুপস্থিত" এ নীতি কখনো কার্যে পরিণত হয় নি। বরং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অনেক বাধ্যবাধকতা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় পাওয়া যাবে যেমন ট্যাক্সের মাধ্যমে অনেক বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। অথবা কোন কাজের সাহস বাড়ানোর জন্য রাষ্ট্র অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

বর্তমান বিশ্বে এমন কোন দেশ নেই যেখানে ব্যবসা বাণিজ্যে রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্তি নাই। কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল দর্শন হলো যেখানে রাষ্ট্র অনুপ্রেবেশ করতে পারবে না। বরং ব্যবসায়ীদের স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হবে। এ হিসেবেই বলা হয় যে সর্বোত্তম সরকার হলো যে স্বল্প রাজত্ব করে অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবেশ করে না। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করে বলে এর নাম ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। এর দ্বিতীয় নাম বাজার কেন্দ্রীক অর্থব্যবস্থা (Market Economy) কারণ এ ব্যবস্থায় বাজার শক্তি অর্থাৎ যোগান ও চাহিদার ভিত্তিতেই কাজ হয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা
(Socialism)

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা মুলত ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রতিরোধ কল্পে সৃষ্টি হয়েছে। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল আলোচ্চ বিষয় ছিল ইচ্ছামত মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে সবাই স্বাধীন এবং অর্থনৈতিক যাবতীয় সমস্যার মূল সমাধান যোগান ও চাহিদার উপর ভিত্তি করেই হবে। এজন্য এ অর্থ ব্যবস্থায় জনকল্যাণ ও দারিদ্র বিমোচনের কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না।

বেশী মুনাফা অর্জনের নিরিখে অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল ব্যক্তিদের নিষ্পেষণের ঘটনা অসংখ্য। যার কারণে ধনী গরীবের বৈষম্য অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজতন্ত্র এগুলো অনৈতিক আচরণ উৎখাতের দাবী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। ধনতন্ত্রের মৌলিক দর্শনকে চ্যালেঞ্জ করে একথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে যে অর্থনীতির মৌলিক চারটি সমস্যা শুধু মুনাফা অর্জন, ব্যক্তিগত মালিকানা এবং বাজারের শক্তির ভিত্তিতে সমাধান করা যেতে পারে।

সমাজতন্ত্র দাবী করে ধনতন্ত্রে সমস্ত মৌলিক সমস্যাগুলোকে চাহিদা যোগানের শক্তির প্রতি অর্পন করা হয়েছে। যেখানে মূলতঃ ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনই উদ্দেশ্য হিসাবে কাজ করে। তাদের জনকল্যাণমূলক সমস্যার চিন্তা নাই। বিশেষ করে উৎপাদনের বন্টনে এ শক্তিগুলো অনৈরাজ্যকতা সৃষ্টি করে।

যেমন ঃ শ্রমিকদের যোগান বেশী হলে, তাদের মুজুরী কম হয়। এতে অনেক সময় শ্রমিক অত্যন্ত কম মুজুরীতে কাজ করতে বাধ্য হয়। তার রক্ত ঘামানো পরিশ্রমের দ্বারা যে পণ্য উৎপন্ন হয় তা থেকে সে এতটুকু অংশও পায় না যা দিয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে আরামে জীবন যাপন করতে পারে। তার পরিশ্রমের সন্ধানকারী পুঁজিপতি কখনো ভেবেও দেখে না। যে মুজুরীর বিনিময়ে সন্ধান তার শ্রম নিচ্ছে তা তার পরিশ্রমের সমীচিন প্রতিদান ও তার প্রয়োজনাদির সঠিক পরিপূরক কি না? তার চিন্তা শুধু যোগানের বৃদ্ধিতে কিভাবে তার চাহিদা অত্যন্ত কম মুজুরীতে পুরা করতে পারবে? এতে তার মুনাফা বৃদ্ধি পাবে।

(তাই সমাজতান্ত্রিক দর্শন মতে উৎপাদনের বন্টনের জন্য যোগান ও চাহিদার ফর্মুলা এমন বোধশক্তিহীন যেখানে অসহায়দের প্রয়োজনাদির প্রতি কোন মনোযোগ নাই। বরং তা পুজিবাদীর নিজস্ব মুনাফা অর্জনের অধিনস্ত। এমনি ভাবে আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ, উপকরণের বিভাজন এবং উন্নয়নের মত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যাবলীকে ধনতন্ত্রের অন্ধও মুক যোগান চাহিদা শক্তির উপর অর্পন করা অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত আশংকাজনক। একটি তাত্ত্বিক দর্শন হিসেবে এ মতবাদ ঠিক হতে পারে যে, ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে একজন চাষী বা কারিগর তার উৎপাদন যোগান চাহিদার বরাবর না হওয়া পর্যন্ত চালু রাখবে। যোগান চাহিদার থেকে বৃদ্ধি পেলে সে উৎপাদন বন্ধ করে দেবে কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে কোন ব্যবসায়ী বা কৃষকের কাছে চাহিদানুযায়ী যোগান পরিমাপের নিখুত কোন দাড়িপাল্লা নাই। তাই তারা অনেক সময় যোগান চাহিদার তুলনায় কম মনে করে দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে থাকে। অথচ বাজারে যোগান বৃদ্ধি পেয়েছে। এদের কাছে সঠিক খবর পৌঁছতে অনেক দেরী হয়। ফলে বাজারে এসব দ্রব্যাদির আমদানি বেশী হয়ে যায়। এভাবেই অর্থনীতি পড়তি বাজারের স্বীকার হয়। যার কারণে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। অনেক ব্যবসায়ী দেওলিয়া হয়ে যায়। বিভিন্ন রকম অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই শুধু চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ সুষ্ঠ ভাবে হতে পারে না।)

প্রশ্ন হতে পারে তাহলে উল্লেখিত চারটি সমস্যার সমাধান কি? উত্তরে সামাজতান্ত্রিক দর্শন হলো মুল সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে উৎপাদনের উপকরণ জমি ও শিল্পর ব্যক্তি মালিকানার দ্বারা। অথচ সমস্ত উৎপাদনের উপকরণ ব্যক্তি

মালিকানার স্থলে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় হওয়া উচিত ছিল। এমন হলে রাষ্ট্রের জানা থাকবে দেশের মোট উপকরণ কতটুকু? সমাজের প্রয়োজন কি কি? এ ভিত্তিতেই রাষ্ট্র প্লান তৈরী করে সিদ্ধান্ত নেবে কোন প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয়া হবে? এবং কি পরিমাণ উৎপাদন করা হবে? এবং বিভিন্ন উপকরণকে কোন বিন্যাসে কোন কোন কাজে লাগানো হবে? আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ, উপকরণ বিভাজন এবং উন্নয়ন তিনটি কাজই রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে সমাধা হবে। আর উৎপাদনের বন্টন! সমাজতন্ত্রের দাবী হলো উৎপাদনের উপকরণ দুইটি। এক. ভূমি দুই. শ্রম।

ভূমির ব্যক্তিগত কোন মালিকানা নাই বরং সামগ্রীক মালিকানা। তাই এর নির্ধারিত ভাড়া বা ট্যাক্স দেয়ার প্রয়োজন নাই। এবার শ্রম, রাষ্ট্র তারপ্লান অনুযায়ী শ্রমিকদের শ্রমের সমীচীন প্রতিদানের প্রতি লক্ষ্য রেখে মুজুরী নির্ধারণ করবে। যেমন ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা উল্লেখিত চারটি মৌলিক সমস্যার ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন ও বাজারী শক্তির ভিত্তিতে সমাধান দিয়েছে। তেমনি সমাজতন্ত্র চারটি সমস্যার সমাধানে একটি মাত্র মৌলিক উত্তর প্রদান করেছে অর্থাৎ পরিকল্পনা, সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থাকে পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা (Planned Economy) আরবীতে اقتصاد موجهة। বলা হয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূলনীতিসমূহ

সমাজতন্ত্রের উল্লেখিত দর্শনের ফলশ্রুতিতে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল নীতি সমূহ নিম্ন রূপ

১. সংঘবদ্ধ মালিকানা (Collective Property)

উৎপাদনের উপকরণ অর্থাৎ জমি এবং কারখানা ইত্যাদিতে কোন ব্যক্তির নিজস্ব মালিকানা নাই। বরং সবকিছু জাতীয় মালিকানায় থাকবে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় চলবে। ব্যক্তিগত ব্যবহারিক সামগ্রী ব্যক্তি মালিকানায় হতে পারে। কিন্তু উৎপাদন উপকরণের উপর কোন ব্যক্তির মালিকানা থাকবে না। নির্ভেজাল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শুধু জমিও কারখানা নয় বরং বাণিজ্যিক দোকান সমূহও কোন ব্যক্তি মালিকানায় থাকে না। এতে কর্মরত কর্মচারী রাষ্ট্রের চাকর, অর্জিত সকল আয় রাষ্ট্রের কোষাগারে জমা হয় এবং কর্মরত চাকরদের বেতন রাষ্ট্রের পরিকল্পনা মাফিক দেয়া হয়।

২) কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা (Planning)

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার দ্বিতীয় মুলনীতি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা। এর অর্থ অর্থনৈতিক সমস্ত মৌলিক সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হয়। এ পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদিও উপাদান উপকরণের সংখ্যা একত্রিত করা হয় এবং কোন উপকরণ কোন উৎপাদনে লাগানো হবে, কি পরিমাণ উৎপাদন

করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা হয়। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার চিন্তা বস্তুত সমাজতন্ত্রই উপস্থাপন করে ছিল। ক্রমান্বয়ে ধনতান্ত্রিক দেশ সমুহও আংশিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। দেশের ব্যবসা ও অর্থনীতিতে কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করতে হয়েছে। এক পর্যায়ে মিশ্র অর্থব্যবস্থা Mixed Economy নামে নতুন এক পরিভাষা জন্ম হয়েছে। অর্থাৎ যদিও মৌলিক ভাবে অর্থনীতি বাজারের শক্তির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় কিন্তু প্রয়োজনের তাকিদে ব্যবসা ও শিল্পের কিছু শাখা সরকারী তত্ত্বাবধানেও হতে পারে যেমন কিছু কিছু ধনতান্ত্রিক দেশে রেলগাড়ী, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, বিমান ইত্যাদি সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। আর যে সব ব্যবস্থা ব্যক্তিগত ভাবে চালানো হয় রাষ্ট্র এগুলোর মধ্যেও কিছু নিয়মনীতি নির্ধারণ করে দেয়।

প্রথম প্রকারের ব্যাবসাকে Public Sector দ্বিতীয় প্রকারকে Private Sector বলে। মিশ্র অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রের আংশিক অংশগ্রহণের কারণে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করতে হয়।সাধারণত ৫ বৎসর মেয়াদী পরিকল্পনা তৈরী করা হয়। কিন্তু ইহা আংশিক পরিকল্পনা। অপরদিকে সমাজতন্ত্রের পরিকল্পনা পূর্ণ অর্থাৎ প্রত্যেক সিদ্ধান্তই পরিকল্পনার অধীনে হয়ে থাকে।

৩. সমষ্টি গত মুনাফা (Collective Interest)

সমাজতন্ত্রের তৃতীয় মুলনীতি সমষ্টিগত মুনাফা। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সকল কারবার ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের অধীনে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের পরিকল্পনার অধীনে সমষ্টিগত মুনাফাকে মৌলিক ভাবে দেখা হয়।

৪. আয়ের সুষম বন্টন (Equitable Distribution of Income)

সমাজতন্ত্রের চতুর্থ মূলনীতি হলো উপকরণ দ্বারা অর্জিতপণ্য সকলের মধ্যে ন্যায় পরায়ণতার সাথে বন্টন হতে হবে। ধনী গরীবের মাঝে বেশী পার্থক্য থাকবে না। উৎপাদনের মাঝে সমতা থাকবে। প্রথমে দাবী করা হয়েছিল সমাজতন্ত্রে উৎপাদন সমান হবে অর্থাৎ সবার আয় সমান হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এমন হয় না। মানুষের বেতন কম বেশী হয় এবং অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

উভয় অর্থব্যবস্থার বিস্তারিত আলোচনা

সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র উভয়ের মধ্যে শতাব্দী কাল থেকে বিরোধ চলে আসছে চিন্তার জগতে উভয়ের মধ্যে আলোচনা সমালোচনার বাজার উত্তপ্ত হয়েছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটেছে। উভয়ের মধ্যে যে সমালোচনা হয়েছে এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করলে একটি লাইব্রেরী ভর্তি হয়ে যেত। এখানে সমস্ত আলোচনার আলোকপাত সম্ভব নয় তবুও সংক্ষিপ্তাকারেউভয় ব্যবস্থার মৌলিক কিছু আলোচনা করা হলো।

সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার ব্যাখ্যা

প্রথমে সমাজতন্ত্রের আলোচনা এজন্য সমীচীন যে, এর ক্ষতির দিকগুলো বুঝা তুলনা মুলক সহজ। সমাজতন্ত্রের এতটুকু কথা অবশ্যই সত্য যে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের স্বাধীনতা দেয়ার ফলে জনকল্যাণের কোন চেতনাই অবশিষ্ট নাই অথবা থাকলেও খুবই কম। কিন্তু সমাজতন্ত্র এর যে সমাধান পেশ করেছে এককভাবে তা অত্যন্ত পছন্দনীয়। কারণ ধনতন্ত্র অর্থব্যবস্থা ব্যক্তিকে যেমন স্বাধীনতা এবং লাগানহীনভাবে ছেড়ে দিয়েছে। এতে ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের জন্য যা ইচ্ছা করা যাবে। এর বিপরীতে সমাজতন্ত্র ব্যক্তিকে এমন নীচে নামিয়েছে যার দ্বারা সৃষ্টিগত স্বাধীনতাও নিঃশেষ হয়ে গেছে। ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা বাজারী শক্তি অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানকে সমস্তসমস্যার সমাধান হিসেবে স্থির করেছে কিন্তু সমাজতন্ত্র এ প্রকৃতির নীতিকে অস্বীকার করেছে। সরকারী পরিকল্পনাকে প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা স্থির করেছে অথচ মানুষের তৈরী পরিকল্পনা সর্বদা কাজে আসে না। অনেক ক্ষেত্রে এর ফলাফল কৃত্রিম প্রেমাস্পদ ছাড়া কিছু নয়।

মানুষের জীবনে অনেক সমস্যা আসে সবগুলোকে প্লানিংয়ের ভিত্তিতে সমাধা করা অসম্ভব। যেমন একটি সমস্যা হলো প্রত্যেক পুরুষের বিবাহের জন্য পছন্দমত স্ত্রী দরকার, মেয়েদের দরকার পছন্দ মত স্বামীর। এ সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ এবং ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সমাধা হয়ে আসছে। প্রত্যেকে নিজের জন্য পছন্দনীয় জীবন সঙ্গী সন্ধান করে উভয় পক্ষ একমত হলে বিবাহ স্মম্পন্ন হয়। এ নীতির ফলশ্রুতিতে অবশ্যই অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত অনেক সময় ভুল হয় যার কারণে স্বামী-স্ত্রীর অমিল দেখা দেয়। এমনও হয় যে অনেক পুরুষ বা মেয়ে বিবাহ থেকে বঞ্চিত হয় এদের পক্ষ থেকে কেউ চেষ্টা করে না। কিন্তু এ সমস্যার সমাধানে কেউ বলে না যে, বিবাহ নীতিকে ব্যক্তিগত অপছন্দ পছন্দের স্থলে রাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করা হোক।

রাষ্ট্র পরিকল্পনা করবে কতজন পুরুষ আছেও কতজন মহিলা আছে। কোন পুরুষের জন্য কোন মহিলা বেশী উপযোগী। এর দ্বারা কখনো উত্তম ফলাফল আশা করা যায় না। ঠিক তেমনি মানুষ কোন পেশা গ্রহণ করবে? উৎপাদনের কোন কাজে কতটুকু অংশ নেবে? অথবা কি পরিমান নিজের সেবাকর্ম সমাজকে উপহার দেবে? এগুলো সমাজিক ব্যপার মাত্র। এগুলোর সমাধান নিরেট পরিকল্পনার উপর ছেড়ে দিলে নিম্নবর্ণিত ক্ষতি সমূহের সম্মুখীন হতে হবে।

১. সামজতন্ত্রে রাষ্ট্রই পরিকল্পনার কাজ সমাধা দেয়। রাষ্ট্র কোন ফিরিস্তা দলের নাম নয় যে তাদের কোন প্রকার ভুল বা খেয়ানত হবে না। কারণ রাষ্ট্র পরিচালনাকারীরাও রক্ত গোস্তের মানুষ। তারা নিজস্ব চাহিদা ও স্বার্থে প্রভাবিত হতে পারে। তাদের চিন্তায় ভুলের সম্ভাবনা আছে। অপর দিকে সারা দেশের সমস্ত উৎপাদনের উপকরণ একদলের মানুষকে অর্পন করা হলে তাদের কুইচ্ছায় সমস্ত জাতিকে খেসারাত দিতে হবে। যদি ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় একজন সামান্য পুজিপতি সীমিত উৎপাদনের উপকরণের মালিক হওয়ায় অনেককে অত্যাচারের লক্ষ্য বস্তু বানাতে পারে তাহলে সামজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় গুটি কয়েক কর্তৃত্বশীল ব্যক্তি সমস্ত দেশের উৎপাদনের উপকরণের দখলদার হয়ে এর চেয়ে অনেক বেশী অন্যায় করতেপারে। ফলে অনেক ছোট ছোট পুজিবাদী নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং বৃহৎ পুজিবাদী প্রতিষ্ঠা লাভ করবে যারা রাষ্ট্রের সমস্ত উপকরণ ইচ্ছামত ব্যবহার করবে।

২. সমাজতন্ত্রের পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থা বৃহৎ ক্ষমতা ও অত্যাচারী শাসক ব্যতীত প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা সম্ভব নয় কেননা নাগরিকদেরকে সর্বক্ষণিক ধারণকারী রাষ্ট্রের পরিকল্পনার অধিনস্ত করার জন্য রাষ্ট্রীয় ভাবে জুলুম আবশ্যক। কেননা প্রত্যেককে স্বাধীন কর্মের স্থলে পরিকল্পনার অধিনে কাজ করাতে হলে এই পরিকল্পনা শক্তিশালী ও অত্যাচারী শক্তি হতে হবে তাই সমাজতন্ত্রে রাজনৈতিক স্বাধীনতা খতম হওয়া জরুরী এবং এভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতাও নিঃশেষ হয়ে যায়।

৩. সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত মুনাফার অর্জনকে নিঃশেষ করে দেয়া হয়। এজন্য জনগণের কাজ কারবারের উপর বৃহৎ প্রভাব পড়ে। মানুষ চিন্তা করে পরিশ্রম, উদ্যেমতা বা আলসতা যে ভাবেই কাজ করা হোক লাভ একই। এজন্য মনোযোগ সহ কাজ করার প্রতিভা নষ্ট হয়ে যায়। ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন একচেটিয়া খারাপ নয়। বরং সীমারেখার মধ্যে থাকলে তা মানবিক যোগ্যতাকে আলোকিত করে এবং তাকে নিত্য নতুন মহোদ্যমে উৎসাহিত করে। এ স্বভাব জাত প্রেরণাকে সীমার মধ্যে রাখার জন্য অবশ্যই লাগাম প্রয়োজন। কিন্তু একে একেবারে পিষে মারলে অনেক মানবিক যোগ্যতা নষ্ট হয়ে যাবে। এ সমস্ত অসুবিধা শুধু তত্ত্বীয় ব্যাপারে নয় বরং সমাজতন্ত্রের ৭৪ বৎসরের অভিজ্ঞতা এ সমস্ত অসুবিধা পূর্ণ ভাবে প্রমাণ করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনাবস্থায় খোদ রুশের প্রধান এলসন বলেন ঃ

"যদি সমাজতন্ত্র মতবাদের অভিজ্ঞতা রুশের মত বিশাল সামাজ্যে না হয়ে আফ্রিকার কোন ছোট স্থানে করা হতো তাহলে এর ধ্বংসাত্বকতা জানার জন্য ৭৪ বৎসর প্রয়োজন হত না।"

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ব্যাখ্যা

সমাজতন্ত্রের পতনের পর পশ্চিমাদেশসমূহে পুঁজিবাদ মহা ধুমধামের সাথে উল্লাস ধ্বনি করতে লাগলো এবং দাবী করে বসলো যখন সামাজতন্ত্র ব্যবহারিক জীবনে বিফল হয়ে গিয়েছে তখন ধনতন্ত্রের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

অথচ বাস্তবে সমাজতন্ত্রের বিফলের কারণ কোন প্রচলিত ধনতন্ত্র সঠিক হওয়া নয়। বরং এর পতনের কারণ হলো সমাজতন্ত্র ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় বাস্তব ভুলগুলো সংশোধন ছাড়াও দ্বিতীয় একটি ভুল পথ অবলম্বন করে ছিল। এখানে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার কল্পনীয় ভুল গুলোকে অত্যন্ত সুক্ষ্মতার সাথে আলোকপাত করা হলো। মূলতঃ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মৌলিক দর্শনে এতটুকু কথা ঠিক যে, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন এবং বাজারী শক্তি অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে কাজ সমাধা করা জরুরী। কারণ ইহা মানবিক স্বভাবের চাহিদা কিন্তু ভুল আরম্ভ হয়েছে প্রত্যেককে লাগামহীনভাবে বেশীর চেয়ে বেশী মুনাফা অর্জনের স্বাধীনতা দিয়ে, যার মধ্যে হালাল হারামের কোন পার্থক্য নাই এবং জনকল্যাণের দিকেও মনোযোগ নাই। সুতরাং এমন পদ্ধতি অবলম্বন করাও বৈধ হয়ে গিয়েছে যার ফলে বেশীর চেয়ে বেশী সম্পদশালী হায়ে বাজারে ঠিকাদারী (Monoboly) প্রতিষ্ঠা করে নিবে।

ঠিকাদারীর অর্থ কোন বিশেষ দ্রব্যের যোগান গচ্ছিত করে কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা গ্রুপের মধ্যে সীমিত রাখা অর্থাৎ তারা ছাড়া অন্যকেহ তা উৎপাদন করতে পারবে না। এই ঠিকাদারীর শেষ পরিণতি হলো জনগণ সে দ্রব্য তাদের মনমত নির্ধারিত দামে ক্রয় করতে বাধ্য হয়ে যাবে। মানুষের ব্যক্তিগত মুনাফার অর্জন খোলামেলা ছেড়ে দেয়া ও এর উপর প্রয়োজনাতিরিক্ত জোর দেয়ার ফলে যে সব অশ্লীলতা ধনতন্ত্রে সৃষ্টি হয়েছে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

(১) মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে হালাল হারামের পার্থক্য না থাকায় এর মাধ্যমে অনেক চারিত্রিক অশ্লীলতা সমাজে বিস্তৃত হয়ে যায়। কারণ বেশীর চেয়ে বেশী মুনাফা অর্জনে অধিকাংশ মানুষের নিম্নতর আবেগকে আপীল করে তার ভুল চাহিদাবলী শান্ত করতে আসবাব সরবরাহ করে। এতে সমাজে চারিত্রিক অনিষ্ট বিস্তার লাভ করে। পশ্চিমা দেশসমূহের নগ্নতা এবং বেহায়াপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইহাও। নগ্ন ছবি এবং ফ্লিমের সায়লাব সমাজে বিস্তার করে মানুষ ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে লেগে যায়। মহিলারা স্বশরীরের এক এক অঙ্গ এ উদ্দেশ্যে বাজারে বিক্রয় করছে। সম্প্রতি একটি রিপোর্ট অনুসারে সমস্ত কারবারের মধ্যে বেশী লাভজনক কারবার মডেল গার্লস। যারা নিজের ছবি সমূহ উৎপাদিত দ্রব্যের উপর ছাপাতে অথবা বিজ্ঞাপনের অংশ তৈরীতে

প্রদান করে মোটা অংকের প্রতিদান গ্রহণ করে। এমন কি এ গোষ্ঠি আমেরিকার সর্বাধিক উপার্জনকারীদের অর্ন্তগত। দুঃখজনক ব্যাপার হলো এর উপর যে লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করা হচ্ছে শেষে তা উৎপাদন মূল্যে সংযোজন হয়ে সাধারণ ক্রেতাদের পকেট থেকে যাচ্ছে এভাবে সমস্ত জাতি এ সমস্ত দুশ্চরিত্রের খরচ বহন করছে।

২. যেহেতু ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের ব্যাপারে বিশেষ কোন চারিত্রিক বাধ্যবাধকতা নাই তাই আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ ও উপকরণের বিভাজনে জনকল্যাণের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখা হয় না। বেশী মুনাফা অর্জনই যখন চূড়ান্ত উদ্দেশ্য তখন বেশী মুনাফা নগ্ন ফ্লিমের মাধ্যমে অর্জন হলে একজন ব্যক্তি গৃহহীনকে গৃহ প্রদানে কেন অর্থ ব্যয় করবে? কারণ এতে তুলনা মূলক মুনাফা কম।

(৩) ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনে হালাল হারামের বাধ্যবাধকতা না থাকায় সুদ,জুয়া ইত্যাদি সবই ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় বৈধ। অথচ এগুলো এমন জিনিস যা অর্থনীতির স্বাভাবিক সমতায় বাধা সৃষ্টি করে। যার ফলশ্রুতিতে অসংখ্য ঠিকাদারী সৃষ্টি হয়। এসব ঠিকাদারীর উপস্থিতিতে বাজারের জন্মগত শক্তি চাহিদা ও যোগানের নীতি শূন্য হয়ে যায়। অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার দাবী হলো আমরা এক দিকে বাজারী শক্তি অর্থাৎ চাহিদা ও যোগান দ্বারা কাজ নিতে চাচ্ছি অপর দিকে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনকে স্বাধীন ছেড়ে দিয়ে এ মধ্যে ঠিকাদারীর সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে চাহিদা ও যোগানের শক্তি অচল অনর্থক হয়ে গিয়েছে। চাহিদা ও যোগানের শক্তি অর্থনীতিতে সমতা সৃষ্টি করার জন্য ঐ সময় কাজে লাগে যখন বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা (Freecompetition) হয়।

কিন্তু কোন ব্যক্তির ঠিকাদারী সৃষ্টি হয়ে গেলে মুল্যের নীতি ঠিক থাকে না এবং অর্থনীতির মৌলিক চারটি সমস্যার ব্যাপারে গৃহিত সিদ্ধান্ত সমূহ অর্থনীতির প্রকৃত প্রয়োজন ও চাহিদার সমাধান করে না। এখানে একটি কৃত্রিম নীতি অস্তিত্ব লাভ করে। মনে করি চিনির উৎপাদন প্রয়োজন মত এমন হওয়া উচিত যেন বাজারে তার সমীচীন দাম চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। কিন্তু সমীচীন দাম নির্ধারণ করা চিনি তৈরীর বিভিন্ন কারখানা থাকলে এবং ভোক্তার স্বাধীনতা থাকলেই সম্ভব। যদি এক কারখানায় চিনির দাম বেশী হয় তাহলে অন্য কারখানা থেকে ক্রয় করতে পারবে। বাজারে এমন প্রতিযোগীতা সৃষ্টি হলে কোন কারখানাই ইচ্ছামত মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে না। তখন বাজারে চিনির যে দাম নির্ধারিত হবে তা বাস্তব চাহিদা ও যোগানের পারস্পারিক সংঘাতেই নির্ধারিত হবে। ফলে দাম সমীচীন হবে। কিন্তু যদি একই ব্যক্তি চিনির

কারবারের ঠিকাদারী হয়ে যায়। ভোক্তারা শুধু তার থেকেই ক্রয় করতে বাধ্য হয়। তাহলে ভোক্তাদের ইজারাদার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করা ছাড়া কোন পথ থাকবে না। ফলে চিনির দাম অবশ্যই বেশী হবে।

স্বাধীন প্রতিযোগিতা চলাকালীন সময়ে চিনি ৮ টাকা কেজি হলে ইজারাদারী চললে ১০/১২ টাকা কেজি হতে পারে। এখন ভোক্তারা ১২ টাকায় চিনি ক্রয় করলে লেনদেন তার বাস্তব চাহিদার প্রতিনিধিত্ব করবে না। বরং একটা কৃত্রিম অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করবে যা একজন চিনি ব্যবসায়ী ইজারাদারীর কারণে সৃষ্টি হয়েছে। এভাবেই ইজারাদারী বাস্তব চাহিদা ও যোগান নীতির মূলে কুঠারাঘাত করে। তাই যদিও এতটুকু কথা ঠিক ছিল যে, অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধান এক ধাপ পর্যন্ত চাহিদা ও যোগান নীতির করা উচিত। কিন্তু এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যখন ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন হালাল হারাম পার্থক্য করা ছাড়া লাগামহীনছেড়ে দেয়া হয়েছে। তখন সে ইজারাদারী সৃষ্টি করে নিজেই চাহিদা ও যোগানের শক্তিকে সঠিকভাবে কাজ করার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪. যদিও ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল চিন্তা ছিল কারবার ও ব্যবসায় সরকারের কোন প্রকার হস্তক্ষেপ চলবে না। কিন্তু ক্রমান্বয়ে এ নীতি পরিপূর্ণ ভাবে টিকে থাকতে পারে নি। প্রায় সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশ সমূহে সরকারের পক্ষ থেকে কিছু না কিছু অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যেমন রাষ্ট্র বিভিন্ন নীতিমালার মাধ্যমে বিশেষ করে ট্যাক্সের মাধ্যমে কোন কোন ব্যবসার প্রতি উৎসাহ যুগিয়েছে। আবার কোন কোন ব্যাবসার প্রতি অমনোযোগ সৃষ্টি করেছে। সম্ভবত বর্তমানে এমনকোনপুঁজিবাদী দেশ নাই যেখানে কারবার ও ব্যবসায় সরকারের পক্ষ থেকে কোন বাধ্যবাধকতা নাই। তাই সরকারের "অনুপস্থিত" নীতির উপর সঠিক আমলকারী কোনদেশ নাই।

কিন্তু রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ অনেক সময় রাষ্ট্রের গোলামী এবং পুজিবাদীদের সন্ধির ফলে হয়ে থাকে। যার উপকারীতা শুধু চিহ্নিত পুঁজিবাদীরাই লাভ করে। ফলে সামগ্রীক কল্যাণ এবং উন্নতি হয় না। যদি বাধ্যবাধকতা এ ধরনের সন্ধি ও ধর্মহীনতা থেকে খালি হয়, তবুও তা নিরেট ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার ভিত্তিতে হয়। নিজের খেয়ালমত যে বাধ্যবাধকতা ভাল মনেহয় আরোপ করা হয় অথচ শুধু বুদ্ধি মানবিক সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য যথেষ্ট নয়। এ কারণেই এই বাধ্যবাধকতা অর্থনৈতিক অসমতার সঠিক সমাধান হতে পারে না।

৫. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় বিশেষ করে উৎপাদনের বন্টন নীতি অসমতার স্বীকার হয়ে পড়ে। এর একটি বড় কারণ সুদ ও জুয়া। যার ফলে সম্পদের উচ্ছ্বাসের দিক বৃত্তশীলদের দিকে থাকে। গরীব ও অসহায়দের দিকে থাকে না। এর বিস্তারিত বিবরণ উৎপাদন বন্টনের আলোচনায় ইনশা আল্লাহ আসবে।

৩—

অর্থব্যবস্থার ইসলামী নীতি

ধণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচিতির পর অর্থব্যবস্থার মৌলিক চারটি সমস্যার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করতে চাচ্ছি।

প্রথমেই জানা দরকার যে, ইসলাম কোন অর্থব্যবস্থার নাম নয়। ইসলাম একটি ধর্ম। যার আদেশাবলী জীবনের প্রতিটি শাখা প্রশাখার সাথে সম্পৃক্ত। এর মধ্যে অর্থ ব্যাবস্থাও আছে। তাই কোরআন হাদীস বর্তমানে প্রচলিত অর্থে কোন অর্থনৈতিক দর্শন বা মতবাদ উপস্থাপন করেনি। অতএব আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ, উপকরণের বিভাজন, আয়ের বন্টন, উন্নয়ন এর চার শিরোনামে কোরআন সুন্নাহ ও ইসলামী ফেক্বায় সরাসরী কোন আলোচনা নাই। জীবনের অন্যান্য শাখা প্রশাখার ন্যায় ইসলাম অর্থব্যবস্থার ব্যাপারেও কিছু আদেশ দিয়েছে। এ আহকামের উপর সামগ্রীক দৃষ্টিপাত আমরা উল্লেখিত চার সমস্যার ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গি বুঝতে পারি। এখানে এটাই আলোচনা করা হলো। ইসলামের অর্থনৈতিক আহকাম ও শিক্ষার উপর চিন্তা করলে স্পস্ট হয়ে যায় যে,

ইসলাম বাজারের শক্তি অর্থাৎ চাহিদা ও যোগান নীতিকে মেনে নেয় এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে এর প্রয়োগ;ক যথেষ্ট সহায়ক মনে করে।

কোরআনের এরশাদ ঃ

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سِخْرِيًّا (زخرف : ٣٢)

অর্থ ঃ আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের উপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে সেবক রূপে গ্রহণ করে। (যুখরুফ-৩২)

একে অপরের থেকে সেবা নেয়াতে সেবা গ্রহণ কারী সেবার চাহিদা, আর সেবা প্রদান কারী সেবার যোগান। চাহিদা ও যোগানের পরস্পরের মিলনে একটি সামঞ্জস্য পূর্ণ অর্থব্যবস্থার অস্তিত্ব লাভ করে। রাসুল (আঃ) এর যুগে যখন গ্রাম্য ব্যক্তিরা তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য শহরে নিয়ে আসতো। তখন কিছু শহুরে লোক গ্রাম্যলোকদের বলতো তুমি নিজে শহরে গিয়ে বিক্রয় করো না। বরং এ পণ্য গুলো আমাদের দিয়ে দাও আমরা সময় মত বেশী মূল্যে বিক্রয় করবো, রাসুল (সাঃ) শহুরীদেরকে এমন করতে বাধা দিয়েছেন এবং এরশাদ করেছেন।

دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْضٍ

মানুষদের মুক্ত ছেড়ে দাও। আল্লাহপাক একে অপরের মাধ্যমে রিযিক প্রদান করেন। এভাবে রাসুল (সাঃ) ক্রেতা বিক্রেতার মাঝে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ নাকচ করে দিয়েছেন যেন চাহিদা ও যোগানের সঠিক সমতা সৃষ্টি হয়। গ্রাম্য ব্যক্তি যখন সরাসরি বাজারে কোন পণ্য বিক্রয় করবে তখন সে তার সমীচীন লাভ নিয়েই বিক্রয় করবে। তার যেহেতু দ্রুত ফিরে যেতে হবে তাই কুক্ষিগত করার সুযোগ নাই। তার নিজের বাজারে যাওয়ার দ্বারা চাহিদা ও যোগানের এমন মিলন হবে যা স্বাভাবিক দাম নির্ধারণে সহায়ক হবে। পক্ষান্তরে তৃতীয় কোন ব্যক্তি মাঝেখানে এলে পণ্য কুক্ষিগত করে তার উৎপাদন হ্রাস করে দেবে। তখন চাহিদা ও যোগানের স্বাভাবিকতায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

হাদীস দ্বারা আরো জানা গেল যে, রাসুল (সাঃ) চাহিদা ও যোগানের সৃষ্টিগত নীতিকে মেনে নিয়েছেন এবং একে অবশিষ্ট রাখার চেষ্টা করেছেন ঠিক তেমনি তাঁর কাছে বাজারে বিক্রয় মূলক দ্রব্যের দাম সরকারী ভাবে নির্ধারণ করে দেয়ার আহ্বান জানালে তিনি বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمُسْعِرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ

নিশ্চয় ব আল্লাহ্ পাকই মূল্য নির্ধারণ কারী, তিনিই দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি ও হ্রাস হ্রাসকারী, ও রিযিক দাতা। আল্লাহ্ পাককে মূল্য নির্ধারক সাব্যস্ত করার প্রকাশ্য উদ্দেশ্য হাদীসের পরের অংশে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক চাহিদা ও যোগানের সৃষ্টিগত নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যা দ্বারা মূল্যও সৃষ্টিগত ভাবে নির্ধারণ হয়। এই সৃষ্টিগত নীতি বর্জন করে কৃত্রিম রূপে মূল্য নির্ধারণ পছন্দনীয় নয়। কুরআন সুন্নার এসমস্ত আলোচনার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে ইসলাম বাজারের শক্তি অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের নীতিকে মোটামুটি মেনে নিয়েছে। ঠিক তেমনি মুনাফা অর্জনের ইচ্ছা দ্বারাও মোটামুটি কাজ নিয়েছে।

তবে পার্থক্য হলো ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা ইচ্ছাকে একেবারে মুক্ত ছেড়ে দিয়েছে বলে পূর্বে উল্লেখিত সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে হয়েছে। ইসলাম মুনাফা অর্জনের ইচ্ছাকে ঠিক রেখে ও চাহিদা- যোগানের নীতিকে বহাল রেখে ব্যাবসা ও অর্থব্যবস্থার উপর কিছু বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে যার উপর আমল করলে মুনাফা অর্জনের ইচ্ছা এমন ভুল পথে চলতে পারে না যা অর্থব্যবস্থাকে সাম স্যহীন বা অন্য কোন চারিত্রিক বা সামগ্রীক বিধ্বস্ততা সৃষ্টি করে। ইসলাম মুনাফা অর্জনের ইচ্ছার উপর যে বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে তা তিন ভাগে বিভক্ত।

(১) খোদায়ী বাধ্যবাধকতা ঃ

সর্ব প্রথমে ইসলাম অর্থ ব্যবস্থার উপর হালাল হারামের কিছু স্থায়ী বাধ্য বাধকতা আরোপ করেছে যা সর্বযুগে সর্বস্থানে আমলযোগ্য। যেমন সুদ জুয়া সাটটা (একপ্রকার জুয়া),

গুদামজাত ও অবৈধ বিক্রয় কে অবৈধ ঘোষণা করেছে। কেননা এগুলো সাধারণত ঠিকাদারদের অবস্থান মজবুত করে। এর দ্বারা অর্থনীতিতে অসাম স্যতা সৃষ্টি হয়। তেমনিভাবে ঐ সমস্ত দ্রব্যাদীর উৎপাদন ও ক্রয় বিক্রয়কে অবৈধ ঘোষণা করেছে যার মাধ্যমে সমাজ কুআচরণের শিকার হয়। ফলে মানুষের নিম্ন আবেগ উস্কে উঠে অবৈধ ভাবে আয়ের পথ সৃষ্টি হয়। প্রকাশ থাকে যে, এ সমস্ত খোদায়ী বাধ্যবাধকতা কোরআন সুন্নার মাধ্যমে আরোপ করা হয়েছে।

এগুলোকে ইসলাম মানুষের নিজস্ব বিবেকের উপর ছেড়ে দেয়নি। কারণ কোন বস্তুর ভাল মন্দের বিচাবে অনেক সময় মানুষের মেধায় কম বেশী ও মত পার্থক্য হয়ে থাকে। একজনের মেধা এক জিনিসকে উত্তম অন্যের মেধা তাকে অনুত্তম বুঝতে পারে। তাই বাধ্য বাধকতাকে মানুষের মেধার উপর ছেড়ে দেয়া হলে খুব সম্ভব লোকেরা ঐ বাধ্য বাধ্যতাকে নিজ বুদ্ধিতে অসমীচীন আখ্যা দিয়ে সমাজকে তা থেকে মুক্ত করতো।

অথচ আল্লাহ্ পাকের ইলমে বাধ্যবাধকতা সর্বকালে সর্ব অবস্থায় জরুরী ছিল। তাই এগুলোকে ওহীর মাধ্যমে স্থায়ী করে দেয়া হয়েছে। যেন মানুষ তার মেধার ব্যাখ্যার আশ্রয়ে এগুলো থেকে মুক্তি অর্জন করে সমাজকে অসামঞ্জস্যতায় লিপ্ত না করে। খোদায়ী বাধ্যবাধকতা যা কোরআন ও সুন্নাহ আরোপ করেছে সর্বাবস্থায় কার্যকরী। চাই মানুষের জ্ঞানে এর প্রজ্ঞা বুঝে আসুক বা না আসুক। যেমন পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে যে, বর্তমানে অনেক ধনতান্ত্রিক দেশ সমূহে মুনাফা অর্জনের ইচ্ছার উপর কিছু কিছু বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। কিন্তু যেহেতু সেগুলো ওহীয়ে এলাহীর মাধ্যমে নয় তাই তা সামঞ্জস্য পূর্ণ অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয়। ধনতান্ত্রিক দেশ সমূহের কোথাও সুদ, জুয়া, লটারী, সাটটা ইত্যাদির উপর কোন বাধ্য বাধকতা আরোপ করা হয় নাই যা অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টিতে অত্যন্ত সহায়ক।

(২) রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা ঃ

উল্লেখিত খোদায়ী বাধ্যবাধকতা সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য। এর সাথে ইসলামী শরীয়ত সমসাময়ীক হুকুমতকে ব্যাপক উপযোগিতার ভিত্তিতে এমন কোন বস্তু বা কাজের উপরও বাধ্যবাধকতা আরোপ করার অধিকার দিয়েছেন যা

একেবারে হারাম নয় বরং মুবাহ। এ প্রকারের বাধ্যবাধকতা সর্ব কালের জন্য স্থায়ী হয় না। এর উদাহরণে ফুহাকায়ে কেরাম লিখেছেন পেটের পীড়া ব্যাপক রূপ ধারণ করলে রাষ্ট্র তরমুজের ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই বাধ্য বাধকতা থাকবে ততক্ষণ তরমুজ খাওয়া বিক্রয় করা শরীয়তের ভিত্তিতে না যায়েজ হয়ে যাবে।

তেমনি ভাবে উসুলে ফিক্বাহয় سد ذرايع 'মাধ্যম নিষিদ্ধ" শিরো নামের একটি আলাদা অধ্যায় আছে। যার উদ্দেশ্য হলো কোন কাজ মূলত বৈধ হলেও কিন্তু যদি এর ব্যাপকতা কোন পাপ বা ক্ষতির কারণ হয় তখন রাষ্ট্রের জন্য সে বৈধ কাজ কে নিষিদ্ধ করা বৈধ হবে। এ নীতির আলোকে রাষ্ট্র সমস্ত অর্থ ব্যবস্থার কার্যাবলীর তদারক করতে পারে। যে কার্যাবলীর দ্বারা অর্থব্যাবস্থায় অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে সেগুলোর উপর সমীচীন বিধি নিষেধ আরোপ করতে পারে।

কানযুল উম্মাল গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত ফারুকে আ'যম (রাঃ) একবার বাজারে এসে দেখলেন এক ব্যক্তি কোন এক দ্রব্যকে তার প্রচলিত মূল্য অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে বিক্রয় করছে। তিনি তাকে বললেন

إِمَّا أَنْ تَزِيْدَ فِى السِّعْرِ وَإِمَّا تَرْفَعَ عَنْ سُوْقِىْ -

হয়তো মূল্য বৃদ্ধি কর নতুবা বাজার ত্যাগ কর।

অবশ্য রেওয়ায়েতে ওমর (রাঃ) এর এ বাধ্যবাধকতা আরোপের কোন কারণ উল্লেখ হয় নি। হয়তো এর কারণ হতে পারে যে, সামঞ্জস্য মূল্য থেকে অনেক কমে বিক্রয় করে অন্যান্য ব্যাবসায়ীদের জন্য বৈধ লাভের পথ বন্ধ করে দিচ্ছে। এমনও হতে পারে যে, মূল্য কম হওয়ায় মানুষ প্রয়োজনাতিরিক্ত ক্রয় করবে যার কারণে অপচয়ের ফটক উন্মুক্ত হচ্ছে বা মানুষের জন্য কুক্ষিগত করার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। মূলত ঃ শরয়ী আদেশ হলো এক ব্যক্তি নিজস্ব মালিকানার পণ্য যে কোন দামে বিক্রয় করতে পারে। তাই কম মূল্যে বিক্রয় করাও বৈধ। কিন্তু কোন সামগ্রীক উপকারীতার ভিত্তিতে হযরত ওমর (রাঃ) এর উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছেন।

এসমস্ত রাষ্ট্রীয় বিধি নিষেধ মান্য করার আবশ্যকতাও কোরআন থেকেই বুঝা যায়। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

হে ঈমান দারগণ! আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের।

এ আয়াতে اولى الامر এর অনুসরণ কে আল্লাহ্ ও রাসুলের অনুসরণ থেকে পৃথক করে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে কোরআন ও হাদীসের কোন নির্ধারিত হুকুম নেই যেখানে اولى الامر এর আহবান পালন করা জরুরী।

এখানে পরিস্কার হওয়া উচিত যে, রাষ্ট্রের মুবাহ জিনিসের উপর বাধ্য বাধকতা আরোপ করার এ অধিকার সীমাহীন নয়। এরো কিছু নিয়ম নীতি আছে। যার বিস্তারিত বিবরণের সুযোগ এখানে নেই। তবে দুটি কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য।

এক. রাষ্ট্রের এমন আদেশই পালনীয় যা কোরআন ও সুন্নাহর কোন আদেশের বিরোধী নয়। দুই. রাষ্ট্রের এ ধরণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা শুধু ঐ সময়ই হতে হবে যখন সামগ্রীক।

উপযোগিতা এর আহ্বান কারী হয়। প্রসিদ্ধ ফিকহী নীতিতে একথা এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে–

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ بِالرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

সাধারণের উপর রাষ্ট্রের অধিকার উপযোগিতার সাথে বাধা।

তাই যদি কোন রাষ্ট্র কোন সামগ্রীক উপযোগিতা ছাড়া কোন বাধ্যবাধ্যকতা আরোপ করে তবে এ বাধ্যবাধকতা বৈধ নয়। কারণ নৈতিকতার দ্বারা ইহাকে রহিত করা যেতে পারে।

(৩) নৈতিক বাধ্যবাধকতা ঃ

পূর্বে বলা হয়েছে ইসলাম কোন অর্থ ব্যবস্থার নাম নয়। বরং ইসলাম একটি ধর্মের নাম। এই ধর্মের শিক্ষাদীক্ষা ও জীবন বিধানের অন্যান্য শাখা প্রশাখার ন্যায় অর্থ ব্যবস্থার সাথে ও ইসলামের সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু ইসলামী শিক্ষা দীক্ষায় একথা পুংখানু ভাবে পারিষ্কার করে দেয়া হয়েছে যে, অর্থ ব্যবস্থা এবং তার দ্বারা অর্জিত উপকারণাদি মানব জীবনের চুড়ান্ত লক্ষ্য উদ্দেশ্য নয়। কোরআন ও সুন্নাহ পরিপূর্ন ভাবে যে কথার প্রতি জোর দিয়েছে তা হলো, পৃথিবীর জীবন সীমিত। এর পরে এমন চিরস্থায়ী জীবন আসবে যার কোন শেষ নাই। দুনিয়ার জীবন আখিরাতের জীবনের জন্য সোপান বানানো ও সেখানের উন্নতির চিন্তা করাই মানুষের মূল কাজ। তাই অপরের তুলনায় পয়সা বেশী উপার্জন করা মানুষের জন্য সফলতা নয়। বরং আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করাই আসল সফলতা। এর সরল পথ দুনিয়াতে অবস্থান করে এমন কাজ করা যার দ্বারা বেশীর থেকে বেশি নেকী অর্জন করা যায়। যখন মানুষের মধ্যে এমন মন মানসিকতা সৃষ্টি হবে তখন "কিভাবে আমার

সিন্ধুক বেশী ভরবে" এই নীতি অর্থ ব্যবস্থার সিন্ধান্তে প্রভাব ফেলতে পারবে না। বরং অধিকাংশ সময় অর্থ ব্যবস্থার সিদ্ধান্তের ভিত্তি হবে কোন কাজে আমার পরকালে বেশী মুনাফা অর্জন হবে?

এজন্য অনেক ব্যাপারেই শরীয়ত কোন আবশ্যিক আদেশ (Mandafory Order) দেয়নি। তবে কোন বিশেষ ব্যাপারে পরকালের এমন ফজিলত বর্ণনা করেছে যা একজন মুমিনকে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে।এর মাধ্যমেই মানুষ নিজে নিজেই অনেক বাধ্য বাধকতাই আবশ্যিক করে নেয়। নৈতিক বাধ্য বাধকতা বলতে আমি এ ধরণের বাধ্য বাধকতাই বুঝাতে চেয়েছি। যেমন ঃ কাউরো কাছে পুজি বিনিয়োগের দুটি পথ আছে।

(এক) কোন বৈধ আনন্দ দায়ক বাণিজ্যিক খাতে বিনিয়োগ। যেখানে বেশী মুনাফার সম্ভাবনা আছে, **(দুই)** বাসস্থান হীন মানুষদের জন্য স্বল্প মূল্যে বাড়ী তৈরী করে বিক্রয় করার খাতে বিনিয়োগ। যেখানে তুলনা মূলক স্বল্প মুনাফার সম্ভাবনা। একজন সেকুলার পন্থি ব্যক্তি অবশ্যই প্রথম পথই অবলম্বন করবে। কেননা সেখানে মুনাফা বেশী। কিন্তু যার অন্তর পরকালের চিন্তায় ভরপুর। সে তার উল্টা চিন্তা করবে। সে ভাববে, যদিও বাসস্থান তৈরীতে আর্থিক মুনাফা তুলনামুলক কম কিন্তু অসহায়দের জন্য বাসস্থান তৈরীতে বিনিয়োগ করার মধ্যে পরকালে অধিক নেকী ও প্রতিদান অর্জন করতে পারবো। এজন্য আমার আনন্দদায়ক খাতে বিনিয়োগ করার চেয়ে বাসস্থান তৈরীতে বিনিয়োগ করাই উত্তম।

এখানে শরীয়তের দৃষ্টিতে যদিও উভয় পথই বৈধ এবং কোনটার উপরই রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা নাই। কিন্তু পরকালের প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে নৈতিক বাধ্য বাধকতা মানবিক প্রয়োজনকে সামনে রেখে সে ব্যক্তির অন্তরে এক অভ্যান্তরীণ অন্তরায় সৃষ্টি করেছে ।যার কারণে উওম রূপে আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ ও উপকারণের বিভাজন সম্ভব হয়েছে এটা একটা সামান্য উদাহরণ মাল। বাস্তবিকই যদি পরকালের বিশ্বাস পুরোপুরি দিলে বসে যায় তাহলে উহা অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে গুরুত্ব পুর্ণ ভুমিকা রাখতে পারবে। অনৈসলামিক অর্থব্যবস্থাতেও নৈতিকতায় একটা দিক আছে আমি তা অস্বীকার করি না। অনেক সময় সে নৈতিকতা ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু সে নৈতিকতার চিন্তাভাবনার সাথে পরকালের মজবুত বিশ্বাস সংযুক্ত নয়। অপর দিকে ইসলাম তার সমস্ত শিক্ষা দীক্ষার সাথে পরিপুর্ণ ভাবে কার্যত চালু হলে তার নৈতিকতার প্রভাব অর্থব্যবস্থায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যেমন টি অতীতে হয়েছে। তাই নৈতিক বাধ্য বাধকতার এই বুনিয়াদ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় দুর্বল কোন বুনিয়াদ নয় বরং এর গুরুত্ব অনেক বেশী ।

বিভিন্ন অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদ উৎপাদন ও তার বন্টন

এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হয়েছে এগুলো অর্থনীতির মৌলিক ধারণা মুলক আলোচনা ছিল। এখন বিভিন্ন অর্থ ব্যবস্থায় বর্ণিত মৌলিক ধারণাগুলোর প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

১। সম্পদ উৎপাদন (Production of Wealth)

এ শিরোনামে সম্পদ উৎপাদন সম্পর্কিত সমস্যাবলীর আলোচনা করা হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে? সেখানে ব্যক্তিগত, প্রতিষ্ঠান এবং সরকার প্রভৃতির ভূমিকা কি হবে? এ শিরোনামকে আরবীতে إِنْتَاجُ الثَّرْوَةِ বলে।

২। সম্পদ বন্টন (Distribution of wealth)

এ শিরোনামে উৎপাদিত সম্পদকে তার পাওনাদারদের বন্টন করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। একে আরবীতে تَوْزِيْعُ الثَّرْوَةِ বলে।

৩। সম্পদের বিনিময় (Exchange of Wealth)

এ শিরোনামে পরস্পরে সম্পদের বিনিময় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

একে আরবীতে مُبَادَلَةُ الثَّرْوَةِ বলে।

৪। সম্পদ ব্যয় Consumpition of wealth

এ শিরোনামে অর্জিত সম্পদ ব্যয় করা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। একে আরবীতে إِسْتِهْلَاكُ الثَّرْوَةِ বলে।

সম্পদ বিনিময় ও ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে আপতত যাচ্ছিনা। এ ব্যাপারে সামনে আসছে তবে সম্পদ উৎপাদন ও বন্টনের ব্যাপারে কিছু মৌলিক আলোচনা ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং অনৈসলামিক মতবাদগুলো জানার জন্য জরুরী। এগুলো সংক্ষেপে এখানে পেশ করা হল।

ধনতন্ত্রের আলোকে

সম্পদ উৎপাদন ও বন্টন

ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় যে কোন জিনিসের উৎপাদনের উপকরণ চারটি। যাকে আরবীতে عَوَامِلُ الْإِنْتَاجِ ইংরেজীতে Factors of Production বাংলায় উৎপাদন উপকরণ বলে।

১. জমি (Land) ঃ এর অর্থ প্রাকৃতিক উৎপাদন উপকরণ। যা সরাসরি আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্ট এবং তা সৃষ্টি করার মধ্যে কোন মানুষের অনুপ্রবেশ নাই।

২. শ্রম (Labour) ঃ এর অর্থ-মানুষের শ্রম যার দ্বারা নতুন কোন পণ্য অস্তিত্ব লাভ করে।

৩. পুঁজি (Capital) ঃ ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যাবস্থায় পুজি বলতে উৎপাদন উপকরণ দ্বারা উৎপাদিত বস্তুকে বুঝায়। (Produced factor of Production) এ সংজ্ঞাকে একটু পরিস্কার করে এমন বলা যেতে পারে, পুঁজি এমন উৎপাদন উপকরণ যা প্রাকৃতিক নয় বরং কোন উপকরণের দ্বারা সৃষ্ট এবং সামনে কোন উৎপাদন উপকরণে ব্যবহার হয়।

৪. উদ্যোক্তা (Entrepreneur) ঃ এর অর্থ এমন ব্যক্তি বা সংগঠন যে কোন উৎপাদন কাজের চালক হয় এবং উল্লেখিত তিনটি উপকরণ কে একত্রিত করে সেগুলোকে উৎপাদন কাজে ব্যবহার করে লাভ ক্ষতির ঝুঁকি বহন করে। ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার ধারা অনুযায়ী বর্তমানে উৎপাদন কাজ উল্লেখিত চারটি উপকরণের সমষ্টিগত ব্যবস্থাপনার ফল। যদিও অনেক সময় এই উপকরণগুলো একক ব্যক্তির মধ্যেই একত্রিত হয়। অর্থাৎ যিনি জমির যোগান দেন তিনিই পরিশ্রম করেন, পুঁজি বিনিয়োগ করেন। কিন্তু বৃহৎ প্রকল্পে সাধারণত এই উপকরণ গুলো ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রকাশ হয়। উৎপাদন তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হওয়ায় উৎপাদিত দ্রব্য পাওয়ার অধিকার তাদেরই।

ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদ বন্টনের ধারা হলো–জমির ভাড়া (Rent) পরিশ্রমের পারিশ্রমিক (wages), পুজির সুদ (Interest) এবং উদ্যোক্তার লাভ (Profit) পাওয়া উচিত। এগুলোর বন্টনের প্রথম তিনটি স্তম্ভ অর্থাৎ ভাড়া, পারিশ্রমিক ও সুদ পূর্ব থেকেই নির্ধারিত থাকে এবং চাহিদা-যোগানের ভিত্তিতে তা নির্দিষ্ট হয়। যার ব্যাখ্যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে বন্টনের চতুর্থ স্তম্ভ অর্থাৎ লাভ কারবার শুরু করার সময় নির্দিষ্ট ভাবে জানা যায় না। কারবারের ফলাফল বের হওয়ার পরই তা নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ প্রথম তিন স্তম্ভে সম্পদ বন্টন হওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে সেটাই উদ্যোক্তার মুনাফা।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন ও তার বন্টন

সমাজতন্ত্রের বক্তব্য অনুযায়ী প্রকৃত উৎপাদন উপকরণ চারটি নয় বরং দুইটি। ১. জমি ২. শ্রম।

এ দুটির সমন্বয়ে উৎপাদিত সামগ্রী অস্তিত্ব লাভ করে। পুজিকে উপকরণ না বলার কারণ হলো সে নিজেই অন্য উৎপাদন উপকরণের ফলাফল। উদ্দ্যোক্তাকে ভিন্ন উপকরণ সাব্যস্ত করার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ উদ্যোক্তার কাজ শ্রমের মধ্যে আসতে পারে। দ্বিতীয়ত লাভ ক্ষতির ঝুকিও কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের নেয়ার প্রয়োজন নাই। সমাজতন্ত্রে এ কাজ সরকার করে থাকে। ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র কারবারী মহোদ্যমের প্রয়োজনও নাই, অনুমতিও নাই।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় প্রকৃত উপকরণ শুধু জমি ও শ্রম। জমি কোন ব্যক্তির মালিকানায় থাকে না তাই তার ভিন্ন প্রতিদান দেয়ার কোন প্রয়োজন নাই। তাই সম্পদ বন্টনের শুধু একটি স্তম্ভ অবশিষ্ট থাকে তাহলো পারিশ্রমিক। যার নির্ধারণ সরকারী পরিকল্পনার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

কার্লমার্কসের প্রসিদ্ধ মতবাদ হলো শ্রমের দ্বারাই কোন জিনিসের মান বৃদ্ধি পায় তাই শ্রমই একমাত্র পারিশ্রামিকের উপযুক্ত। পুজির সুদ, জমির ভাড়া এবং উদ্যোক্তার মুনাফা একটি ফালতু জিনিস। যাকে উদ্ভট সৃষ্টি করা হয়েছে এ মতবাদকে Theory of surplus Value আরবীতে نظرية القدر বলে।

ইসলামী শিক্ষা

কোরআন ও সুন্নাহয় সম্পদ উৎপাদন ও সম্পদ বন্টনের উপর এভাবে আলোকপাত করা হয় নাই যেভাবে অর্থনীতির কিতাব সমূহে উল্লেখিত হয়েছে। তবে অর্থনীতির বিভিন্ন অধ্যায়ে কোরআন ও সুন্নাহ যে আহকাম দিয়েছে সেগুলোর উপর চিন্তা করলে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম পুজি (Capital) এবং উদ্যোক্তার (Entrepreneur) পার্থক্য মেনে নেয়া হয় নাই।

ধনতন্ত্রে লাভ ক্ষতির ঝুকি উদ্যোক্তার উপর দেয়া হয়েছে এবং পুজিকে সুনির্দিষ্ট হারে সুদ দেয়া হয়। ইসলামে সুদ হারাম হওয়ায় লাভ ক্ষতির ঝুকি পুজির উপর বর্তাবে। এজন্য যে কোন কারবারে পুজি বিনিয়োগ করবে তাকে লাভের সাথে ক্ষতির ঝুকি ও বহন করতে হবে।

এ ভাবেও বলা যেতে পারে যে, ইসলামী শিক্ষার আলোকে পুজি ও উদ্যোক্তা ভিন্ন উৎপাদন উপকরণ হলেও পুজি বিনিয়োগ কারী লাভ ক্ষতির ঝুকি বহন করায় সেও আংশিক বা পুরাপুরি ভাবে উদ্যোক্তাও এবং সম্পদ বন্টনে পুজি এবং উদ্যোক্তা উভয়েই মুনাফার পাওনাদার। অথবা বলতে হবে পুজি ও উদ্যোক্তা

ভিন্ন উপকরণ নয় বরং একই এবং সম্পদ বন্টনে মুনাফা পাবে। যাই হোক যেভাবে জমিকে নির্দিষ্ট ভাড়া এবং শ্রমকে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক দেয়া হয় তেমনি পুজিকে নির্দিষ্ট সুদ দেয়া যাবে না। ধনতন্ত্রে পুজিকে জমির উপর অনুমান করা হয়। যেভাবে জমির যোগান দিয়ে যেমন এক ব্যক্তি নির্দিষ্ট ভাড়া উসুল করে তেমনি পুজি বিনিয়োগ কারীও পুজি বিনিয়োগ করে নির্দিষ্ট সুদ উসুল করতে পারে। কিন্তু ইসলামী আহকামের দৃষ্টিতে এই অনুমান ঠিক নয়।

জমি ও পুজির মধ্যে নিম্ন বর্ণিত চুড়ান্ত পার্থক্য বিদ্যমান ঃ

১. জমি নিজেই একটি উপকারী বস্তু। এর দ্বারা উপকৃত হতে তাকে ব্যয় করার প্রয়োজন হয় না এবং তার অস্তিত্ব ঠিক রেখে উৎপাদন উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এর দ্বারা অন্যান্য উপকারও অর্জন করা যায়। তাই এর ভাড়া মূলত সে উপকারীতারই প্রতিদান যে জমি সরাসরি প্রদান করছে। অপর দিকে পুজি অর্থাৎ টাকা এমন জিনিস যা নিজে উপকারী নয়। উহাকে খরচ করে এর বিনিময়ে কোন উপকারী পন্য না কেনা পর্যন্ত মানুষকে উপকৃত করতে পারে না।

যে কাউকে টাকার যোগান দিল সে এমন কোন জিনিসের যোগান দেয় নাই যা সরাসরি উপকারী তাই এর উপর ভাড়া উসুল করার প্রশ্নই আসে না। কেননা ভাড়া ঐ জিনিসেরই হয় যার অস্তিত্ব ঠিক রেখে তা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।

২. জমি মেশিনারী ও অন্যান্য সরঞ্জাম যা ব্যবহার করার দ্বারা তার মান কমে যায় এগুলোকে যতই ব্যবহার করা হবে তার মান ততই কমে যাবে। এ জন্য এ গুলোর ভাড়া উসুল করা হলে এর মধ্যে মান কম হওয়ার প্রতিকারও অন্তভূক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু টাকা শুধু ব্যবহারের দ্বারা তার মানের মধ্যে কোন ঘাটতি আসে না।

৩. যদি কোন ব্যক্তি জমি মেশিনারী অথবা যানবাহন ভাড়া নেয় তাহলে এই জিনিসগুলি তার দায়িত্বে (Rick) বর্তায় না। বরং আসল মালিকের দায়িত্বেই থাকে। অর্থাৎ যদি এই জিনিসগুলো ভাড়াটের অলসতা বা সীমালংঘন ছাড়া কোন আসমানী বিপদে ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে ভাড়াটে দায়ী থাকবে না। বরং মূল মালিক ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যেহেতু মুল মালিক তার ক্ষতির ঝুকি বহন করছে এবং ভাড়াটেকে সে ঝুকি থেকে মুক্ত করে নিজের মালিকানা জিনিস ব্যবহারের অধিকার প্রদান করছে। এজন্য সে নির্দিষ্ট ভাড়ার যথাযোগ্য অধিকারী।

এর বিপরিত যে কাউকে ঋণ প্রদান করছে টাকার দায়িত্ব তার উপর থাকে না। বরং ঋণী ব্যক্তির দায়িত্বে চলে যায়। অর্থাৎ ঋণী ব্যাক্তির কাছে যাওয়ার পর কোন আসমানী বিপদে ধ্বংস হলে অথবা চুরি হলে ঋণদাতা ক্ষতি গ্রস্থ হয় না বরং ঋণী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অর্থাৎ এমন অবস্থাতেও ঋণী ব্যক্তি ঋণ প্রদান কারীকে

পরিশোধ করতে বাধ্য। ঋণ প্রদান কারী ঋণ প্রদান করে টাকার কোন ঝুকি বহন করে না বিধায় সে কোন প্রতিদানের হকদার হবে না। এব্যাখ্যার আলোকে সম্পদ বন্টনের ইসলামী নীতি ও ঋণতান্ত্রিক নীতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় পঁজির উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করা হয়। পক্ষান্তরে ইসলামে পুঁজির হক্ক মুনাফা যা ক্ষতির ঝুকি বহন করলেই পেতে পারে অর্থাৎ কারবারে লাভ ক্ষতি উভয়েরই অংশীদার হবে যার পদ্ধতি শিরকাত বা মুদারাবা।

দ্বিতীয় মৌলিক পার্থক্য হলো ধনতন্ত্র হোক বা সমাজতন্ত্র উভয় ব্যবস্থায় সম্পদের উপযুক্ত শুধু ঐ সমস্ত উৎপাদন উপকরণের মধ্যেই সীমিত রাখা হয়েছে যারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছে।

কিন্তু ইসলামী শিক্ষার সার কথা হলো প্রত্যেক জিনিসের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তায়ালা এবং প্রত্যেক জিনিস উৎপাদনের মূল কারণামা আল্লাহ্ পাকই আ ঞ্জাম দেন। তাঁর তৌফিক ছাড়া কোন উৎপাদন উপকরণ এক কিঞ্চিৎ পরিমানও উৎপাদন করতে পারে না। তাই কোন উপকরণই মৌলিক ভাবে উৎপাদনের মালিক এবং উপযুক্ত নয়। বরং আল্লাহ্ পাক যাকে উপযুক্ত সাব্যস্ত করবেন সেই এর উপযুক্ত হবে। যদিও আল্লাহ্পাক উৎপাদনের প্রাথমিক উপযুক্ত উৎপাদন উপকরণকেই সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু সম্পদের দ্বিতীয় উপযুক্তদের লম্বা রুটিন রেখেছেন। এই দ্বিতীয় উপযুক্ত সমাজের ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা স্বল্প উৎপাদনের কারণে উৎপাদন কাজে প্রত্যক্ষ অংশ নিতে পারে নাই। কিন্তু ইসলামী সমাজের একজন ব্যক্তি হিসাবে আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্ট সম্পদে তারও একটা অংশ আছে।

এই দ্বিতীয় উপযুক্তদের সম্পদ পৌছানোর জন্য ইসলাম যাকাত , উশর, সদকা, খাজনা, কাফফারা কুরবানী এবং উত্তরাধিকারীর আহকাম দিয়েছে। যেগুলোর মাধ্যমে সম্পদের বড় একটা অংশ তাদের পর্যন্ত পৌছে যায়। সম্পদের প্রথম উপযুক্ত অর্থাৎ উৎপাদন উপকরণ চাই তার আয় ভাড়ার আকৃতিতে অর্জিত হোক পারিশ্রমিক বা মুনাফার আকৃতিতে অর্জিত হোক তারা প্রত্যেকেই নিজস্ব আয়ের একটা অংশ দ্বিতীয় উপযুক্তদের প্রদান করতে বাধ্য। এটা কোন অনুগ্রহ নয় বরং তাদের কর্তব্য। আল্লাহ্ পাক বলেন।

وَالَّذِيْنَ فِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ (المعارج)

এবং যাদের ধন সম্পদে নির্ধারিত হক আছে যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতদের।

এমনভাবে উৎপাদিত শস্য সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন

وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ

এবং হকদান কর কর্তনের সময়। (আনআম, ১৪৩ অংশ বিশেষ)।

সম্পদ উৎপাদনে তিনধরণের অর্থব্যবস্থার সামগ্রীক প্রতিক্রিয়া

সমাজ তন্ত্র, ধনতন্ত্র ও ইসলামী অর্থব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বর্ণনা করা হলো। উল্লোখিত তিন নীতিতে সামগ্রীক ভাবে অর্থব্যবস্থায় কি ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এটা একটা লম্বা চওড়া আলোচ্য বিষয়। এখানে যার দিকে শুধু ইঙ্গিত দেয়া যেতে পারে। সম্পদ উৎপাদনের ব্যাপারে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনকে মুক্ত ছেড়ে দেয়া হয়েছে। যার ফলে সামাজিক ও নৈতিক উভয় ধরণের অবক্ষয় সৃষ্টি হয়।

অপর দিকে সমাজতন্ত্র ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের শক্তিকেই হরণ করে নিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে উৎপাদনের পরিমান (Quantity) এবং গুনগতমান (Quality) উভয়ের মধ্যেই হ্রাস সৃষ্টি হয়েছে। কেননা সমাজতন্ত্রে প্রত্যেককে নির্ধারিত পারিশ্রামিক প্রদান করা হয় এতে তার সে কাজের সাথে ব্যক্তিগত আগ্রহ থাকে না যা মন দিয়ে কাজ করার প্রতি উৎসাহিত করে। অনুমানের জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সমাজতান্ত্রিক প্রপাগাণ্ডার ফলে একবার পাকিস্থানে বিভিন্ন শিল্পকে সরকারী মালিকানায় নেয়া হয়েছিল। কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেল সরকারী মালিকাভূক্ত প্রতিষ্ঠান গুলো ক্রমান্বয়ে অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে। ফলে আবারো সে গুলোকে ব্যক্তিগত মালিকানায় দেয়া হচ্ছে। যার কারণে বর্তমানে Privatization পরিভাষা ব্যবহৃত হয়।

রুশেও এ অবস্থা হয়েছে। উৎপাদিত সম্পদের পরিমাণ ও গুণগত মান হ্রাস পেতে পেতে দেশ দেওলিয়া হওয়ার উপক্রম হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পরবর্তীতে ধ্বংশের শিকার হয়েছে। কিন্তু এর কয়েকবৎসর পূর্বে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতি নির্ধারকগণ কমিউনিজমকে উঠিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিলেন। সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান মিখাইল গর্বাচেভ নিজের লিখিত Perestroica নামক গ্রন্থে নতুন ভাবে দেশ গঠনের প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। সেখানে অবশ্য তিনি সরাসরি কমিউনিজমের বিরুদ্ধাচারণ করেননি তবে তার নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন এবং সে নতুন ব্যাখ্যায় অর্থব্যাবস্থাকে নতুন আঙ্গিকে সাজাতে Market Forces বাজারী শক্তিকে অবশ্যই কাজে লাগানোর উপর আলোকপাত করেছেন।

ইসলাম একদিকে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের ইচ্ছা শক্তিকে মেনে নিয়েছে যা উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগত মান বৃদ্ধির কারণ। আবার অপর দিকে সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় রোধে এর উপর বাধ্যবাধকতাও আরোপ করেছে। এছাড়া ধনতন্ত্রে পুঁজি বিনিয়োগ কারীর কারবারের উন্নয়নের সাথে কোন সম্পর্ক থাকে

না। কারবারে লাভ হোক বা লোকসান সর্বাবস্থায় বিনিয়োগ কারী নির্দিষ্ট হারে সুদ ভোগ করে। অপরদিকে ইসলামে সুদ হারাম। কারবারে শিরকত বা মুদারাবার ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয়। তাই কারবারের উন্নতির প্রতি তার ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা থাকে। এর দ্বারা সম্পদ উৎপাদনের উপর তার ব্যাপক প্রভাব পড়ে।

সম্পদ বন্টনের উপর তিন অর্থব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া

সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে সমাজতন্ত্রের দাবী ছিল পরিকল্পিত অর্থব্যাবস্থায় আয়ের সমতা সৃষ্টি হবে অর্থাৎ সকলেই সমান আয় পাবে। কিন্তু ইহা শুধু ধারণ প্রসূত স্বপ্ন ছিল। পরবর্তীতে কার্যত সমতা সৃষ্টিতো দুরের কথা ধারণা থেকে তুলে দেয়া হয়েছে এবং সেখানেও পারিশ্রামিকের মধ্যে ব্যাপক কমবেশী সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু সরকারই পারিশ্রামিক নির্ধারণ করতো সেহেতু সেখানে সাধারণ শ্রমিকের কোন কর্তৃত্ব ছিল না এবং তা বে ইনসাফী মনে হলেও এর বিপক্ষে তদবীর করার কোন সুযোগ ছিল না।

ধনতন্ত্রে শ্রমিক তার পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করতে চাইলে শ্লোগান দিতে পারে, প্রতিবাদের অন্যান্য মাধ্যম হরতাল ইত্যাদি করতে পারে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ ধরনের শ্লোগান বা প্রতিবাদ করার কোন অবকাশ নাই। এ জন্য কার্যত সমাজতন্ত্রে শ্রমিকের বিশেষ কোন উপকার হয় না। বরং শেষে দেখা গিয়েছে সমাজতান্ত্রিক দেশ সমূহের শ্রমিকদের মৌলিক জীবন ধনতান্ত্রিক দেশ সমুহের শ্রমিকদের থেকেও নিম্নমানের ছিল। ধনতন্ত্র থেকে বের হয়ে মানুষ সমাজতন্ত্রের সংকীর্ণতা দেখার পর আবারো ধনতন্ত্র কে স্বাগত জানিয়েছে। এই রেজাল্ট ঐ সমস্ত দেশ সমূহে বেশি সুস্পষ্ট ভাবে ভেসে উঠেছে যেখানে একই দেশের কিছু অংশে সমাজতান্ত্রিক ও কিছু অংশে ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার প্রভাব ছিল। যেমন পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী।

পশ্চিম জার্মানী উন্নতি করতে করতে অনেক উপরে চলে গিয়েছে পক্ষান্তরে পূর্ব জার্মানী অনেক পেছনে পড়ে আছে। সেখানকার শ্রমিকদের অবস্থা পশ্চিম জার্মানীর তুলনায় অনেক নিম্নমানের ছিল। এমন কি তারা অসহ্য হয়ে অফিস আদালত ভাংচুর করেছে এবং কার্যত সমাজতন্ত্রের অযোগ্যতা স্বীকার করেছে।

কিন্তু এর অর্থ এমন নয় যে, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদ বন্টন প্রকৃত ও যথাযথ। বরং ধনতন্ত্রের যে সকল ত্রুটির সমাধানের জন্য সমাজতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করেছে সেগুলো এখনো অবশিষ্ট আছে।

ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনকে লাগামহীন ছেড়ে দেয়ায় ইজারাদারী এখনো সৃষ্টি হয়। সুদ, জুয়া এবং সট্টার বাজার এখনো গরম। যার ফলে হাজার হাজার মানুষের সম্পদ কয়েকজনের হাতে পুঞ্জিভূত হতে চলেছে এবং সাধারণ মানুষের সুপ্ত আবেগ কে উৎসাহিত করে তাদের সম্পদ হাতিয়ে নেয়ার কাজ এখনো চালু আছে। অনেক ধনতান্ত্রিক দেশ সমূহে লক্ষ লক্ষ মানুষ এমন আছে যাদের মাথা গুজবার ঠাঁই নাই। শীতের রাতেও রেল ষ্টেশনের প্লাট ফরমে আশ্রয় নেয়।

সুদ, জুয়া, সাটটা এ অবস্থার জন্য অনেকাংশে দায়ী। জুয়া ও সাটটার মধ্যে এ কথা পরিস্কার যে, এগুলোর দ্বারা অনেক মানুষের পুঁজি এক ব্যক্তির পকেটে ভর্তি হয়। কিন্তু সুদের দ্বারা সম্পদ বন্টনের মধ্যে যে, অসমতা সৃষ্টি হয় সাধারণত তার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করা হয় না। অথচ সুদ সর্বদাই সম্পদ বন্টনের সমতা নষ্ট করে দেয়। কেননা যে ব্যক্তি অন্যের কাছে থেকে ঋণ নিয়ে কারবার করে। তার কারবার ক্ষতি গ্রস্থ হলেও ঋণ প্রদান কারী সুদের দাবী অব্যাহত রাখে। বরং সুদের মধ্যে সুদ হয়ে তার দেয় অর্থের পরিমাণ সীমাহীন বৃদ্ধি পায়। এভাবে ঋণ গ্রহিতা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। আর ঋণ প্রদান কারী লাভবান হচ্ছে।

অন্যদিকে যে ব্যাংক থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে বড় ধরণের কারবার করছে তার মোটা অংক লাভ হচ্ছে এর সামান্যতম অংশ সুদ হিসেবে ব্যাংককে এবং ব্যাংকের মাধ্যমে (ব্যাংকের) আমানতদারদের প্রদান করছে। অবশিষ্ট সমস্ত লাভ নিজের কাছে থাকছে এবং এভাবেই উভয় অবস্থায় সম্পদ বন্টনে অসমতা দেখা দিচ্ছে। একে আমরা একটি সাধারণ উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারি।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় এমন হয় যে দশলক্ষ টাকা নিজের ও নব্বই লক্ষ টাকা ব্যাংক থেকে নিয়ে বড় ধরণের কারবার করা যায়। এর লভ্যাংশ ও অনেক হবে। মনে করি লাভ শতকরা ৫০ ভাগ। তাহলে লাভ সহ পুঁজি দাঁড়ায় দেড় কোটি। সে ৫০ লক্ষ টাকা লভ্যাংশের মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা সুদ হিসেবে ব্যাংককে দেয়। ব্যাংক এটাকার মধ্যে নিজস্ব লাভ রেখে ১০/১২ লক্ষ টাকা হাজার হাজার আমানত দারদের দেয়।

যার সারকথা দাঁড়ায় এই কারবারের মধ্যে ৯০লক্ষ টাকা যারা যোগান দিল যাদের কারণেই ৫০ লক্ষ টাকা লাভ করা সম্ভব হলো তারা মাত্র ১০/১২ লক্ষ টাকা পেল। আর যে (উদ্যোক্তা) মাত্র ১০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করলো সে ৩৫ লক্ষ টাকা পেল। এরপরও সাধারণত উদ্যোক্তা ব্যাংককে দেয়া ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের মধ্যে ধরে নেয়। শেষ পর্যায়ে ইহাও সাধারণ মানুষের পকেট থেকে যায়। কেননা কারবারের উৎপাদিত পন্যের মূল্য নির্ধারণ করার সময় সুদ হিসেবে দেয়

অর্থও মূল্যে সংযোজন করে। যদি কারবারে কোন আসমানী বিপদ বা অন্য কোন দূর্ঘটনা ইত্যাদির কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হতে থাকে। তাহলে ইন্সুরেন্স কোম্পানীর মাধ্যমে সে ক্ষতি পুরণ করে। সে ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে ও হাজার হাজার জনসাধারণের পুঁজি জমা থাকে যারা মাসিক বা বাৎসরিক প্রিমিয়ামে নিজ আয়ের একটা অংশ জমা করতে থাকে। কিন্তু তাদের ব্যবসা কেন্দ্রেও আগুন লাগে না অন্য কোন দুর্ঘটনাও ঘটে না। তাই সাধারণত টাকা জমা করাই হয় বের করার সুযোগ কম হয়।

অপরদিকে এধরণের অনেক পুঁজিপতি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে ব্যাংককে ঋণ পরিশোধ করতে পারে না। যার ফলে ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায়। এ অবস্থায় পুঁজিপতিদের ক্ষতি কম হলো সমস্ত ক্ষতি ঐ আমানত দারদের উপর দিয়ে গেল যাদের জমাকৃত অর্থ দিয়েই পুঁজিপতির কারবার চলতো।

সারকথা হলো সুদী নীতির কারণে পুরো জাতির পুঁজি কয়েকজন বড় পুঁজি পতির উপকারে ব্যবহৃত হয় এবং এর বিনিময়ে জাতিকে সামান্য অংশ ফেরৎ দেয়া হয়। এই সামান্য অংশও পন্যের উৎপাদন খরচে হিসাব করে আবারও সাধারণ ক্রেতাদের থেকেই উসুল করা হয়। নিজের ক্ষতি পূরণও সাধারণ জনগনের পকেট থেকেই করা হয়। এভাবে সুদের মোট কথা সাধারণ জনগণের পকেটের কারবারী সুবিধা বেশীর ভাগ বড় পুঁজি পতিরাই ভোগ করে, সাধারণ জনগন খুব কমই উপকৃত হয় এভাবে সম্পদের ঢেউ সর্বদা উপরের দিকেই হয়ে থাকে।

আফসোসের কথা হলো যখন থেকে পৃথিবীতে শিল্প বিপ্লব আরম্ভ হয়েছে তখন থেকে কোন দেশ এমন উদাহরণ পেশ করতে পারে নাই যেখানে শিল্প ও ব্যবসার উন্নতির সাথে সাথে ইসলামী অর্থব্যবস্থাও পুরাপুরি চালু হয়েছে। তাই কার্যত নমুনার ভিত্তিতে এ কথা বলার কোন অবকাশ নাই যে, ইসলামী শিক্ষার বাস্তবায়নে সম্পদ বন্টনে কিভাবে সমতা সৃষ্টি হয়। তবে নিরেট তাত্ত্বীক দিকে চিন্তা করলে খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে, ইসলামী শিক্ষার বাস্তবায়নেই সম্পদ বন্টনের মধ্যে সমতা সৃষ্টি হতে পারে।

শুধু সুদ হারাম এ মাসআলাটি নিয়ে চিন্তা করলেই একথা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কেননা সুদ হারাম হওয়ার পর কোন কারবারে পুঁজির যোগান লাভ ক্ষতিতে অংশীদারের ভিত্তিতে হতে পারে যার ফলে ঋণ গ্রহন কারীর ক্ষতি হলে ঋণদাতাও অংশীদার হবে। লাভ হলে উভয়েই লাভবান হবে। তাই উল্লেখিত উদাহরণে যদি পুঁজিপতি ব্যক্তি ব্যাংক থেকে নব্বই লক্ষ টাকা নেয়ার সময় শিরকত বা মুদারাবার ভিত্তিতে লেনদেন করে এবং উভয়ের মাঝে শতকরা

৬০ ভাগ ও ৪০ ভাগের সমতাও নির্ধারণ হয় তাহলে ৫০ লক্ষ লাভ হলে কমপক্ষে ২০ লক্ষ ব্যাংককে ফেরৎ দিতে হবে। ব্যাংককে ফেরৎ দেয়া অর্থ যেহেতু পন্য বিক্রয়ের পরই নির্ধারিত হবে তাই উহাকে উৎপাদন খরচে হিসাবে করে সাধারণ জনগনের পকেট থেকে উসুল করা যেতে পারে না।

অতঃপর পুঁজিপতির যে লাভ অর্জিত হলো এর মধ্যে জাকাত সাদকা ইত্যাদির মাধ্যমে গরীব জনগনের প্রতি প্রর্তাবর্তনে বাধ্য থাকবে। যার প্রকাশ্য ফল হলো সম্পদ গুটি কয়েক পুঁজিপতির স্থলে দেশের সাধারণ জনতার দিকে হবে এবং যে সকল সাধারণ জনগণের পকেটের পয়সার দ্বারা দেশের শিল্প বাণিজ্য প্রশস্ততা লাভ করছে তার লভ্যাংশে তারাও মোটা অংশের অংশীদার হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কারবারের বিভিন্ন প্রকারভেদ

Different kinds of Business.

সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় সকল কার্যক্রম রাষ্ট্রীয় পলিসির আধনে চলে তাই সেখানে ব্যক্তি গত কারবারের প্রশ্নই উঠে না। ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার আলোকে কারবার বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে।

মালিকানা হিসাবে কারবার ৩ প্রকারঃ

১. এক মালিকানা কারবার (Private Proprietorship)

২. অংশীদারী কারবার (Partnership)

৩. যৌথ মূলধনী কারবার (Joint stock company)

মানুষ যখন থেকে কারবার আরম্ভ করে প্রথম দু প্রকারের কারবার তখন থেকেই চলে আসছে। ফুকাহায়ে কেরাম এগুলোর মৌলিক ব্যাখ্যা এবং আহকাম বর্ণনা করেছেন। এগুলোর বর্তমান অবস্থাও মৌলিক ভাবে অতীতের মতই তাই ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়োজন নাই। কোম্পানী কারবারের একটি নতুন প্রকার।

ফুকাহায়ে কেরামের যুগে যার অস্তিত্ব ছিল না। এখানে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করা হলো।

কোম্পানীর পরিচিতি

কোম্পানীর শাব্দিক অর্থ অংশীদারিত্ব কখনো সহকর্মীকেও কোম্পানী বলা হয়। অনেক কোম্পানীর নাম "অমুক এণ্ড কোম্পানী" লেখা হয়। সেখানে কোম্পানীর শাব্দিক অর্থই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে আরবীতে فلان وشركاء দ্বারা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু যখন এণ্ড শব্দ ছাড়া কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নাম কোম্পানী হয় যেমন ঃ তাজ কোম্পানী তখন পারিভাষিক অর্থই উদ্দেশ্য হয়। সাধারণত এমন কোম্পানীর সাথে লিমিটেড শব্দ থাকে। যার ব্যাখ্যা সামনে আসবে। ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর সতের শতকের শুরুতে বড় বড় কারখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করার জন্য যখন মোটা অংকের পুঁজির প্রয়োজন হলো যা একজন বা কয়েকজনের পক্ষে যোগান দেযা সম্ভব ছিল না। তখন সাধারণ জনগণের বিক্ষিপ্ত সঞ্চয়কে একত্রিত করে সামগ্রীক উপকার ভোগ করার জন্য কোম্পানী নীতির আবির্ভাব হলো। অংশীদারিত্বে প্রত্যেক অংশীদারের ভিন্ন ভিন্ন মালিকানা থাকে কিন্তু এই নীতির বৈশিষ্ট হলো কয়েকজন ব্যক্তিকে একত্রে আইনানুগ এক ব্যক্তি সাব্যস্তকরা হয়। আইনানূগ এক ব্যাক্তিকে কর্পোরেশন বলা হয়। যার এক প্রকার কোম্পানী।

প্রথমত এই কোম্পানী গুলো প্রায় আধা সরকারী হত। রাষ্ট্রের চ্যার্টারের (সনদ) অধীনে বেসরকারী বাণিজ্যের জন্য অস্তিত্ব লাভ করতো এবং তাদের ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হত। বাণিজ্য নীতি প্রনয়ন, মুদ্রা তৈরী, সৈন্য বাহিনী ও পুলিশ রাখার অধিকারও ছিল। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এধরণের কোম্পানী ছিল। বর্তমানে এধরণের ব্যাপক ক্ষমতা সম্পন্ন কোম্পানীর অস্তিত্ব নাই। শুধু বাণিজ্যিক কোম্পানী আছে যা রাষ্ট্রের অনুমোদনে প্রতিষ্ঠান লাভ করে কোম্পানী গঠনের অনুমোদন ও কন্ট্রোল করার কাজ যে প্রতিষ্ঠান পালন করে আমাদের দেশে তাকে Corporate law Authority বলে । যা অর্থ মন্ত্রনালয়ের অধিনে পরিচালিত হয়।

কোম্পানী গঠন পদ্ধতি

সর্ব প্রথম অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শে একটি রিপোর্ট তৈরী করা হয়। সেখানে কারবারের সম্ভাবনা, উপকারিতা , পুঁজির পরিমাণ , বাণিজ্যিক দৃষ্টিতে এ পুঁজির মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ের সিদ্ধান্ত করা হয়। এই রিপোর্ট বিভিন্ন শাখার অভিজ্ঞদের মাধ্যেমে তৈরি করা হয়। একে تَقْدِيْرُ الْإِمْكَانِيَّاتِ (Feasibility Report) সম্ভাব্যতা রিপোর্ট বলে। অতঃপর কোম্পানীর সংক্ষিপ্ত কাঠামো তৈরী করা হয় যেখানে কোম্পানীর নাম, কারবারের প্রকার, কাংখিত পুঁজি, ব্যবস্থাপক, ভবিষ্যতে বরখাস্ত ও নিয়োগ দানের পদ্ধতি ইত্যাদি লেখা হয়। একে مذكره (Memorandum,) পরিমেল বদ্ধ বলে।

সর্বশেষে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার নীতি সমূহ লিখা হয়। একে نِظَامُ الْجَمْعِيَّةِ অথবা لَائِحَةُ الْجَمْعِيَّةِ ইংরেজিতে Articles of Association. বাংলায় পরিমেল নিয়মাবলী বলে, মেমোরেন্ডম এবং আরটিকেলস অব এসোসিয়েশন সহ সরকারের কাছে কোম্পানীর অনুমোদনের জন্য দরখাস্ত দেয়া হয়। মন্ত্রানালয়ের পরিচালনাধীন সংস্থা কর্পোরেট ল অথারিটির অনুমোদন পেলে কোম্পানী অস্তিত্ব লাভ করে।

আইন এখন তাকে একক ব্যক্তি সাব্যস্ত করে ফলে যে ক্রেতা-বিক্রেতা বাদী বিবাদী, এবং ঋণ প্রদানকারী-গ্রহনকারী হয়। একে আইনানুগ এক ব্যক্তি (Legal person/juristic person/ juridical person) বলে। অনেক সময় তাকে কাল্পনিক ব্যক্তি(Fictitious person) বলে। কোম্পানী অস্তিত্ব লাভ করার পর অন্যান্যদের অংশীদার হওয়ার দাওয়াত দেয়ার জন্য পুরা কর্ম পদ্ধতি ও নির্মিত অবকাঠামো প্রচার করে যেন সাধারণ জনগনের এই কোম্পানীর উপর আস্থা জন্মে। কোম্পানীর মৌলিক কর্মপদ্ধতি ও তৎসংক্রান্ত বিবরণ জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য যে লিখিত বর্ণনা প্রকাশ করা হয় তাকে আরবীতে نَشْرَةُ الْإِصْدَارِ (Prospectus) বিবরণ পত্র বলে।

কোম্পানীর পুঁজি ঃ

সরকার কোম্পানীর অনুমোদন দেয়ার সময় পুজি নির্ধারণ করে দেয়। যেন নির্ধারিত পুজি সংগ্রহে কোম্পানী শেয়ার ছাড়তে পারে বা অংশীদারিত্বের দাওয়াত দিতে পারে। তাকে رَأْسُ الْمَالِ الْمُصَرَّحِ بِهِ / رَأْسُ الْمَالِ الْمَسْمُوْعِ Authorised Capital) অনুমোদন মূলধন বলে। পুঁজির একটি নিদিষ্ট পরিমাণ ঠিক করে দেয়া হয় যা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা কারীদের পক্ষ থেকে বিনিয়োগ করা হয়। একে Sponsors Capital বলে।

শেয়ার ছাড়ার পর সাধারণ জনগন অথবা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতাগন যে পুঁজির শেয়ার নেয়ার অঙ্গিকার করে তাকে (Subscribed Capital) বিলিকৃত মূলধন বলে। যারা কোম্পানীতে অংশ (Subscription) নিয়েছে এবং পুঁজি যোগানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাদের থেকে তাৎক্ষনিক পুঁজি সংগ্রহ করা আবশ্যক নয় বরং আস্তে আস্তে পরিশোধ করতে থাকে।

পরিশোধ কৃত অংশকে رَأْسُ الْمَالِ الْمَدْفُوْعِ (Paid Up Capital) বলে। কোম্পানী যে পুঁজির শেয়ার ছেড়ে সাধারণ জনগনকে অংশীদারের দাওয়াত দেয় তাকে رَأْسُ الْمَالِ الْمَعْرُوْضِ (Issued Capital) ইস্যুকৃত বা বিলিযোগ্য মূলধন বলে। মানুষ ফরম পুরণ করে যে পরিমান অংশ ক্রয় করার অংঙ্গীকার করে তাকে رَأْسُ الْمَالِ الْمُكْتَتَبِ অথবা رَأْسُ الْمَالِ الْمُسَاهِمِ (Subscribed Capital) বিলিকৃত মূলধন বলে। যেমন মনে করি কোম্পানীর ১০০ মিলিয়ন টাকা কারবার করার অনুমোদন পেয়েছে তাহলে ১০০ মিলিয়ন টাকা Authorised Capital। এর মধ্যে ২০ মিলিয়ন কোম্পানী প্রতিষ্ঠাতাদের দায়িত্বে। যার মধ্যে ১০ মিলিয়ন টাকা তারা দিয়েছে। ইহা Sponsors Capital এর আদায়কৃত (Paid Up Capital) পুঁজি। ৮০ মিলিয়ন সাধারণ জনগন থেকে উসুল করা হয়। যার মধ্যে এখন ৬০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার ছাড়া হয়।

অবশিষ্ট ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। এই ৬০ মিলিয়ন টাকা (Issued Capital) ৬০ মিলিয়ন টাকার মধ্যে মানুষেরা ৫০ মিলিয়ন টাকার ফরম একত্রিত করলে ইহা Subscribed Capital. আবেদন বেশি আর জারীকৃত পুজি কম হলে লটারী করা হয়। যাদের নাম লটারীতে আসে তাদের আবদনই কেবল গ্রহণ করা হয়। কখনো আবেদন পুঁজির চেয়ে কম উসুল হয়।

যতগুলো শেয়ার ছাড়া হয়ে ছিল মানুষ তা নেয় নাই। তখন তা পুরণের জন্য ব্যাংক বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের থেকে এই মর্মে জিম্মাদারী নেয়া হয় যে, যে পরিমাণ মানুষেরা নেয় নাই তা আমরা নেব। একে ضَمَانُ الْاِكْتِتَابِ

(Under writing) ঝুকি গ্রহণ বলে। ব্যাংক এই জিম্মাদারীর উপর কোম্পানীর থেকে কমিশনের হার নির্ধারণ করে। যেমন উল্লেখ থাকে যে, পূর্ণ পুঁজির শতকরা একটি অংশ আমি নিব।

ব্যাংক কোম্পানীর শেয়ার হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় এই কমিশন গ্রহণ করে। তবে ব্যাংক শেয়ার নিলে তা নিজের কাছে না রেখে অপরের কাছে বিক্রয় করে দেয়। এই জিম্মাদারী এক ব্যাংক থেকেও নেয়া যায় আবার অল্প অল্প করে কয়েক ব্যাংক থেকেও নেয়া যায়।

কোম্পানীর শেয়ার ঃ

যখন মানুষ কোম্পানীর শেয়ার নিয়ে পুঁজি দিয়ে দেয় তখন কোম্পানী তাদেরকে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করে। যা এই ব্যক্তির কোম্পানীর একটি নির্দিষ্ট অংশের অংশীদার হওয়ার প্রমান পত্র যাকে Shareবলে।

যে পরিমাণ পুঁজির দ্বারা কারবার চালু করা হয় সে পুঁজিকে প্রত্যেক এককের উপর বন্টন করে প্রত্যেক একককে এক এক অংশেরমূল্য সাব্যস্ত করা হয়। যেমন বর্তমানে সাধারণত দশ টাকার শেয়ার চালু করা হয়। এই মূল্য শেয়ারের উপর লিখে দেয়া হয় এটি সেই টাকা যা পরিশোধের পর সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এই মূল্যকে আরবীতে اَلْقِيْمَةُ الْاِسْمِيَّةُ (Face Value/Par Value) লিখিত মূল্য বলে। কখনো শেয়ারে অংশীদারদের নাম উল্লেখ করা হয়। একে اَلسَّهْمُ الْمُسَجَّلُ (Registered Share)নিবন্ধিত শেয়ার বলে। কখনো শেয়ারে নাম উল্লেখ থাকে না। যার হাতে থাকে তাকেই মালিক ধরা হয়। একে اَلسَّهْمُ الْحَامِلَةُ (Bearer Share) বাহক শেয়ার বলে।

শেয়ারের আরেকটি শ্রেণীবিভাগ অংশীদারদের অধিকারের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। অর্থাৎ লভ্যাংশ গ্রহণ করা বা কোম্পানীর পলিসিতে প্রবেশ করা হিসাবে ও শেয়ার দুই প্রকার।

১. اَلسَّهْمُ الْعَادِىْ (Ordinary Share) সাধারণ শেয়ার

২. اَلسَّهْمُ الْمُمْتَازُ (Preference Share) অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার।

এ দুই প্রকার শেয়ারের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো দ্বিতীয় প্রকারের বাহককে লভ্যাংশ বন্টনে বা অধিকার সংরক্ষণে প্রথম প্রকারের বাহকের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়। দ্বিতীয় প্রকারের অগ্রাধিকারের কারণ কয়েকটি।

১. اَلسَّهْمُ الْمُمْتَازُ (Prefrence Share) অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ারের লভ্যাংশ বিনিয়োগকৃত পুঁজির বিশেষ হার অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। (যেমন বিনিয়োগকৃত পুঁজির শতকরা ১০ ভাগ) প্রথমে اَلسَّهْمُ الْمُمْتَازُ (Preference Share) এর

বাহকদের লভ্যাংশ বন্টন করে তাদের নির্ধারিত লাভ পৌছানো হয়। এর পর অবশিষ্ট থাকলে اَلسَّهْمُ الْعَادِىْ (Ordinary Share) এর বাহকদের প্রদান করা হয়। অবশিষ্ট না থাকলে বঞ্চিত হয়। কোন বৎসর কোম্পানী লাভবান না হলে اَلسَّهْمُ الْمُمْتَاز (Preference Share) এর লভ্যাংশ সংরক্ষিত থাকে। পরবর্তী বৎসর লাভবান হলে প্রথমে তাদের দেয়া হয়। তারপর অবশিষ্ট লভ্যাংশ السهم العادى (Ordinary Share) এর বাহক দের দেয়া হয়।

২. কখনো اَلسَّهْمُ الْمُمْتَازُ (Preference Share) এর লভ্যাংশের হার اَلسَّهْمُ الْعَادِىْ (Ordinary Share) এর চেয়ে বেশি রাখা হয়।

৩. কখনো কাম্পানীর বার্ষিক বৈঠকে اَلسَّهْمُ الْمُمْتَاز (Preference Share) এর বাহকদের ভোটের অধিকার থাকে। اَلسِّهَامُ الْعَادِىْ (Odinary Share) এর বাহকদের থাকে না।

৪. কখনো اَلسَّهْمُ الْمُمْتَاز (preference Share) এর বাহকদের বেশী ভোটের অধিকার থাকে আর اَلسَّهْمُ الْعَادِىْ (Ordinary Share) এর বাহকদের কম ভোটের অধিকার থাকে। যেমন তাদের দুটি ভোটের অধিকার থাকলে এদের থাকে একটি। সার কথা ঃ اَلسَّهْمُ الْمُمْتَاز (Preference Share) অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ারের নাম। তবে অগ্রাধিকারের বিভিন্ন রূপ হতে পারে। সাধারণত এর প্রয়োজন তখনই হয় যখন কোন বিশেষ বড় পার্টি যেমন ইন্সুরেন্স কোম্পানীর কাছ থেকে পঁজি নেয়া হয়।

এ পার্টি সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের মত শুধু অর্থ বিনিয়োগ কারী নয়। কারণ তাতে যেখানে লভ্যাংশ নির্ধারিত হয় না। আবার শুধু ঋণ দাতার মতও নয় যে সুদের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করবে। কারণ শুধু ঋন দাতা হলে সে কোম্পানীর পলিসির ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। এমন পাটির কাছ থেকে পুঁজি নেয়ার জন্য তাকে অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার দেয়া হয়। যেন সে নির্ধারিত লভ্যাংশও পায় এবং কোম্পানীর অংশীদার হতে পারে। তাই ইহা এক হিসাবে ঋণদাতা আরেক হিসাবে অংশীদার।

কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ঃ

কোম্পানী আইনানুগ এক ব্যক্তি যা অস্তিত্বে আসার পর কারবার শুরু করবে। কিন্তু ইহা প্রকৃত ব্যক্তি না হওয়ায় আইনানুগ ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অংশীদারদের মধ্য থেকে কয়েকজন কে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয় যারা কারবার পরিচালনা করে। একে مَجْلِسُ الْإِدَارَةِ (Board of Dicrectors) বলে। সমস্ত শেয়ার হোল্ডারদের ভোটে এই কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির সদস্যবৃন্দ আবার তাদের মধ্যে একজন কে প্রধান নির্বাচিত করেন। তাকে اَلْعُضْوُ الْمُنْتَدَبُ (Chief Executive) বলে।

এই (Chief Executive) বা প্রধান নির্বাহী বোর্ড অব ডাইরেকটরস থেকেও হতে পারে বাহির থেকেও কাউকে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। যিনি বোর্ডের কার্যধারার ভিত্তিতে কাজ করবেন। সমস্ত শেয়ার হোল্ডারদের একটি বার্ষিক ইজতেমা হয় যাকে اَلْجَمْعِيَّةُ الْعُمُوْمِيَّةُ السَّنَوِيَّةُ (Annual General Meeting) বার্ষিক সাধারণ সভা বলে। সংক্ষেপে (A.G.M) এর মধ্যে কারবারের কার্যধারা, হিসাব, অডিট রির্পোট ইত্যাদি পেশ করা হয়। আগামীর জন্য ডাইরেক্টারদের নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেক অংশের একটি করে ভোট থাকে। যেমন কারো কাছে ১০ টি শেয়ার থাকলে ১০ টি ভোটের মালিক হন। বার্ষিক সভায় ভোট দেয়ার পর শেয়ার হোল্ডারদের কোম্পানীর কারবারের মধ্যে কার্যত কোন অধিকার থাকে না।

কোম্পানী অস্তিত্ব লাভ করার পর বিলোপ সাধনের পথ দুইটি, হয়তো (A.G.M.) এর মধ্যে কোম্পানীর বিলোপ সাধনের সিদ্ধান্ত হবে অথবা দেওলিয়া হয়ে যাবে। যখন ঋণ সম্পদ থেকে বেশী হবে। উভয় অবস্থায় সম্পৃক্ত আইনগত সংস্থার কাছে কোম্পানী বিলোপ সাধনের অনুমতি নেয়া জরুরী। আইনগত অনুমতি নেয়া ছাড়া কোম্পানীর অস্তিত্ব বিলোপ সাধন করা যায় না। সাধারণত এমন অবস্থায় সরকারের পক্ষ থেকে কোম্পানীর আসবাব পত্র ঋণ প্রদানকারী অথবা অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করার জন্য একজন ব্যবস্থাপক নির্ধারণ করা হয়। একে (Receiver) তত্ত্বাবধায়ক বা (Liauidator) কারবারের দেনা পাওনা মিটিয়ে উহা তুলে দেয়ার জন্য নিযুক্ত কর্মচারী বলে।

লভ্যাংশের বন্টন ঃ

কোম্পানী সারা বৎসর কারবার করার পর বাৎসরিক মুনাফার হিসাব করে এবং লভ্যাংশের পরিমাণ বের করে। এরপর এই লভ্যাংশের একটি অংশ সতর্কতামূলক সংরক্ষণ করে রাখে যেন আগামীতে কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্থ হলে এই লভ্যাংশ দ্বারা ক্ষতিপূরন করতে পারে। একে আরবীতে احتياطى ও ইংরেজিতে (Reserve) রিজার্ভ বলে।

বোর্ড অব ডাইরেক্টরস সাধারণত এই রিজার্ভ মুনাফার পরিমাণ নির্ধারণ করে। আইনগত ভাবেই এই রিজার্ভের পরিমান সীমিত। যেন কর ফাকী দেয়ার জন্য কোন কোম্পানী বেশি লভ্যাংশ রিজার্ভে না রাখতে পারে। কারণ রিজার্ভ লভ্যাংশ বাদ দিয়ে বাকী লভ্যাংশের উপরই কর আরোপ করা হয়। রিজার্ভ বের করার পর অবশিষ্ট লভ্যাংশ শেয়ার হোল্ডারদের মাঝে বন্টন করা হয়। কোম্পানীর মুল লাভকে اَلرِّبْحُ (Profet) মুনাফা, সতর্কতা মূলক যা সংরক্ষণ করা হয়েছে তাকে اَلْاِحْتِيَاطِىُّ (Reserve) রিজার্ভ বলে অবশিষ্ট লভ্যাংশ যা বন্টন হবে ইহাকে اَلرِّبْحُ الْمُوَزَّعُ (Dividend) কারবারের লভ্যাংশ বলে। (Profet) ও (Divident) উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো-

সামগ্রীক লভ্যাংশকে (Profet) বা মুনাফা আর রিজার্ভ বের করার পর অবশিষ্ট লভ্যাংশকে (Divident) বা কারবারের লভ্যাংশ বলে। (profet) আইনানুগ ব্যক্তি কোম্পানীর লভ্যাংশ আর (Divident) শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ।

Divident বন্টনের পদ্ধতি দুটি, কখনো নগদ লভ্যাংশ মানুষের মাঝে বন্টন করা হয়। কখনো এই লভ্যাংশের উপর দ্বিতীয় বার শেয়ার চালু করা হয়। এধরণের অংশকে (Bonus Share) অধিবৃত্তি শেয়ার বলে। এই শেয়ার চালু করার দ্বারা কোম্পানীর পুঁজি বৃদ্ধি পায়। সাধারণত এমনটি হয় যখন কোম্পানীর ক্যাশ পজিশন দুর্বল হয়। অর্থাৎ তার কাছে নগদ অর্থ কম হলে নগদ মুনাফা দেয়ার স্থলে অতিরিক্ত শেয়ার জারী করে দেয়া হয়। যেমন কোন অংশীদারকে ১০ টাকা দেয়ার স্থলে ১০ টাকার শেয়ার দেয়া হয়। তবে এর জন্য অনুমোদিত পুজিতে (Authorised Capital) অবকাশ থাকতে হবে। যেমন ৮০ মিলিয়নের অনুমোদন পেয়েছিল কিন্তু এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ৬০ মিলিয়ন চালু করা হয়েছে ২০ মিলিয়ন এখনো বাকী আছে।

যদি অনুমোদিত পুঁজিতে এর অবকাশ না থাকে তাহলে দ্বিতীয়বার দরখাস্ত দিয়ে অনুমতি নিতে হবে। বনাস শেয়ার চালু করার জন্য আরেকটি আবশ্যকীয় বিষয় হলো কোম্পানীর শেয়ারের (Market Value) বাজার দর (Face Value) লিখিত মূল্যের চেয়ে কম না হতে হবে। বাজার দর কম হলে বনাস শেয়ার চালু করায় শেয়ার হোল্ডারদের ক্ষতি হবে যেমন ১০ টাকায় শেয়ার মূল্য বাজারে ৯ টাকা হলে অংশীদারগণ ৯ টাকার শেয়ার পাবে। তাই সে ১ টাকা ক্ষতিগ্রস্থ হলো।

লিমিটেড কোম্পনীর পরিকল্পনা ঃ

লিমিটেড কোম্পানীকে اَلْمُشَرَّكَةُ الْمَحْدُوْدَةُ বলে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য مَسْؤُلِيَّةٌ (Liability) দায় সীমিত হওয়া।

লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারদের দায় বিনিয়োগকৃত পুঁজির মধ্যেই সীমিত থাকে। অর্থাৎ কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্থ হলে বেশীর চেয়ে বেশী তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থ লস হলো। কোম্পানী অতিরিক্ত ঋণী হলে শেয়ার হোল্ডারদের থেকে বিনিয়োগকৃত পুঁজির বেশি চাওয়া যাবে না। তেমনি কোম্পানীর দায় তার আসবাব পত্র পর্যন্তই সীমিত হবে। ঋণ আদায় করার জন্য কোম্পানীর আসবাব পত্র ক্রোক করা যেতে পারে এর চেয়ে বেশি প্রাপ্তি তলব করা যাবে না। তাই লিমিটেড কোম্পানীর সাথে লিমিটেড লেখা জরুরী। যেন ঋণ দাতা জেনে ঋণ প্রদান করে। সাধারণত কোম্পানীগুলো লিমিটেডই হয় কখনো অংশীদারিত্বও (Partner Ship) লিমিটেড হয়ে থাকে।

প্রাইভেট কোম্পানী

কোম্পানী দুই প্রকার ঃ

১. পাবলিক কোম্পানী (شركت عامه)

২. প্রাইভেট কোম্পানী (شركت خاصه)

এযাবৎ পর্যন্ত পাবলিক কোম্পানীর আলোচনা করা হলো।

প্রাইভেট কোম্পানীও আইনানুগ এক ব্যক্তি কিন্তু তার অংশীদারদের সংখ্যা সীমিত। কমপক্ষে ২ জন ও অধিক ক্ষেত্রে ৫০ জন হতে পারে। এতে পুঁজির শেয়ার চালু করা হয় না। প্রসপেকটাস প্রচার করা হয় না এবং শেয়ার ষ্টক এক্সচেঞ্জে বিক্রয় হয় না। প্রাইভেট কোম্পানীর সাথে প্রাইভেট লেখাটাই যুক্তি সংগত।

অংশীদারিত্ব এবং কোম্পানীর মধ্যে পার্থক্য ঃ

অংশীদারিত্ব (Partner Ship) কে আরবীতে اَلشِّرْكَةُ। (শিন যের বিশিষ্ট শিরকত) বলে। কোম্পানীকে شَرِكَةُ الْمُسَاهَمَةِ (শিন যবর বিশিষ্ট ও "রা" যের বিশিষ্ট শারিকাত) বলে।

উভয়ের মধ্যে কয়েকটি প্রসিদ্ধ পার্থক্য বিদ্যামান। অংশীদারিত্বে প্রত্যেক ব্যক্তি কারবারের সমস্ত আসবাব পত্রের যৌথভাবে মালিক হয়। যেমন কোন ঋণ দায়িত্বে এলে অংশীদার সমান দায়িত্ব বহন করে। প্রত্যেক অংশীদার অপরের উকীল হয়, প্রত্যেকের দায় দায়িত্ব সমান হয়। যেমন ঃ কোন ঋণ দায়িত্বে এলে সকল অংশীদার সমান ভাবে দায়িত্ব বহন করে। কিন্তু কোম্পানীতে এমন হয় না। কোম্পানী আইনানুগ এক ব্যক্তি। এর ভিন্ন অস্তিত্ব আছে এবং অংশীদারদেরও ভিন্ন অস্তিত্ব আছে।

কোম্পানীর অংশীদারগণ এ হিসাবে কোম্পানীর আসবাব পত্রের মালিক যে, যদি কোম্পানী ভেঙ্গে যায় এবং তার আসবাব পত্র বন্টন হয় তাহলে সে তার অনুরূপ অংশ পাবে। কিন্তু কোম্পানী ভাঙ্গার পূর্বে আইন অংশীদারদের এ অধিকার মেনে নেয় না। এ কারণেই যদি কোন শেয়ার হোল্ডার ঋণী হয় এবং তার আসবাব পত্র ক্রোক করা হয় তাহলে তার হাতের শেয়ার ক্রোক হলো কিন্তু তার শেয়ারের অনুপাতে কোম্পানীর আসবাব পত্রে তার অংশের ক্রোক হবে না। কেননা কোম্পানীর আসবাব পত্রে আইনগত ভাবে তার হস্তক্ষেপের অধিকার নাই।

(২) অংশীদারিত্বে কারবারের পক্ষ থেকে কাউরো উপর অথবা কাউরো পক্ষ থেকে কারবারের উপর দাবী উত্থাপন হলে সমস্ত অংশীদার বাদী বিবাদী হবে।

কিন্তু কোম্পানী নিজেই আইনানুগ এক ব্যক্তি হওয়ায় কোম্পানী নিজে বাদী বিবাদী হবে। শেয়ার হোল্ডারগণ হবে না। আদালতে ব্যাবস্থাপনা পরিচালক এই আইনানুগ ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করবে।

(৩) অংশীদারিত্বের ভিন্ন ভাবে আইনগত কোন অস্তিত্ব নাই। কোম্পানীর আইনগত অস্তিত্ব আছে যাকে আইনানুগ এক ব্যক্তি বলে।

(৪) অংশীদারিত্বে কোন অংশীদার অংশীদারিত্ব বন্ধ করে নিজের পুঁজি বের করতে চাইলে করতে পারে। কোম্পানীতে নিজের পুঁজি বের করা যায় না তবে শেয়ার বিক্রয় করা যেতে পারে।

(৫) অংশীদারিত্বে সাধারণত দায় কারবারের আসবাব পত্র পর্যন্ত সীমিত হয় না। কোম্পানীতে দায় সীমিত হয়।

কোম্পানীর ফাণ্ড জমায়েত ঃ

কোম্পানীর প্রাথমিক কিছু পুঁজি (Sponsers) অর্থাৎ কোম্পানী তৈরী কারীদের পক্ষ থেকে হয় । পুঁজির বৃহৎ একটি অংশ শেয়ার চালু করে জনসাধারণ থেকে অর্জন করা হয়। তবে সাধারণত এই পুঁজি কোম্পানীর জন্য যথেষ্ট হয় না। ক্রমান্বয়ে অতিরিক্ত পুঁজি অর্জন করার প্রয়োজন দেয়া দেয়। এর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

(১) কখনো অতিরিক্ত পুঁজি অর্জনের জন্য কোম্পানী অতিরিক্ত শেয়ার চালু করে। অনুমোদিত (Authrised) পুঁজিতে এর সুযোগ থাকুক বা পুনরায় অনুমতি নেয়া হোক। তবে বর্তমানে জারীকৃত শেয়ারে পূর্বের শেয়ার হোল্ডারদের প্রাধান্য থাকে অর্থাৎ তারা নতুন শেয়ার নিলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিতে পারে। যে নতুন শেয়ারে পুরাতন শেয়ার হোল্ডারদের অগ্রাধিকারের অধিকার থাকে একে سِهَامُ الاَولَوِيَّة (Right Shares) বলে। এ অধিকার شُفْعَه জমির প্রতিবেশী হিসাবে আসে। এতে পুরাতন শেয়ার হোল্ডারদের দুটি লাভ হয়।

(ক) সাধারণত কোম্পানী কারবার শুরু করার পর শেয়ারের বাজার দর (Market Value) লিখিত মূল্য (Face Value) থেকে বেশি হয়। এজন্য শেয়ার ক্রয় করলে মুনাফা অর্জন হয়। এই মুনাফা অর্জনের অধিকার প্রথমে পুরাতন শেয়ার হোল্ডারদের দেয়া হয়। যেমন ঃ লিখিত মূল্য ১০ টাকা এবং বাজার দর ২০ টাকা। তাহলে শেয়ার ১০ টাকায় পাওয়া যাবে। কিন্তু বিক্রয় হবে ২০ টাকায়। শেয়ার গ্রহিতার ১০ টাকা মুনাফা অর্জিত হলো।

(খ) দ্বিতীয় লাভ হলো অতিরিক্ত পুঁজির শেয়ার জারী করার দ্বারা শেয়ার হোল্ডারদের অংশীদারিত্ব তুলনা মুলক হ্রাস পায়। তার অংশীদারিত্ব বহাল রাখতে নতুন শেয়ার ক্রয় করার জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অধিকার দেয়া হয়। যেমন

প্রথমে কোম্পানীর ১ লক্ষ টাকা পুঁজি ছিল এর মধ্যে কেহ দুই হাজার টাকার শেয়ার নিয়েছে। তার অংশীদারিত্বের মালিকানা শতকরা ২ ভাগ। অতঃপর যখন কোম্পানী অতিরিক্ত ১ লক্ষ টাকার শেয়ার জারী করবে তখন কোম্পানীর পুঁজি ২ লক্ষ টাকা হলো।

২ হাজারের তুলনায় ২ লক্ষ টাকা শতকরা ১ভাগ হয়ে যাবে। এ জন্য তাকে অধিকার দেয়া হয়েছে যেন, অতিরিক্ত দুই হাজারের শেয়ার নিয়ে আবারো শতকরা ২ ভাগের মালিকানা করে নেয়।

(২) অতিরিক্ত শেয়ার জারী করায় অনেক সমস্যা ও আছে। যেমন পুঁজি মঞ্জুরীর সীমারেখা ও বাধ্যবাধ্যতা আরোপ হয়। শেয়ার হোল্ডার বৃদ্ধি পায় এবং তাদের কোম্পানীর উপর কর্তৃত্ব থাকে। এ ধরণের সমস্যাবলীর কারণে অনেক কোম্পানী অতিরিক্ত শেয়ার জারী করার পদ্ধতি পছন্দ করে না। বরং অতিরিক্ত পুঁজি হাসিল করার জন্য ঋণ গ্রহন করে। ঋণ নেয়ার পদ্ধতি দুটি।

(ক) ব্যাংক বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেয়া যা সাধারণত সুদের ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

(খ) জনসাধারণকে শেয়ার নিতে নয় বরং ঋণ দেয়ার জন্য দাওয়াত দেয়া।

কোম্পানী এর জন্য আবার দু ধরণের প্রমান পত্র চালু করে যা নিয়ে জনসাধারণ ঋণ দেয়।

১. سند (Bond) বণ্ড ঃ বণ্ড নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য জারী করা হয়। সে মেয়াদ পর্যন্ত বাৎসরিক সুদ দেয়া হয়। কখনো বণ্ড দীর্ঘ মেয়াদী হয় কখনো স্বল্প মেয়াদী। এমনও হয় বণ্ড নিরানব্বই বৎসরের জন্য জারী করা হয় বণ্ডের বাহক মেয়াদ পূরা হওয়ার আগেই তা বিক্রয় করতে পারে।

২. شَهَادَةُ الْاِسْتِثْمَارِ (Debenture) ঋণ পত্র ,বণ্ড ও ডিবেঞ্চার উভয়ের বাহক কোম্পানীর অংশীদার না হওয়া ও শুধু ঋণ দাতা হওয়া হিসাবে একই। যার ভিত্তিতে বাৎসরিক সুদ পায় এবং মেয়াদ পুরা হলে টাকা ফেরৎ দেয়া হয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো প্রথমত বণ্ড শুধু ঋণের প্রমান পত্র । অনেক সময় ঋণের বণ্ডকে সংরক্ষণ করার জন্য এমন একটি প্রমান পত্র চালু করা হয় যেখানে বণ্ডকে কোম্পানীর কোন এক বা একাধিক আসবাব পত্রের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়। যদি এঋণ আদায় করা না হয় তাহলে সে আসবাব দ্বারা আদায় করে দেয়া হয়। একে (Debenture) ঋণ পত্র বলে।

বুঝা গেল বণ্ড ঋণের প্রমান পত্র আর ডিবেঞ্চার তার বন্ধকের দলিল। দ্বিতীয়ত যদি কোম্পানী দেওলিয়া হয়ে যায়। তাহলে আসবাব পত্রের সাথে যাদের অধিকার সম্পৃক্ত তাদের অধিকার আদায়ের আইনানুগ তারতীব থাকে।

এই তারতীবে ডিবেঞ্চার বন্ধকী আসবাব পত্র পর্যন্ত অগ্রাধিকার পাবে অর্থাৎ আগে তা আদায়যোগ্য এরপরে বণ্ড আদায়যোগ্য।

এক প্রকার বন্ড এমন আছে যার বাহক বণ্ডকে শেয়ারে রূপান্তরিত করতে পারে প্রথমে সে ঋণদাতা ছিল এখন সে কোম্পানীর অংশীদার হবে। এর জন্য কখনো সময় নির্দিষ্ট হয় কখনো হয় না। কখনো নির্ধারিত শর্তবলী থাকে কখনো থাকে না। এমন বণ্ডকে سَنَدَاتٌ قَابِلَةٌ لِلتَّحْوِيلِ (Convertible Bonds) ভাঙ্গানো যায় এমন বণ্ড বলে।

(৩) "ইজারা" পুঁজি অর্জন করার আরেকটি পদ্ধতি ইজারা (Leasing) ইজারা দুই প্রকার ঃ

এক . (Oparting leas) অপারেটিং লিজ যা সাধারণ ভাবে প্রসিদ্ধ এতে উভয় পক্ষের মধ্যে ইজারা দাতা ও ইজারা গ্রহিতার সম্পর্ক। এধরণের ইজারা পুঁজি অর্জনের মাধ্যম হয়না। পুজি অর্জনের মাধ্যম দ্বিতীয়

প্রকার ইজারা যাকে (Financial Lease) ফিনান্সসীয়াল ইজারা বলে এখানে ইজারার সম্পর্ক সৃষ্টি করা মূল উদ্দেশ্য নয়। বরং কোম্পানীর মৌলিক আসবাব পত্র যেমন মেশিনারী প্রয়োজন। তখন কোম্পানী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে মেশিনারী ক্রয় করার পরিবর্তে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কে বলবে যে অমুক মেশিনারী ক্রয় করে আমাদের ভাড়া দিন। এসময় ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানই সে মেশিনারী দ্রব্যের মালিক হয় কোম্পানী ভাড়া হিসাবে ব্যবহার করবে।

একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এমন ভাবে ভাড়া নির্ধারণ করা হয় যেন এর মধ্যে মেশিনারীর দামও উসুল হয়ে যায় এবং এই মেয়াদে এই অর্থ ঋণ দিলে যে পরিমান সুদ পাওয়া যেত তাও যেন উসুল হয়ে যায়। মেয়াদ পূর্ণ হলে ভাড়ার আকৃতিতে মেশিনারীর মূল্য নির্দিষ্ট হারে সুদ সহ পরিশোধ হয়ে যায় তখন এই মেশিনারী এমনি এমনি কোম্পানীর মালিকানায় চলে আসে। একথা কখনো চুক্তিতে লেখা হয় কখনো লেখা হয় না। তবে এমনটিই প্রসিদ্ধ।

ঋণের পরিবর্তে ইজারার এই পদ্ধতি গ্রহনের উদ্দেশ্য দুটি ঃ

(১) এর কারণে অনেক অবস্থায় কর থেকে মুক্তি পাওয়া বা অল্প কর আরোপিত হয়। (২) ঋণ পরিশোধের জন্য ইজারার পদ্ধতিই শুধু ঋণ নেয়ার তুলনায় বেশি বিশ্বাস যোগ্য। কারণ ইজারায় মেশিনারী ইজারাদাতার মালিকানায় থাকে তার উপর ইজারাদাতারই লেবেল লাগানো থাকে। যদি অর্থ না পায় তবুও ইজারাদাতার কোন ক্ষতি নাই। কেননা মেশিনারী তারই মালিকানায়।

মনে রাখা দরকার যে, ফিনান্সীয়াল লিজিং দ্বারা এক হিসাবে পুঁজি হাসিল করাই মূল উদ্দেশ্য। এজন্য একে ফাণ্ড যোগানের একটি পদ্ধতি গননা করে (Financing) বিনিয়োগের আওতাধীন নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নতুবা বাস্তবিকভাবে ইহা تمويل (Financing) বিনিয়োগ নয়। কেননা বিনিয়োগ এমন জিনিস হয় যার মধ্যে কোন বস্তু কোম্পানীর মালিকানায় আসে এখানে ঐ মেশিনারীগুলো এখনো কোম্পানীর মালিকানায় আসে নাই।

কোম্পানীর হিসাব ঃ

প্রত্যেক কোম্পানী নিয়মতান্ত্রিক ভাবে নিজের হিসাব পত্রের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। হিসাবরাখার নিয়মনীতিও আছে। হিসাব রাখা একটি নিয়মতান্ত্রিক বিষয়। এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জানা জরুরী। কারণ লেনদেন বুঝতে এর যথেষ্ট প্রয়োজন পড়ে।

ব্যালান্স সীট (Balance Sheet)

স্থিতিপত্র কোম্পানীর সমস্ত সম্পত্তিকে আরবীতে موجودات বা اصول। ইংরেজিতে Assets বলে। অপরের যে অধিকার কোম্পানীর দায়িত্বে বর্তায় তাকে আরবীতে دُيُوْن বা حقوق বা مَطْلُوْبَات ইংরেজিতে (Liabilities) দায় বলে।

কোম্পানী বৎসরে একবার অথবা কোন নির্দিষ্ট ব্যবসায়ী মৌসুমে নিজের দায় এবং আসবাব পত্রের তাফসীল তৈরী করে। একে لَائِحَةُ الرَّصِيْد (Balance Sheet) বলে।

ব্যালেন্স সীটের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি হলো ঃ

একদিকে কোম্পানীর আসবাব পত্র অপরদিকে দায় লেখা হয়। আসবাব পত্র বলতে কোম্পানীর সমস্ত সম্পত্তি এবং প্রাপ্য (Receivable) মালামালকে বুঝায়। দায় বলতে ঐ সমস্ত সম্পদ যা কোম্পানীর দায়িত্বে অন্যের জন্য পরিশোধ করা জরুরী। অতঃপর উভয়ের মাঝে সাদৃশ্যতা দেখা হয় এবং সে সাদৃশ্যতার ভিত্তিতে কোম্পানীর দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ করা যায়। দায় এবং সমস্ত সম্পত্তির মধ্যে কেমন সাদৃশ্যতা থাকা উচিত? এ ব্যাপারে সাধারণত মনে করা হয় যদি এক দুইয়ের সম্পর্ক হয় অর্থাৎ সমস্ত সম্পত্তি দায়ের তুলনায় দ্বিগুন হয় তাহলে কোম্পানী খুব দৃঢ় বোঝা যায়। এমন কোম্পানীকে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ দিতে খুব আগ্রহী হয়। (Balance Sheet) স্থিতিপত্রে একদিকে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে কোম্পানীর সমস্ত সম্পত্তির বিবরণ লেখা হয়।

সম্পদ ঃ একে আরবীতে "موجودات" ইংরেজীতে (Assets) বলে। সম্পদ ৩ প্রকার।

১. (Current Assets) বা চলতি সম্পদ। যাকে আরবীতে مَوْجُوْدَاتٌ مُتَدَاوِلَةٌ বলে যা নগদ বা সহজেই নগদে রূপান্তরযোগ্য। এর মধ্যে চার প্রকারের সম্পদ অন্তভূক্ত।

ক. নগদ টাকা(Cash)

খ . কোম্পানীর অন্যের কাছ থেকে প্রাপ্য টাকা (Accounts Receivable) যেমন কোম্পানী কোন পন্য বিক্রয় করেছে যার মূল্য এখনো পায় নাই।

গ . যদি কোম্পানী অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয় তার প্রমান পত্র ও রশিদ নিজের কাছে রাখে তাহলে সেটাও সম্পদের মধ্যে গন্য হবে। যেমন বণ্ড ইত্যাদি। একে Notes Receivable বলে। অন্য কোন কোম্পানী বা সংস্থায় পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং সেখান থেকে অর্থ পাওয়ায় আশা আছে। একে (Investments) বলে।

২ . স্থায়ী সম্পদ (Fixed Assets) একে আরবীতে مَوْجُوْدَاتٌ ثَابِتَةٌ বলে। অর্থাৎ নগদ বা দ্রুত নগদে রূপান্তর যোগ্য নয়। যেমন ঃ মেশিনারী, বিল্ডিং ইত্যাদি।

৩. স্পর্শ দ্বারা অনুভূত নয় এমন সম্পদ (Intengible Assets) একে আরবীতে مَوْجُوْدَاتٌ غَيْرُ مَادِّيَةٍ বলে। এমন সম্পদ যা বস্তুগতভাবে অনুভূত নয় যেমন ঃ গুড উইল বা সুনাম। ইহারও মুল্য আছে। কেনা বেচা হয় কিন্তু ইহা কোন অনূভূত বস্তু নয়। অথবা কোন ব্যবসার প্রসিদ্ধতার জন্য টাকা ব্যয় করা হয়েছে এই প্রসিদ্ধতার দ্বারা কয়েক বছর লাভবান হওয়া যাবে। ইহাও অনুভূত নয় এমন সম্পদের অন্তর্ভূক্ত। সম্পদ লেখার পর এ সম্পদগুলো কোন মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে এবং তার জন্য কোথায় থেকে পুঁজি সংগ্রহ (Financing) করা হয়েছে তাও লিখা হয়।

সম্পদের মূল্য বিভিন্ন হয়ে থাকে। একটি ক্রয় মূল্য যা ক্রয়ের সময় ছিল। এরপর ব্যবহারের কারণে পুরাতন হওয়ায় সে মুল্য কমে গিয়েছে। সময়ের পরিবর্তনে মূল্য বেশিও হয়। কিন্তু যেহেতু মূল্যের সঠিক অনুমান মুশকিল তাই ব্যালেন্স সীটে ক্রয় মুল্যই লেখা হয়। একে Book value বলে।

যেহেতু সম্পদের বর্তমান বাজার দর সাধারণত বিভিন্ন হয় তাই ব্যাল্যান্স সীট দ্বারা কোম্পনীর মৌলিক অবস্থান বুঝা যায় না। বরং আনুমানিক ভাবে অনুমান করা যায়। এর মধ্যে ধোকাও পরিলক্ষিত হয়।

দায় ঃ

ব্যাল্যান্স সীটের অপর অংশে দায় সমূহ লেখা হয়। অর্থাৎ উহা এমন অর্থ যা কোম্পানীর উপর আদায় যোগ্য। এ দায় সমুহের মধ্যে কর্মচারীদের বেতন। কোন পন্য ক্রয় করলে তার মূল্য কারো কাছ থেকে পুঁজি নিলে সে পুঁজি এ ধরণের জিনিস দায় সমুহের অন্তর্ভূক্ত। দায় সমূহ লেখার তারতিব হলো প্রথমে

দীর্ঘ মেয়াদী দায় সমূহ লেখা হবে। যেমন এমন ঋণ নিয়েছে যা পাঁচ বৎসর পর আদায়যোগ্য। এমন দায় সমূহকে Long Term Liabilities বলে। এরপর চলতি দায় সমূহ লিখতে হয় যা স্বল্প মেয়াদী হয়। যেমন কর্মচারীদের বেতন, কর, কোন পন্য ক্রয় করলে তার মূল্য, দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ঐ অংশ যা এক বৎসরের মধ্যে আদায় করতে হয়। এমন দায় সমূহকে Current Liabilities বলে।

নীট পুঁজি ঃ

সম্পদের মধ্যে দায় সমূহ বিয়োগ করে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে اَلْمَالِيَّةُ الصَّافِيَةُ (Net Worth) বলে। এই পুঁজি অংশীদারদের মালিকানাভুক্ত হয়।

ক্ষতির খতিয়ান

ব্যাল্যান্স সীট দ্বারা কোম্পানীর আর্থিক দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ করা যায়। কোম্পানীর লাভ ক্ষতির সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই।

লাভ ক্ষতির বর্ণনায় যে রিপোর্ট তৈরী করা হয় একে আরবীতে اَللَّائِحَةُ الْمَالِيَّةُ বা اَلْبَيَانُ الْمَالِيُّ ইংরেজিতে Income Statement বলে। এর পরাক্রমা নিম্নরূপ ঃ

(১) মোট বিক্রয় (Gross Sales) (২) ফেরৎ (Returns) (৩) অবশিষ্ট বিক্রয় (Net Sales) (৪) প্রত্যক্ষ ব্যয় (Direct Expenses) (৫) মোট লাভ (Gross profit) (৬) পরোক্ষ ব্যয় (Indirect Expenses)) (৭) নীট লাভ (কর দেয়ার পূর্বে) (Net profit (Pre Tax) (৮) কর (Tex) (৯) নীট লাভ (কর দেয়ার পর) (Net profit) (After Tax) (১০) রিজার্ভ ফাণ্ড (Reserve) (১১) বন্টন উপযোগী লাভাংশ (Dividend)

ফেরৎ অর্থ ঐ পন্য যা বিক্রয়ের পর ফেরৎ নিতে হয়। যেহেতু উহা বিক্রয়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে তা বিয়োগ করে অবশিষ্ট বিক্রয় বের করতে হয়। প্রত্যক্ষ ব্যয় বলতে কোম্পানীর পন্য তৈরীর ব্যয়কে বুঝায়। যেমন কোন কোম্পানীর কাঁচা মাল ক্রয় করতে যে ব্যয় হয় তা প্রত্যক্ষ ব্যয়ের অন্তর্ভূক্ত। কোন খবরের কাগজ হলে প্রকাশ ও কাগজের ব্যয় এর অন্তর্ভূক্ত। অবশিষ্ট বিক্রয় থেকে প্রত্যক্ষ ব্যয় বিয়োগ করলে যে লভ্যাংশ থাকে তাই কোম্পানীর মোটমাট লাভ। পরোক্ষ খরচ বলতে এমন ব্যয় বুঝায় পন্য উৎপাদনের সাথে যার প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নাই। যেমন অফিস রুমের ভাড়া, অডিটরের বেতন ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়ের মধ্যে কার্যত পার্থক্য হলো প্রত্যক্ষ ব্যয় তখনই হবে যখন পন্য উৎপাদন হবে। পন্য উৎপাদন না হলে ব্যয় হবে না। বেশী উৎপাদন হলে ব্যয় বেশী হবে কম উৎপাদন হলে কম। পরোক্ষ ব্যয় সর্বদা থাকবেই প্রডাক্শন কম হোক বা বেশী হোক।

মোটমাট লাভ থেকে এ ধরণের ব্যয় বিয়োগ করলে ' অবশিষ্ট লাভ' (কর দেয়ার পূর্বে) বের হয়। এবার সরকারকে দেয় কর বিয়োগ করলে (কর দেয়ার পর) অবশিষ্ট লাভ বের হয়। এর থেকে এক অংশ রিজার্ভ ফাণ্ডে জমা করার পর যে লাভ্যাংশ অবশিষ্ট থাকে তাই বন্টন উপযোগী লভ্যাংশ (Distributable Profit)। আয়ের খতিয়ানে যে নীট লভ্যাংশ দেখানো হয় তা নগদ হওয়া জরুরী নয়। কখানো এমন ও হয় যে কোম্পানী অনেক লাভ দেখায় কিন্তু তার কাছে নগদ থাকে না। বরং তা প্রডাক্শনে বিনিয়োগ করা থাকে। এমতবস্থায় বণ্ড শেয়ার চালু করার প্রয়োজন হয়।

শেয়ার বাজার

(STOCK EXCHANGE)

কোম্পানীর আহকাম জানতে শেয়ার বাজারের মৌলিক ব্যাখ্যা জানাও জরুরী।

পরিচিতিও প্রয়োজন ঃ

যখন কোন ব্যক্তি কোম্পানীর শেয়ার নিয়ে তার অংশীদার হয়ে যায়। তার জন্য যে কোন মূর্হুতে নিজের টাকা ফিরিয়ে নিয়ে অংশীদারিত্ব বাতিল করা সম্ভব নয়। বরং কোম্পানীর অস্তিত্ব থাকা পর্যন্ত টাকা ফিরিয়ে নেয়া যায়না। কিন্তু অনেক অংশীদার তাদের টাকা ফিরিয়ে নিয়ে অংশীদারিত্ব বাতিল করতে চায়। এজন্য এমন জিম্মাদারী সৃষ্টি করা অবশ্যক ছিল যেন প্রয়োজনের সময় নিজের শেয়ারকে নগদে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়। এজন্যই শেয়ার বাজার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যেখানে শেয়ার বিক্রয় করা যায়। অর্থাৎ কোম্পানীর অংশীদার নিজের অংশীদারিত্ব খতম করে কোম্পানীর কাছ থেকে পুঁজি ফিরিয়ে নিতে পারে না ঠিকই তবে শেয়ার বাজারে নিজের অংশ অন্যের কাছে বিক্রয় করতে পারে। যার ফলে ক্রেতা তার স্থলে কোম্পানীর অংশীদার হয়ে যায়। যেখানে শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় হয় একে শেয়ার বাজার Stock Market বলে।

শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের দুটি পদ্ধতি আছে ঃ

এক, দুই ব্যক্তি কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যম ছাড়াই শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করবে।

দুই. কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করবে। এই প্রতিষ্ঠানকেই ষ্টক একচেঞ্জ বলে। একে আরবীতে بورصه বলে। ষ্টক একচেঞ্জের মাধ্যম ছাড়া শেয়ারের কারবারকে عَمَلِيَاتٌ مِنْ وَرَاءِالْمُنَصَّةِ (Over The Counter Transactions) বলে। এ ধরণের ক্রয় বিক্রয়ের বিশেষ কোন নিয়ম কানুন নাই। এর বিশ্লেষণ জানারও প্রয়োজন নাই। ষ্টক একচেঞ্জের মাধ্যমে যে ক্রয় বিক্রয়

হয় এর কিছু বিশ্লেষণ জানা আবশ্যক। স্টক একচেঞ্জ একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান যা সরকারের অনুমতি ও পৃষ্টপোষকতায় কোম্পনীর শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করে। স্টক একচেঞ্জ বিশ্বস্ত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করে। স্টক একচেঞ্জে যে সমস্ত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় বিক্রয় হয় সে কোম্পানীগুলোকে (Listed Companies) তালিকাভূক্ত কোম্পানী বলে।

এমন কোম্পানীর শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় স্টক একচেঞ্জে ও হতে পারে আবার অভার দা কাউন্টার অর্থাৎ কাউন্টার ছাড়া অন্য স্থানেও হতে পারে। কোন কোম্পানীর কখনো অস্তিত্ব লাভের পরে (Listed) তালিকাভূক্ত হয় কখনো অনুমোদন পাওয়ার পর কারবার শুরু করার আগেই তালিকাভূক্ত হয় বরং অনেক সময় শেয়ার আরম্ভ করার আগেই (Listed) তালিকাভূক্ত হয়। একে সাময়ীক (Provisional) তালিকাভূক্ত বলে। এর কাউন্টারও আলাদা হয় । যে সমস্ত কোম্পানী গুলোর শেয়ার স্টক একচেঞ্জ নেয় না এগুলোকে Unlisted Companies তালিকা বর্হিভূত কোম্পানী বলে। এগুলোর শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় ওভার দা কাউন্টারেই হয়ে থাকে।

মেম্বার শীপ ঃ

স্টক একচেঞ্জে প্রত্যেক ব্যক্তিই শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করতে পারে না এর জন্য সদস্য হতে হয়। সদস্য ফি জমা দিতে হয়। স্টক একচেঞ্জে শেয়ারের কারবার অত্যন্ত প্রশস্ত, সূক্ষ্ম। সেখানে বিশেষ পরিভাষা সমুহ ব্যবহৃত হয়। একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কারবারে ভুল করতে পারে। এদিকে প্রতিষ্ঠান সেখানে সম্পাদিত সকল লেনদেন পরিশোধের দায়িত্ব বহন করে। এজন্য প্রতিষ্ঠান যে কোন ব্যক্তিকে ক্রয় বিক্রয়ের অনুমতি দিয়ে তার লেনদেনের দায়িত্ব বহন করতে চায় না। এজন্যই সদস্য হওয়া জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

স্টক একচেঞ্জে দালালী ঃ

স্টক একচেঞ্জের সদস্য নিজের জন্যও শেয়ার ক্রয় করে আবার দালাল হিসাবে কমিশন নিয়ে অন্যের জন্য ক্রয় করে। সদস্য নয় এমন লোক শেয়ার ক্রয় করতে হলে দালালের মাধ্যমে ক্রয় করতে হয়।

শেয়ার ক্রয় করতে দালাল কে অর্ডার দেয়ার তিনটি পদ্ধতি আছে।

১. মার্কেট অর্ডার এমন অর্ডার যেখানে দালালকে বলা হয় বাজার দর যাই হোক না কেন?অমুক কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করতে হবে।

২. লিমিটেড অর্ডর (Limited Order) অর্থাৎ মুল্য নির্ধারণ করে অর্ডার দেয়া হয়। এই মুল্যে শেয়ার পেলে ক্রয় করবে বেশি হলে ক্রয় করবে না।

৩ . **স্টপ অর্ডার (Stop Order)** অর্থাৎ শেয়ারের মালিক শেয়ার বিক্রয়ে এমন শর্তারোপ করে অর্ডার দেয় যে, মূল্য ঠিক থাকলে বা বেশী হলে বিক্রয় করবে কম হলে করবে না।

শেয়ারের মূল্য নির্ধারণ

কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য কম বেশী হয়। এর মধ্যে কোম্পানীর আসবাব পত্রের প্রভাব থাকে। আসবাব পত্র বাড়লে মূল্য বাড়ে। কিন্তু আসবাব পত্র ছাড়াও বাইরের উপকরণের কারণেও মূল্য প্রভাবিত হয়। যেমন লাভের সম্ভাবনা চাহিদা ও যোগানের প্রাধান্য , রাজনৈতিক অবস্থাদী, কালের প্রভাব, বস্তু নয় এমন উপকরণ যেমন অনেক খবর এবং অনুমানের দ্বারাও মূল্য প্রভাবিত হয়। এজন্য শেয়ারের মূল্য কোম্পানীর আসবাব পত্রের বাস্তবিক প্রতিনিধিত্ব করে না।

কোন কোম্পানীর শেয়ার মূল্য বেশী হলে শেয়ারের মার্কেটকে স্টক একচেঞ্জের পরিভাষায় Bull Market বলে। মূল্য হ্রাস পেলে Bear Market বলে।

শেয়ার ক্রেতার প্রকার ভেদ ঃ-

শেয়ার ক্রেতা দুই ধরণের হয়ে থাকে ঃ

১. অনেক লোক কোম্পানীর অংশীদার হওয়ার জন্য শেয়ার ক্রয় করে এবং শেয়ার নিজের কাছে রেখে বাৎসরিক মুনাফা লাভ করে। তবে এমন লোক খুবই কম।

২ . অধিকাংশ মানুষ শেয়ার কে ব্যবসার মাল মনে করে ক্রয় বিক্রয় করে। শেয়ারের মূল্য কম হলে তা ক্রয় করে আবার বেশী হলে বিক্রয় করে। উভয় মূল্যের পার্থক্যই তার মুনাফা। মূল্য বৃদ্ধি পেলে যে মুনাফা অর্জন হয় একে Capital Gain বলে।

এ কারবারে পূর্বেই অনুমান ও ধারণা করা হয় যে, কোন শেয়ারের মূল্য আগামীতে কম হবে ও কোন শেয়ারের মূল্য বেশী হবে। এই অনুমান কাজকে Speculation বলে। অনুমান কখনো সঠিক প্রমানিত হয়, কখনো ভূল।

শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের পদ্ধতি ঃ শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের পদ্ধতি ৩ টি

১ . উপস্থিত ক্রয় বিক্রয় (Spot Sale) ইহা ক্রয় বিক্রয়ের একটি সাধারণ ও সহজ পদ্ধতি। কেউ শেয়ার দিয়ে তার মূল্য উসুল করবে।

এই উপস্থিত ক্রয় বিক্রয়েও শেয়ার সার্টিফিকেট সাধারণত এক সপ্তাহ্ পর হস্তগত হয়।

২. Sale On Margin "ঋণের উপর ক্রয় বিক্রয়" এর দ্বারা শেয়ারের এমন

ক্রয় বিক্রয় কে বুঝায় যেখানে শেয়ার মূল্যের শতকরা কিছু অংশ তাৎক্ষনিক পরিশোধ করতে হবে। অবশিষ্ট টাকা বাকী থাকবে। যেমন শতকরা ১০ ভাগ আদায় করলো ৯০ ভাগ বাকী থাকলো। যারা প্রায় শেয়ার ক্রয় করে তাদের সাথে দালালদের সম্পর্ক থাকে। এখন কেউ দালালকে বললো অমুক কোম্পানীর শেয়ার (Margin) ধারের উপর ক্রয় কর। যার হার নির্ধারণ করে দেয়া হয়। যেমন শতকরা দশ ভাগ। এই টাকা ক্রেতা দিয়ে দেয় অবশিষ্ট ৯০ ভাগ দালাল নিজের পক্ষ থেকে পরিশোধ করে। এই টাকা ক্রেতার দায়িত্বে দালালের ঋণ। দালাল কখনো এর উপর সুদ নেয় কখনো নেয় না। কখনো এমনও হয় যে কয়েকদিন সুদ ছাড়া অবকাশ দেয়া হয় এর পর সুদ নেয়া হয়। যেমন এমন বলা হয় যদি বাকী টাকা ৩ দিনের মধ্যে আদায় করা হয় তাহলে সুদ দিতে হবে না নতুবা সুদ দিতে হবে। সেখানে দালালের লাভ কমিশন। নিজের কারবার চালু রাখার জন্য ও কমিশন নেয়ার জন্য সে ঋণ প্রদানেও প্রস্তুত থাকে।

৩ . Short Sale প্রকৃত অর্থে সর্ট সেল বলতে মালিকানা ছাড়া বিক্রয় কে বুঝায় অর্থাৎ বিক্রেতা এমন শেয়ার বিক্রয় করে সে এখনো যার মালিক হয় নাই কিন্তু তার আশা থাকে যে, চুক্তি হওয়ার পর আমি এই শেয়ার নিয়ে ক্রেতা কে দিয়ে দেব।

উপস্থিত ও অনুপস্থিত ক্রয় বিক্রয়

শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় দুই প্রকার ঃ

১ . Spot sale উপস্থিত ক্রয় বিক্রয়

২ . Forward sale অনুপস্থিত ক্রয় বিক্রয়। উপস্থিত ক্রয় বিক্রয়ে চুক্তি এবং লেনদেন তাৎক্ষনিক হয়। ক্রেতা এখনই শেয়ার নেয়ার অধিকার পায় কিন্তু কিছু ব্যবস্থাপনার অপরাগতায় শেয়ার সার্টিফিকেটের ডেলিভারী দেরিতে হয়। প্রায় ১ থেকে ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত দেরী হয়। তবে সাধারণত রেজিষ্ট্রি শেয়ার ডেলিভারীতে এমন দেরী হয়। যার উপর বাহকের নাম লেখা থাকে। বাহকের নাম পরিবর্তন করতে কোম্পানীর কাছে পাঠাতে হয় বিধায় দেরী হয়। সাধারণ শেয়ারে বেশি দেরী হয় না। উপস্থিত ক্রয় বিক্রয়েও যেহেতু শেয়ার হস্তগত হতে দেরী হয় তাই সেখানেও ক্রেতা শেয়ারের সার্টিফিকেট পরিবর্তন করার পূর্বেই বিক্রয় করে দেয়। অনেক সময় হস্তগত হওয়ার সময় আসতে আসতে কয়েক হাতে বিক্রয় হয়ে যায়। উপস্থিত ক্রয় বিক্রয়ে শেয়ার বিক্রয় হওয়ার পর হস্তগত হওয়ার পূর্বে যদি কোম্পানী মুনাফা বন্টন করে তাহলে বিক্রেতার নামেই মুনাফা বন্টন হয় কিন্তু যেহেতু বিক্রয় হওয়ার পর মুনাফা বন্টন হয়েছে বিধায় বিক্রেতা সে মুনাফা ক্রেতাকে দিয়ে দেয়।

অনুপস্থিত ক্রয় বিক্রয়ে বিক্রয় তাৎক্ষনিক হয়ে যায় কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। যেমন শেয়ার এখনই বিক্রয় হলো তবে দখল ইত্যাদির অধিকার আগামী কোন তারিখের সাথে সম্পৃক্ত। অনুপস্থিত ক্রয় বিক্রয়ে শেয়ার আদায়ের সময় এলে অনেক সময় শেয়ার ক্রেতার কাছে প্রদান করা হয় অনেক সময় বিক্রেতা এবং ক্রেতা শেয়ার নেয়ার পরিবর্তে বিক্রয়ের দিনের মূল্য এবং পরিশোধের দিনের মূল্য উভয়ের পার্থক্য পরস্পরে সমান সমান করে নেয়। যেমন ঃ ১ লা জানুয়ারীতে ৩০ শে মার্চ দিন ধার্য্য করে অনুপস্থিত ক্রয় বিক্রয় করা হলো এবং প্রতি শেয়ার ১০ টাকা মূল্যে নির্ধারণ করা হল। কিন্তু ৩০ শে মার্চে শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি হয়ে ১২ টাকা হলো। তখন বিক্রেতা ক্রেতাকে শেয়ার দেয়ার স্থলে প্রতি শেয়ারে ২ টাকা আদায় করে দেয়। অথবা মূল্য কমে ৮ টাকা হয়েছে, তাহলে ক্রেতা বিক্রেতাকে ১০ টাকা দিয়ে শেয়ার নেয়ার স্থলে প্রতি শেয়ারে ২ টাকা পরিশোধ করে দেয় এবং শেয়ার গ্রহন করে না। অনুপস্থিত ক্রয় বিক্রয়ে ক্রয় বিক্রয়ের তারিখের পর পরিশোধের তারিখ আসা পর্যন্ত প্রায়ই অনেক ক্রয় বিক্রয় হয়ে থাকে। প্রথম ক্রেতা দ্বিতীয় জনকে দ্বিতীয়জন তৃতীয় জনকে এভাবে বিক্রয় চলতে থাকে। অবশেষে অনেক সময় শেয়ার লেনদেন করারস্থলে মূল্যের কমবেশীকে সমান করে নেয়া হয়।

পন্য সামগ্রীতে উপস্থিত অনুপস্থিত বেচা-কেনা ঃ

স্টক একচেঞ্জের মাধ্যমে যেমন শেয়ারের উপস্থিত অনুপস্থিত কেনা বেচা হয় তেমনি অনেক দেশে পন্য সামগ্রীতে ও এমন কেনা বেচা হয়। অবশ্য তা বিশেষ বিশেষ পন্য সামগ্রীতে হয়ে থাকে। যেমন গম, তুলা ইত্যাদি।

পন্য সামগ্রীতে উপস্থিত কেনাবেচা হলো- কোন পন্য এখন বিক্রয় করা হয়েছে অধিকারও পরিবর্তন হয়েছে। ক্রেতা পন্য গ্রহণ করার অধিকারী সাব্যস্ত হয়েছে তবে কোন ব্যবস্থাপনার অপারগতার কারণে ডেলিভারী করতে দেরী হলে সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু সে তো গ্রহন করার অধিকারী সাব্যস্ত হয়েছে।

অনুপস্থিত বেচা-কেনা হলো- ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে কিন্তু গ্রহন করার জন্য আগামী কোন তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। আইনগত ভাবে একে Forward Saleবলে আবার Future Sale ও বলে। কিন্তু বর্তমানে কার্যত উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

অনুপস্থিত কেনা-বেচায় উভয় পক্ষের নির্ধারিত তারিখে লেনদেন করা উদ্দেশ্য হলে অর্থাৎ ক্রেতার উদ্দেশ্য পন্য গ্রহন করা আর বিক্রতার উদ্দেশ্য মূল্য নেয়া হলে তাকে Forward Sales বলে। আর যদি উভয় পক্ষের উদ্দেশ্য নির্ধারিত তারিখে লেনদেন করা না হয় বরং শুধু পন্যকে লেনদেনের ভিত্তি হিসাবে ধরা

হয়ে থাকে তাকে Future Sale বলে। আরবীতে একে مستقبليات বলে। এখানে পন্য নেয়া উদ্দেশ্য হয় না বরং উদ্দেশ্য নিম্ন বর্ণিত দুটির যে কোন একটি হয়ে থাকে।

(১) ফটকাবাজী (Speculation)_ নির্দিষ্ট তারিখে পন্য লেনদেনের পরিবর্তে দামের পার্থক্য সমান করে লাভ কামানো। যেমন ১ লা ডিসেম্বরে সিদ্ধান্ত হলো যে, ১ লা জানুয়ারীতে একশত গাইট কার্পাস তুলা এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে দিতে হবে। কিন্তু বিক্রেতার কার্পাস দেওয়ার ইচ্ছা নাই আবার ক্রেতার ও নেওয়ার ইচ্ছা নাই। নির্দিষ্ট তারিখ এলে দুজনেই লাভ ক্ষতি সমান করে নেয় । যদি ১লা জানুয়ারীতে ১শত গাইটের দাম ১লক্ষ১০হাজার টাকা হয় তাহলে বিক্রতা ক্রেতা কে ১০হাজার টাকা পরিশোধ করে লেনদেন শেষ করে । আর যদি ৯০হাজার টাকা হয় তাহলে বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে ১০হাজার টাকা উসুল করে লেনদেন শেষ করে ।

(২) Futures Sale এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সম্ভাব্য ক্ষতির থেকে বাঁচা । একে Hedging বলে । আরবীতে تامين حزالخسارة বলে। এর মুল কথা হলো কোন ব্যক্তি কোন পন্যের অনুপস্থিত বিক্রয় (Forwardsale) করে এবং উদ্দেশ্য পন্য উসুল করাই হয়ে থাকে ফটকাবাজী নয় কিন্তু ক্রেতা যদি নির্ধারিত তারিখে সে পন্যের দাম হ্রাস পাওয়ার আশংকা করে এবং সে ক্ষতির থেকে বাচার জন্য সে পন্য কে Futures Market এ সে তারিখের জন্যই Future হিসাবে বিক্রয় করে যেন দাম হ্রাস পেলে পুর্বে কেনার ক্ষতি পরের বিক্রয়ে পুরণ হয়ে যায় । যেমন যায়েদ ১লা ডিসেম্বরে এক শত গাইট কার্পাস এক লক্ষ টাকায় ক্রয় করল এবং গ্রহনের জন্য ১লা জানুয়ারী নির্ধারণ করল তার ধারণা হলো ১লা জানুয়ারীতে একশত গাইড কার্পাস নিয়ে বিক্রয় করে লাভবান হবে ।

এমতবস্থায় ১লা জানুয়ারীতে কার্পাসের মুল্য হ্রাস পাওয়ার আশংকা করল। সে ক্ষতির থেকে বাচার জন্য ১শত গাইট কার্পাস ১লক্ষ টাকার খালেদের কাছে Futures মার্কেট বিক্রয় করলো । এখন যদি ১লাজানুয়ারীতে ১শত গাইটের মুল্য ৯০হাজার হয় তাহলে যায়েদের ১০হাজার টাকা ক্ষতি হল কিন্তু যেহেতু এই পরিমান কার্পাস খালেদের কাছে Futures বাজারে বিক্রয় করেছিল তাই সে ১লা জানুয়ারীতে ৯০হাজার টাকায় অন্য গাইট কিনে খালেদকে ১লক্ষ টাকায় বিক্রয় করবে । তাহলে প্রথম লেনদেনে যে ক্ষতি হয়ে ছিল দ্বিতীয় লেনদেনে তা পুরণ হয়ে গেল । Futuresale কখনো ক্ষতির থেকে বাঁচার জন্য হয় । একে Hedging বলে । Futuresইত্যাদির কারবার কোন কোন দেশে ষ্টক এক্সচেঞ্জেই হয়, কোন কোন দেশে ভিন্ন বাজারে হয়ে থাকে।

অবাধ্যতা মূলক বিক্রয় بيع الخيارات (Options)

কোন নির্দিষ্ট পন্যকে নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় বিক্রয়ের অধিকারের নাম خيارات বা Options। কোন ব্যক্তি অন্যের সাথে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয় যে যদি তুমি চাও তাহলে অমুক পন্য এত টাকা মূল্যে এত দিনের মধ্যে ক্রয়ের অঙ্গিকার করছি। তুমি যখন ইচ্ছা বিক্রয় করতে পার। একে বিক্রয়ের Options (ইচ্ছা) বলে।

Options প্রদান কারী এ অধিকার প্রদানের উপর ফিস গ্রহন করে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রয় করতে বাধ্য থাকে। কিন্তু Options গ্রহন কারী বিক্রয় করতে বাধ্য নয়। এর উল্টা কখনো কোন ব্যক্তি কারো সাথে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয় যে, আমি তোমার কাছে অমুক পন্য এত টাকা মূল্যে এত দিনের মধ্যে বিক্রয়ের দায়িত্ব নিচ্ছি। তুমি যখন ইচ্ছা ক্রয় করতে পার। ইহা ক্রেতার (Optinos) ইচ্ছা।

Options কারেন্সীর উপরও হতে পারে। পন্যের উপরও হতে পারে। উদ্দেশ্য হচ্ছে Options প্রদান কারী গ্রহন কারীকে সে কারেন্সী বা পন্যের দর কম বেশী হওয়ার থেকে প্রশান্তি দেয় আর এর বিনিময়েই কমিশন গ্রহন করে।

যেমন এক ব্যক্তি ২৫ টাকায় ১টি ডলার ক্রয় করলো। সে ভাবনায় আছে যে যদি একে নিজের কাছে রাখি তাহলে দর কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে যদি এখনই বিক্রয় করি, সামনে দর বাড়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে লাভ থেকে বঞ্চিত হব। এখন তাকে কেউ আশ্বাস দিল যে ডলার তোমার কাছেই রাখ তিন মাসের মধ্যে এই ডলার ২৫ টাকায় ক্রয় করার অঙ্গিকার করছি এবং এই অঙ্গিকারের জন্য এত টাকা ফিস দেব। এখন যদি ডলারের দর কমে যায় তবুও এর ক্ষতি নাই আর যদি বেশী হয় তাহলে অন্য কাউরো কাছে বিক্রয় করতে পারবে। দর কমলে Option বিক্রয় কারীর কাছে ২৫ টাকায় বিক্রয় করবে। Options কে ভিন্ন একটি পন্য ধরা হয়। এর কারবার অন্যান্য দেশে অত্যন্ত প্রসস্থতার সাথে হচ্ছে। যার রূপরেখা দিনে দিনে জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে।

আর্থিক বাজার السوق المالية (Financial Market)

স্টক এক্সচেঞ্জ একটি বড় বাজারের অংশ। যাকে السوق المالية (Financial Market) অথবা (Capital Market) বলে। যেখানে শুধু কোম্পানীর শেয়ারই নয় বরং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহের (ব্যাংক অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান সরকার ইত্যাদি জারীকৃত আর্থিক প্রমান পত্র সমুহের ক্রয় বিক্রয় ও হয়। যদিও এই বাজারের ভিন্ন কোন ভৌগলিক অস্তিত্ব জরুরী নয়।

কার্যত ঃ এসব কাজ স্টক এক্সচেঞ্জেই সমাধা হতে পারে। কিন্তু পরিভাষায় এর মৌলিকত্ব আছে । Financial Market এর মধ্যেই সরকারী ঋণ পত্র সমূহের

(Government Securities) ক্রয় বিক্রয় হয়। সরকারী ঋণ পত্র বলা হয় যা সরকার কখনো কখনো জনসাধারণ থেকে ঋণ গ্রহণের নিমিত্তে চালু করে। যখন সরকারের আয়ের উৎস কর ইত্যাদি বাজেট পূরণে যথেষ্ট হয় না তখন সরকার এই ঋণ পত্রগুলো জন সাধারণ থেকে ঋণ নেয়ার জন্য চালু করে। যেমন ঃ

১ . প্রাইজ বণ্ড ঃ

প্রতিটি বণ্ডের উপর লাভ দেয়া হয় না বরং সমস্ত বন্ড দ্বারা অর্জিত অর্থের উপর সামগ্রীক ভাবে লাভ প্রদান করা হয়। যা লটারীর মাধ্যমে বন্টন হয়।

২ . ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট (Defence Saving Certificate)

৩ . বিশেষ ডিপোজিট সার্টিফিকেট (Deposit Certificate)

৪ . ফরেন এক্সচেঞ্জ বেয়ারার সার্টিফিকেট (Foreign Exchange bearer Certificate) পূর্বে জনসাধারণের ফরেন এক্সচেঞ্জ (বৈদেশিক কারেন্সী) রাখার অনুমতি ছিল না। যার ফলে কাউরো ফরেন এক্সচেঞ্জের প্রয়োজন হলে আইনগত জটিলতা দেখা দিত। মানুষ কালাকানুনের মাধ্যমে ফরেন এক্সচেঞ্জ অর্জন করতো এবং নিজের কাছে সংরক্ষণ করতো। দ্বিতীয় ক্ষতি ছিল যে, মানুষ বিদেশ থেকে ফরেন এক্সচেঞ্জ যেমন ডলার নিয়ে এলে সরকারকে দিত না অথচ সরকারের তা প্রয়োজন হত। এজন্য আইনগত ভাবে মানুষের কাছ থেকে ফরেন এক্সচেঞ্জ ঋণ নেয়ার জন্য সরকার যে প্রমান পত্র চালু করে একেই ফরেন এক্সচেঞ্জ বেয়ারার সার্টিফিকেট (F.E.B.C) বলে।

সরকার ডলার নিয়ে সেসময়ের মূল্য অনুযায়ী দেশীয় টাকার সার্টিফিকেট চালু করে। যেমন যদি বর্তমানে ডলারের মূল্য ৪০ টাকা হয় আর যদি কেহ ১০০ ডলার নিয়ে আসে তাহলে সরকার ১০০ ডলার নিয়ে তাকে ৪০০০ টাকার সার্টিফিকেট চালু করবে। অর্থাৎ সরকার সার্টিফিকেট বহন কারীর জন্য ৪০০০ টাকা ঋণী।

F.E.B. C এর উপর বার্ষিক শতকরা ১২% অতিরিক্ত পাওয়া যায়। এর বাহক যখন ইচ্ছা সার্টিফিকেট দিয়ে ডলারও নিতে পারে আবার বিক্রয়ও করতে পারে।

এ সবগুলোই সরকারী ঋণ পত্র। এগুলোর মধ্যে মূল লেনদেন সরকার ও বাহকের মধ্যে হয়ে থাকে। কিন্তু জন সাধারণের সুবিধার জন্য ইহা বিক্রয়ের ও অবকাশ আছে। Financial Market- এ এগুলোর ক্রয় বিক্রয় হয়। প্রমান পত্রের বাহক যখন বিক্রয় করে দেবে তখন সে আর মহাজন থাকবে না। ক্রেতাই মহাজন হয়ে যাবে। লেনদেন সরকার ও ক্রেতার মধ্যে জড়িত হবে।

শেয়ার অথবা ঋণের প্রমান পত্র সমূহ চালু কারীর পরিবর্তে কোন তৃতীয় ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করা যায়। সে বাজারকে দ্বিতীয় বাজার (Secondary market) বলে। যে প্রমান পত্রের দ্বিতীয় বাজার থাকে অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রয় করা যায় একে বেশী আকর্ষনীয় মনে করা হয়। মানুষ টাকার বিনিময়ে এগুলো নিতে এজন্যই আগ্রহী হয় যে যখন ইচ্ছা এগুলোকে দ্বিতীয় বাজারে বিক্রয় করে নগদ অর্থ অর্জন করতে পারে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে কোম্পানী

এ পর্যন্ত কোম্পানী সম্পর্কে প্রচলিত নীতির বিবরণ পেশ করা হলো। এখন শরীয়তের দৃষ্টিতে কোম্পানীর উপর আলোচনা করা সমীচীন মনে করি। এবিষয়ের আলোচনা কে দুইভাগে ভাগ করা যায়। এক. মূলগতভাবে কোম্পানীর বৈধ অবৈধ সংক্রান্ত আলোচনা। দুই. কোম্পানীর সাথে সম্পৃক্ত শাখাগত মাসআলা। পুর্বে কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য সমূহের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে কোম্পানী শিরকত তথা অংশীদারিত্বের প্রসিদ্ধ প্রকারসমুহের মধ্যে পড়ে না। ফুকাহায়ে কেরাম শিরকত ৪প্রকার উল্লেখ করেছেন যদি মুদারাবাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয় তাহলে ৫প্রকার হয়। কোম্পানীর প্রচলিত নীতি পুরোপুরি ভাবে কোন প্রকারেরই অন্তর্ভূক্ত নয়। পুর্বে কোম্পানী ও শিরকতের মধ্যে পার্থক্য সমূহ বর্ননা করা হয়েছে। এব্যাপারে র্বতমান ওলামার তিনধরণের দৃষ্টি ভঙ্গি পাওয়া যায়।

প্রথম ঃ যেহেতু শরীয়তের দৃষ্টিতে শিরকত পাঁচ প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ আর কোম্পানী পুরিপূর্ণ ভাবে কোনটিরই অন্তর্ভূক্ত নয়। তাই কোম্পানী অবৈধ ।

দ্বিতীয় ঃ কোম্পানী যে পাঁচ প্রকারের কোনটির অন্তর্ভূক্ত নয় শুধু একথার ভিত্তিতে কোম্পানীকে অবৈধ বলা যেতে পারে না। কেননা ফুকাহায়ে কেরাম যে প্রকার ভেদ বর্ণনা করেছেন তা কোরআন হাদিসে স্পস্ট নয় বরং ফুকাহায়ে কেরাম শিরকতের প্রচলিত প্রকৃতিগুলো অন্বেষণ করে তার আলোকে প্রকার করেছেন । দ্বিতীয়ত কোরআন হাদিস বা ফুকাহার কথায় কোথাও উল্লেখ নেই যে, যে পদ্ধতি ঐ প্রকারভেদ বর্হিভূত হবে তা অবৈধ। অতএব যদি শিরকতের কোন পদ্ধতি উক্ত প্রকারভেদ বর্হিভূত হয় এবং শিরকতের মূলনীতি সমুহের কোনটির খেলাফও না হয় তাহলে তা বৈধ হবে। তৃতীয় হযরত আশরাফ আলী থানভীর (রাহঃ) দৃষ্টিভঙ্গি, তিনি বলেন ঃপ্রকৃত অর্থে কোম্পানী শিরকতে ইনান (شركت عنان)এর অন্তর্ভূক্ত । (ইমদাদুল ফতওয়াপৃ ৪৬৪) যদিও কোম্পানীর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা প্রসিদ্ধ শিরকতে ইনানের মধ্যে পাওয়া যায়না কিন্তু এর দ্বারা ইনানের (عنان) যথার্থতা পরিবর্তন হবে না। এখন শরীয়তের দৃষ্টিতে কোম্পানীর ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য তার বৈশিষ্ট্য সমূহের উপর পৃথক

পৃথক চিন্তা ভাবনা করতে হবে। সে বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে অধিকাংশই শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ নয়। তবে কোম্পানীর দুটি জিনিস শরীয়তের দৃষ্টিতে চিন্তার বিষয় । এ ব্যাপারে আমার গবেষণার সারমর্ম জ্ঞানীদের গবেষণার জন্য পেশ করছি ।

(১) প্রথম মাসআলা ঃ শিরকতের ভিন্ন কোন আইন গত অস্তিত্ব হয় না কিন্তু কোম্পানীর ভিন্ন আইন গত অস্তিত্ব হয় যাকে شَخْصٌ قَانُوْنِيٌّ আইনানুগ এক ব্যক্তি বলে। এখন প্রশ্ন হলো আইনানুগ এক ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না। পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে শরীয়তে এর পারিভাষিক অস্তিত্ব নাই বটে তবে এর নমুনা আছে।

" আইনানুগ এক ব্যক্তি" এর উদাহরণ ঃ

১. وقف (ওয়াক্ফ)

এর জন্য আইনানুগ এক ব্যক্তির পরিভাষা ব্যবহার না হলেও বাস্তবে তা আইনানুগ এক ব্যক্তি। কেননা ওয়াকফ মালিক হয়। যেমন মসজিদ অথবা ওয়াকফ্কে চাঁদা বা অন্য কিছু প্রদান করলে তার ওয়াকফের কথা স্পষ্ট করা ছাড়া তা ওয়াক্ফ হয় না।বরং ওয়াক্ফের মালিকানাধীন হয়, আর ওয়াক্ফ মালিক হয়। ওয়াক্ফ মহাজনও (ঋনদাতা) হয়। যেমন কোন ব্যক্তি ওয়াক্ফের জমি ভাড়া নিলে সে ভাড়া ওয়াকফের ঋণ ও ওয়াক্ফ মহাজন। তেমনি ভাবে ওয়াক্ফ ঋণীও হয়। যেমন কেহ ওয়াক্ফের মুতাওয়াল্লী বা চাকর। তার বেতন ওয়াক্ফের দায়িত্বে ঋণ। আদালতে মুকাদ্দামা হলে ওয়াক্ফ বাদী-বিবাদীও হয়। মুতাওয়াল্লী তার প্রতিনিধিত্ব করে। মালিক হওয়া, মহাজন হওয়া, ঋনী হওয়া, বাদী ও বিবাদী হওয়া ব্যক্তির গুণাবলী। বুঝা গেল ওয়াক্ফতে আইনানুগ ব্যক্তির বৈশিষ্ট সমূহ মেনে নেয়া হয়েছে। যদিও ফুকাহারা এ পরিভাষা ব্যবহার করেন না।

২. بيت المال (বাইতুল মাল)

বাইতুল মালের সম্পদের সাথে পুরা জাতির অধিকার সম্পৃক্ত। তবে কেহই সে সম্পদে মালিকানার দাবী করতে পারে না। সে সম্পদের মালিক বাইতুল মাল নিজেই। বুঝা গেল বাইতুল মালও আইনানুগ এক ব্যক্তি। বরং ফকীহদের বিশ্লেষণে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বাইতুল মালের প্রতিটি মুদ (দু রিতল পরিমাণ ওজন) ভিন্ন ভিন্ন আইনানুগ এক ব্যক্তি।

বাইতুল মালের দুটি অংশ ঃ

১. বাইতু মালিস্সাদকা। ২. বাইতু মালিল খারাজ।

ঈমাম যাইলায়ী (রাহঃ) লিখেছেন যে, যদি এক অংশে মাল না থাকে তাহলে প্রয়োজনে অন্য অংশ থেকে ঋণ নিতে পারে। (تبيين الحقائق ৩ : ২৮৩) তাহলে যে অংশ থেকে ঋণ নেয়া হল তা ঋণ দাতা (মহাজন)। যে অংশের জন্য ঋণ নেয়া হয়েছে তা ঋণী। একজন ব্যক্তিই ঋণ দাতা বা গ্রহিতা হতে পারে। সেজন্য বুঝা গেল বাইতুল মালকেও আইনানুগ এক ব্যক্তি মেনে নেয়া হয়েছে।

৩। تَرِكَةٌ مُسْتَغْرِقَةٌ بِالدَّيْنِ (ঋনে বেষ্টনকৃত মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি)ঃ

কোন মৃত্যু ব্যক্তির সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পদ ঋণে ভরপুর হলে সে অবস্থায় ঋণদাতাদের ঋণ গ্রহীতা মৃতু ব্যক্তি নয়। কেননা মৃত্যুর পর কেহ ঋণ গ্রহীতা হয় না। আবার উত্তর সুরীরাও নয়। কেননা তারা পরিত্যক্ত সম্পদ পায় নাই। তাহলে বুঝা গেল এখানে পরিত্যক্ত সম্পদই ঋণী যা আইনানুগ এক ব্যক্তি।

৪। خُلْطَةُ الشُّيُوعِ যৌথের অংশীদারিত্ব ঃ

এই উদাহরণ হানাফী মাযহাব অনুযায়ী হবে না। অন্যান্য তিন ঈমামদের মাযহাব অনুযায়ী হবে। তাদের নিকট যাকাতের সম্পদের মধ্যে কয়েক ব্যক্তি যৌথ ভাবে অংশীদার হলে যাকাত প্রত্যেকের ভিন্ন অংশে ওয়াজিব হবে না। বরং সামগ্রীক ভাবে যাকাত ওয়াজিব হবে। বুঝা গেল তাদের নিকট সামগ্রীক সম্পদ আইনানুগ এক ব্যক্তি। এখানে উল্লেখ্য যে, خُلْطَةُ الشُّيُوعِ এবং কোম্পানীর নীতির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান خُلْطَةُ الشُّيُوعِ তে ৩ ঈমামদের মতে সামগ্রীক সম্পদের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়। প্রত্যেক অংশীদারের নিজস্ব মালিকানার উপর জাকাত ওয়াজিব হয় না। অপর দিকে কোম্পানীতে কোম্পানীর উপর ভিন্ন ট্যাক্স শেয়ার হোল্ডারদের উপর ভিন্ন ট্যাক্স আরোপিত হয়। উল্লেখিত উদাহরণ গুলো থেকে জানা গেল যে, আইনানুগ এক ব্যক্তির ব্যাপারটি অমূলক নয় এবং ইসলামী ফিক্বাহয় অপরিচিত কিছু নয় তবে পরিভাষাটি অবশ্যই নতুন।

শরীয়তের দৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ দায় ঃ

কোম্পানীর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট যা শরীয়তের দৃষ্টিতে চিন্তার বিষয় তাহলো Limited Liability বা সীমাবদ্ধ দায় যার ব্যাখ্যা বলা হয়েছে। এর মধ্যে যতটুকু শেয়ার হোল্ডার দের সীমাবদ্ধ দায়ের সম্পর্ক আছে শরয়ী দৃষ্টিকোন থেকে তার নযীর পাওয়া যায়। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত রাব্বুল মাল (অর্থের যোগান দাতা) মুদারিবকে অন্যদের থেকে ঋণ নেয়ার অনুমতি দিবে না ততক্ষণ পর্যন্ত মুদারাবায় রাব্বুল মালের দায় তার পুজি পর্যন্ত সীমিত হয়। যদি রব্বুল মাল পুঁজি দেয়ার পর অতিরিক্ত ঋণ নেয়ার অনুমতি না দেয় অতঃপর কারবারের ফলে মুদারিব ঋনী হয়ে যায় তাহলে রাব্বুল মাল বেশীর চেয়ে বেশী তার পুজির সীমা

পর্যন্তই ক্ষতি গ্রস্ত হবে। বেশীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে না। বরং বেশীর যিম্মাদার মুদারিব হবে। কেননা সে রাব্বুল মালের অনুমতি ছাড়াই ঋণ নিয়েছে। তেমনি শেয়ার হোল্ডারগণ যারা নিজে কাজ করছে না তাদের দায় সীমাবদ্ধ হওয়ার শর্ত মুদারাবার নীতিতে বিশুদ্ধ মনে হচ্ছে। তবে এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, সমস্ত কোম্পানীর প্রসপেকটাসে উল্লেখ আছে যে, কোম্পানী প্রয়োজনে ব্যাংক ইত্যাদির কাছ থেকে ঋণ নিতে পারে। এবং যারা কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার হয় তাদের এ কথা জানাই থাকে। যখন তারা প্রসপেকটাস দেখে কোম্পানীর অংশীদার হয় তখন তাদের পক্ষ থেকে কারবারে ঋণ নেয়ার মৌন নীরব অনুমতি থাকে। রব্বুল মাল মুদারিব কে ঋণের অনুমতি প্রদানের কারণে তার দায় সীমাবদ্ধ থাকে না।

উল্লেখিত সন্দেহ নিরসনে বলা যেতে পারে, প্রসপেকটাসে ইহাও উল্লেখ থাকে যে, শেয়ার হোল্ডারদের দায় সীমাবদ্ধ। যার অর্থ হলো অংশীদারদের পক্ষ থেকে কোম্পানীর ঋণ নেয়ার অনুমতি, ঋণের দায় তাদের উপর না বর্তানোর শর্তে হয়ে থাকে। তাই এর সামঞ্জস্যপূর্ণ উদাহরণ হলো, ঋণের দায় নিজেই বহন করার শর্তে রব্বুল মাল মুদারিবকে ঋণ নেয়ার অনুমতি দেয়। তবে এখানে শরয়ী দৃষ্টিকোন থেকে মূল প্রশ্ন হলো মুদরাবায় রব্বুল মালের দায় সীমিত হয় কিন্তু মুদাবিবের দায় সীমিত হয় না। তাই ঋণদাতা মহাজনরা রব্বুল মালের পুজির চেয়েও বেশী ঋণ মুদারিব থেকে উসুল করতে পারে। কেননা মহাজনদের দায় নষ্ট হয় না। কিন্তু কোম্পানীতে ডাইরেক্টারদের দায় সীমাবদ্ধ এবং কোম্পানী নিজে যে আইনানুগ এক ব্যক্তি তার দায় ও সীমাবদ্ধ।

যার ফলাফল হলো কোম্পানী কাচা মালের চেয়েও অতিরিক্ত যে ঋণ নিবে তা উসুলের কোন অবকাশ নাই। মহাজনদের দায় নষ্ট হবে। ফুকাহার পরিভাষা خراب الزمة যার অর্থ হলো -ঋণদাতার ঋণ পরিশোধের কোন ব্যবস্থা নাই। উল্লেখিত প্রশ্নের কারণে অনেক সমকালীন ওলামার মত হলো সীমাবদ্ধ দায়ের ধারণা শরীয়তের দৃষ্টিতে ঠিক নয়। কেননা এর দ্বারা মানুষের অধিকার নষ্ট হয়। কমপক্ষে ডাইরেক্টরদের দায় সীমাহীন হওয়া উচিত।

তবে এই সমস্যাটিকে অন্য পরিমাপে দেখলে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, কোম্পানীর সীমাবদ্ধ দায়ের পরিকল্পনার ভিত্তি মূলত আইনানুগ এক ব্যক্তির পরিকল্পনার উপর। আইনানুগ এক ব্যক্তির বাস্তবতা মেনে নেয়ার পর সীমাবদ্ধ দায় মেনে নেয়া কষ্ট সাধ্য নয়। কোন ব্যক্তি বাস্তবেই দেওলিয়া হয়ে গেলে ঋণদাতা মহাজনরা শুধু তার সম্পদ থেকেই ঋণ উসুল করে। এর চেয়ে বেশী কামনা করতে পারেনা। হযরত মায়াজ বিন জাবাল (রাযিঃ) কে দেউলিয়া সাব্যস্ত করার পর রাসূল (সাঃ) তার ঋণদাতাদের বলেছিলেন?

خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ اِلَّا ذٰلِكَ (صحيح المسلم)

তোমরা যা পাও নাও। উহা ছাড়া তোমাদের অন্য কিছু নাই। (মুসলিম শরীফ - পৃ -২১৯)। তবে দ্বিতীয়বার ধনী হয়ে গেলে আবার চাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যদি দেওলিয়া হয়েই মৃত্যু বরণ করে তাহলে خراب الزمه (দায় নষ্ট) হয়ে যাবে। তা পরিশোধের কোন পথ নেই।

জানা গেল যে, প্রকৃত ব্যক্তি যদি দরিদ্র হয়ে যায় তাহলে তার দায়ভার সম্পদ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। ঋণ দাতাদের দায় নষ্ট হয়ে যায়। যখন কোম্পানীকেও এক ব্যক্তি মেনে নেয়া হয়েছে তখন তা দেওলিয়া হয়ে বন্ধ হয়ে গেলে তার দায়ও কাচামাল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত।

তাই কোম্পানীর বন্ধ হয়ে যাওয়াই আইনানুগ এক ব্যক্তির মারা যাওয়া। বিশেষ করে যখন কোম্পানীর সাথে লেনদেন কারী একথা বুঝেই লেনদেন করে যে ইহা লিমিটেড কোম্পানী আমার অধিকার শুধু আসবাব পত্র পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এ কারণেই লিমিটেড কোম্পানীর সাথে লিমিটেড লেখা জরুরী। এরপর কোম্পানীর ব্যালেন্স সীট ও প্রকাশ হতে থাকে। ঋণ দাতা মহাজন ব্যালেন্স শীট দেখে কোম্পানীর অর্থনৈতিক দঢ়তা দেখেই ঋণ প্রদান করে। এক কথায় যারাই লিমিটেড কোম্পানীর সাথে লেনদেন করে তারা বুঝে শুনেই করে। এতে কোন প্রকার ধোকা বা প্রতারনা হয় না। এজন্যই বর্তমানের অধিকাংশ ওলামার মত হলো ঃ সীমাবদ্ধ দায়ের কারণে অংশীদারিত্ব কে অবৈধ বলা যাবে না।

লিমিটেড কোম্পানীর ফেক্হী উদাহরণ ঃ

ফেক্বায় লিমিটেড কোম্পানীর অত্যন্ত মনঃপুত একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। যা মিলিটেড কোম্পানীর খুবই কাছাকাছি। তাহলো عَبْدٌ مَا ذُوْنٌ فِى التِّجَارَةِ অর্থাৎ মনিবের মালিকানা দাস যাকে মালিকের পক্ষ থেকে ব্যবসার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সে যে ব্যবসা করে তাও মনিবের মালিকানাধীন হয়। তার উপর ঋণ ওয়াজিব হলে তা তার মূল্য পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে এর চেয়ে বেশীর ব্যাপারে তারও তার মনিবের উপর দাবী করা যাবে না। এখানেও ঋণ দাতাদের দায় নষ্ট হল। এ উদাহরণ লিমিটেড কোম্পানীর সাথে এজন্যই সামঞ্জস্য যে, কোম্পানীতে যেমন শেয়ার হোল্ডার জীবিত থাকতেই দায় নষ্ট হয় তেমনি ভাবে এখানেও মনিব জীবিত থাকতেই ঋণ দাতাদের দায় নষ্ট হয়।

কোম্পানীর কিছু ক্ষুদ্র সমস্যা ঃ

শরিয়তের দৃষ্টিতে (Under writing) অবলেখন/দায় গ্রহণ এর ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। অর্থাৎ যে প্রতিষ্ঠান নতুন প্রস্তাবিত কোম্পানীর এই মর্মে দায়

গ্রহণ করে যে, যদি জারিকৃত শেয়ার মানুষেরা না নেয় তাহলে সে নেবে। অবশ্য এই দায় গ্রহণের জন্য কমিশন গ্রহণ করে। এখানে দুটি কথা উল্লেখ্য। একটি হলো দায় গ্রহণ কারী বা অবলেখকের হুকুম কি? এই দায়িত্ব ভার ফেক্বার দৃষ্টি কোন থেকে ضمانت (জামানত) বা كفالت (কাফালত) নয় কেননা জামানত ও কাফালত এমন ঋণের ব্যাপারে হয় যা আবশ্যক। অথচ শেয়ার নেয়া আবশ্যক নয়। তাই শেয়ার নেয়ার জামিন হওয়া জামানত বা কাফালত নয়। বরং উহা একটি অঙ্গিকার। তবে মালেকী মাযহাব মতে তাকে التزام বলা যেতে পারে। (التزام বলা হয় নিজের উপর কোন কিছুকে অবশ্যক করে নেয়া যা মালেকী মাযহাব মতে একটি ভিন্ন অধ্যায়) অঙ্গিকার হানাফী মাযহাব মতে নৈতিকতার দৃষ্টিকোন থেকে পুরা করা জরুরী হলেও আইনগত দিক থেকে জরুরী নয়। তবে মালেকী মাযহাব মতে অনেক সময় জরুরী হয়ে পড়ে। তাই বেশীর চেয়ে বেশী বলা যেতে পারে যে, মালেকী মাযহাব মতে এই অঙ্গিকার পুরা করা জরুরী।

দ্বিতীয় সমস্যা এ কমিশনের ব্যাপারে যা Wnder writing এর উপর নেয়া হয়। এই কমিশন বৈধ হওয়ার কোনই পথ নেই। কেননা এই কমিশন কোন বিনিময় ছাড়া যা ফেক্বার দৃষ্টিকোন থেকে সুদ । সে প্রতিষ্ঠান যখন শেয়ার নিবে তখন কোম্পানীর অংশীদার হয়ে যাবে যার (অংশীদারের) উপর কমিশন নেয়া বৈধতার কোন পথ নাই। তবুও কিছু অবস্থা এমন আছে যার উপর Under writer কমিশন নিতে পারে। যেমন ঃ অবলেখনের পূর্বে দায় গ্রহণকারী কোম্পানীর ব্যাপারে কয়েকটি জিনিষ জরিপ করে। যেমন ঃ কোম্পানী কি কারবার করবে? কারা কোম্পানী পরিচালনা করবে? লাভ ক্ষতির সম্ভাবনা কেমন? ইত্যাদি। যাকে Studies বলে। দায় গ্রহণ কারী সে Studies এর প্রকৃত খরচ নিতে পারে। তেমনি ভাবে এই দায় গ্রহণের পদ্ধতিও পরিবর্তন করা যেতে পারে। যেমন দায় গ্রহণ কারী প্রতিষ্ঠান শেয়ার ক্রয় করার পরিবর্তে শেয়ারের ক্রেতা ঠিক করে দেয়ার দায়িত্ব নিতে পারে। যা মূলতঃ দালালী। এর বিনিময় নেয়া বৈধ। এই পরিবর্তনে কার্যত বিশেষ কোন জটিলতাও নাই। ব্যাংক সাধারণত তাই করে যে, শেয়ার নিজের কাছে না রেখে অন্যান্যদের নিকট বিক্রয় করে দেয়।

প্রকাশ থাকে যে, (Under writing) অবলেখনের উপর কমিশন গ্রহণের জন্য সমকালীন অনেকেই প্রস্তাব দিয়েছেন যে, অবলেখক কে কমিশন দেয়ার পরিবর্তে তার কাছে স্বল্পমূল্যে শেয়ার বিক্রয় করা হবে। যেমন দশ টাকার শেয়ার সাড়ে নয় টাকায় দেয়া হবে। কিন্তু এই প্রস্তাব শরীয়ত সম্মত নয়। কেননা শেয়ার কেনার অর্থ কোম্পানীর অংশীদার হওয়া। এখন যদি দশ টাকার শেয়ার সাড়ে নয় টাকায় দেয়া হয় তাহলে ফল দাঁড়াবে যে, দায় গ্রহণ কারী সাড়ে নয় টাকায় দশ টাকার আসবাব পত্রের মালিক হচ্ছে যা অংশীদারিত্বের উৎপত্তিতে বৈধ নয়।

শরীয়তের দৃষ্টিতে শেয়ার ও তার ক্রয় বিক্রয়

সমকালীন কিছু ওলামার মতে শেয়ার কোম্পানীর আসবাব পত্রের মধ্যে শেয়ার হোল্ডারদের মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে না। বরং ইহা কোম্পানীকে টাকা প্রদানের প্রমাণ পত্র। যেমন বন্ড ইত্যাদি। পার্থক্য এতটুকুই যে, বন্ড ইত্যাদিতে নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করা হয়। কিন্তু শেয়ারে সুদের হার নির্ধারিত হয় না। বরং কোম্পানীর লভ্যাংশের পরিমিত একটি অংশ প্রদান করা হয়। যদি শেয়ার কোম্পানীর আসবাব পত্রে মালিকানার প্রতিনিধিত্ব রাখতো তাহলে শেয়ার হোল্ডারের দেউলিয়া হওয়া অবস্থায় যেখানে তার অন্যান্য- সম্পদ বাজেয়াপ্ত হয় তখন কোম্পানীতে তার মালিকানা অংশও বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তা হয় না।

বুঝা গেল কোম্পানীর আসবাব পত্রে শেয়ার হোল্ডারের মালিকানা নাই। এই দৃষ্টিকোন থেকে শেয়ার নেয়াও জায়েজ নাই এবং তা কমবেশী করে আগে ক্রয়-বিক্রয় ও জায়েজ নাই। এবং যেহেতু শেয়ার হোল্ডারের কোম্পানীর আসবাব পত্রে মালিকানা নাই তাই সেখানে তার জাকাত ও ওয়াজিব হবে না। এই মতের উপর যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। কিন্তু এই মত ঠিক মনে হয় না। কোম্পানীর বাহ্যিক ধারণা এবং তার বিষয় বস্তুর উপর যে সব গ্রন্থ লিখা হয়েছে সেগুলোর আলোকে বাস্তবেই বুঝা যায় যে, শেয়ার হোল্ডারের কোম্পানীর আসবাব পত্রে মালিকানা হয়।

এ কারণেই যদি পরস্পরের মীমাংসায় (রেজুলেশনে) কোম্পানী বিলোপ সাধন করা হয় তাহলে শেয়ার হোল্ডার গণ শুধু দেয় অর্থই ফেরৎ পায় না বরং কোম্পানীর আসবাব পত্রের অনুরূপ অংশও ফেরৎ পায়। অথচ অন্যান্য আর্থিক প্রমাণ পত্র সমূহ যেমন বন্ড ইত্যাদিতে কোম্পানীর বিলোপ সাধনে শুধু দেয় অর্থই সুদ সহ ফেরৎ দেয়া হয়। তাই বুঝা গেল শেয়ার শুধু ঋণের প্রমাণ পত্র নয়। বরং শেয়ার কোম্পানীর আসবাব পত্রে শেয়ার হোল্ডারদের মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে। শেয়ারের এই বাস্তবতা প্রকাশিত হওয়ার পর জানা গেল, মূলতঃ শেয়ার কোন জিনিস নয়। বরং এর পশ্চাতে যে সম্পদ বা আসবাব পত্র আছে তাই আসল।

তাই শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় মুলত কোম্পানীর আসবাব পত্রের মধ্যে থেকে অনুরূপ মালিকানার ক্রয় বিক্রয়। কোম্পানীর আসবাব পত্র বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন ঃ নগদ, পরিশোধ যোগ্য ঋণ, জমাট বস্তু, ব্যবসার পণ্য ইত্যাদি। প্রত্যেক প্রকারেই শেয়ার হোল্ডারের অনুরূপ অংশ থাকে। অতএব শেয়ার

বিক্রয়ের অর্থ নগদ ঋণ, জমাট বস্তু এবং ব্যবসার পণ্য এগুলোর মধ্যে নিজের অনুরূপ মালিকানা বিক্রয় করা। এ হিসাবে শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের শর্ত সমূহ ও ব্যাখ্যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের শর্ত সমূহ ঃ

(১) কোম্পানীর আসবাব পত্র নগদ ও ঋণের আকৃতিতে না থাকলে শেয়ার তার নির্ধারিত মূল্যের কমবেশীতে বিক্রয় বৈধ হবে। কিন্তু যদি কোম্পানী এখানো কোন প্রকার জমাট বস্তু যেমন বিল্ডিং, মেশিনারী ইত্যাদী অথবা ব্যবসার পন্য ক্রয় না করে। বরং তার কাছে শুধু নগদ অথবা কাউরো জিম্মায় ঋণ থাকে তাহলে শেয়ার তার লিখিত মূল্যের (Face Value) কম বিক্রয় বেশীতে বৈধ হবে না। কেননা শেয়ার শুধু নগদের প্রতিনিধিত্ব করছে। অর্থাৎ দশ টাকার শেয়ার দশ টাকারই প্রতিনিধিত্ব করছে। তাই উহা এগার টাকায় বিক্রয় করলে সুদ হবে। যখন নগদের সাথে কোম্পানীর অন্যান্য আসবাব ও অস্তিত্ব লাভ করবে তখন শেয়ার বিক্রির অর্থ হবে কোম্পানীর আসবাব সমূহের মধ্যে প্রত্যেকের অনুরূপ অংশের বিক্রয়।

এখন এই মাসআলার ভিত্তি مدعجوة এর মাসআলার উপর। যা ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও শাফেয়ী (রাহঃ) দ্বয়ের মাঝে মতবিরোধী শিরোনামের মাসআলা। অর্থাৎ সুদী ও সুদবিহীন মাল একত্রে সুদী মালের বিনিময়ে বিক্রয় করা। যেমন স্বর্ন যুক্ত তলোয়ারে তলোয়ার সুদবিহীন মাল এবং স্বর্ন সুদী মাল উহাকে দিনারের (স্বর্নমুদ্রা) বিনিময়ে ক্রয় বিক্রয়ের হুকুম কি? এর মধ্যে মতভেদ আছে। ঈমাম শাফেয়ী (রাঃ) এর মতে সুদী ও সুদবিহীন মিলিত মালের মধ্যে সুদী মাল কে পৃথক না করা পর্যন্ত বিক্রয় জায়েয হবে না। ঈমাম আ'জম আবু হানিফা (রহঃ) এর মতে নিরেট সুদী মাল মিলিত সুদী মালের চেয়ে বেশী না হওয়ার শর্তে জায়েজ। সুদী মালের সাথে সমপরিমাণ সুদী মাল বিনিময় করে অবশিষ্ট সুদী মালের সাথে সুদ বিহীন মালের বিনিময় হবে। শাফেয়ীদের কিছু ওলামা ও হাম্বলীদের মতে মিলিত মালের মধ্যে অধিকাংশ সুদী হয় তাহলে নিরেট সুদী মালের বিনিময়ে বিক্রয় নাজায়েজ। তবে যদি মিলিত মালের মধ্যে সুদ বিহীন মাল বেশী এবং সুদী মাল কম হয় তখন নিরেট সুদী মালের বিনিময়ে বিক্রয় জায়েজ। শেয়ার বিক্রয়ও এমনই অবস্থা। নগদ এবং নগদ বিহীন আসবাব নগদের বিনিময়ে বিক্রয় হচ্ছে। ঈমাম শাফেয়ী (রাঃ) এর মতে শেয়ার বিক্রয় জায়েজ নয়। শাফেয়ীদের অনেকেও হাম্বলীদের মতে যদি কোম্পানীর আসবাব পত্র বেশী হয়, নগদ কম হয় তাহলে শেয়ার বিক্রয় জায়েজ পক্ষান্তরে নগদ বেশী আর অন্যান্য আসবাব কম হলে শেয়ার বিক্রয় না জায়েজ।

বর্তমানে অধিকাংশ আরবীয় ওলামা এমনই ফতওয়া প্রদান করছেন। যে দৃষ্টিকোন থেকে শেয়ার ক্রয়ের পূর্বে কোম্পানীর আসবাব পত্র পর্যবেক্ষন করা জরুরী যে, নগদ বেশী না নগদ ছাড়াই বেশী। কিন্তু হানাফীদের মতে এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। নগদ ছাড়াও কোম্পানীর কিছু আসবাব আছে জানতে পারলে লিখিত মূল্যের (Face Value) চেয়ে বেশীর দ্বারাও ক্রয় বিক্রয় জায়েজ হবে। তবে যদি শেয়ারের পূর্ণ মূল্য প্রত্যেক শেয়ারের অংশে কোম্পানীর নগদ এবং ঋণের সমতুল্য মূল্যের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে কম হয় তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে না। যেমন দশ টাকার অংশে যদি আট টাকা নগদ ও ঋণের বিনিময়ে অবশিষ্ট দুই টাকা জমাট বস্তুর বিনিময়ে হয় তাহলে আট টাকা বা তার চেয়ে কম মূল্যে শেয়ার বিক্রয় জায়েজ হবে না। তবে নয় টাকা বা বেশী মূল্যে জায়েজ হবে।

(২) শেয়ার ক্রয় বিক্রয় বৈধ হওয়ার জন্য আরেকটি শর্ত হলো কোম্পানীর কারবার হালাল হওয়া, কোম্পানীর মূল কারবারই হারাম হলে শেয়ার কখনো বৈধ হবে না। যেমন কোন কোম্পানী মদ তৈরী করে অথবা কোম্পানীর মূল কারবার সুদ ভিত্তিক হয়। যেমন ব্যাংক ইত্যাদি।

(৩) কখনো কোম্পানীর মূল কারবার হালাল হয়। কিন্তু অন্য কোন ভাবে সুদের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। যেমন ঃ ব্যাংক থেকে সুদের উপর ঋণ নেয়। অথবা অতিরিক্ত অর্থ ব্যাংকে রেখে সুদ গ্রহণ করে। বর্তমানের অধিকাংশ কোম্পানী এমনই হয়ে থাকে। এমন কোম্পানীর শেয়ার নেয়ার হুকুম কি? এর মধ্যে বর্তমানের ওলামার মধ্যে মতভেদ আছে কিছু ওলামার দৃষ্টিভঙ্গি হলো কোম্পানী মৌলিক ভাবে সুদী কারবার করুক বা যেকোন ভাবে জড়িয়ে পড়ু ক কম হোক কিংবা বেশী সর্বাবস্থায় সুদী কারবারই করছে। এর শেয়ার নেয়া অর্থ সুদী কারবারের ওকীল হওয়া। তাই সর্বাবস্থার শেয়ার ক্রয় বিক্রয় অবৈধ। তবে বিশুদ্ধ মত হলো কোম্পানীর সুদী লেনদেন দুই প্রকার। এক. কোম্পানী সুদের উপর ঋণ নিবে। এমতাবস্থায় কোম্পানীর আমদানীতে কোন হারাম মৌল অন্তভূক্ত নাই। কেননা কেহ সুদের উপর 'ঋণ নিলে এই কাজ হারাম হলেও সে ঋণের মালিক হয়ে যাবে। তার মাধ্যমে কারবার করে যে আমদানী হবে তাও হালাল হবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, কোম্পানী যেহেতু শেয়ার হোল্ডারদের উকিল তাই সুদের উপর ঋণ গ্রহণের সাথে সেও সম্পৃক্ত হবে এবং সুদের উপর ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে তার সন্তুষ্টিও প্রকাশ পাবে। এর উত্তরে হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রাহঃ) বলেন ঃ শেয়ার হোল্ডার যে কোন ভাবে যদি জানিয়ে দেয় যে, আমি সুদী কারবারে রাজী নই। তাহলে তার দায়িত্ব শেষ হবে যাবে। কোম্পানীর পরিচালকদের কাছে এ মর্মে পত্র প্রেরণ করেও দায়িত্ব মুক্ত হতে পারে। (এমদাদুল ফতওয়া, খন্ড-২ পৃঃ ৪৯১)

(বর্তমানে এর উত্তম পদ্ধতি হলো বার্ষিক সাধারণ সভায় (A.G.M) এ ব্যাপারে প্রস্তাব দেয়া যেতে পারে)। এখানে আবারো প্রশ্ন হতে পারে যে, কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারগণ শেয়ার ক্রয়ের কারণে তার উকিল (প্রতিনিধি) হলেও তার জানা আছে যে, সুদী কারবার বন্ধের প্রস্তাব দিলেও তার কার্যে পরিণত হবে না। ওকালত হওয়ার পরেও কোন প্রভাব হীন আওয়াজ তুলে সে কিভাবে দায়মুক্ত হতে পারে, এর উত্তরে বলা হবে যে, কোম্পানীর ওকালত অংশীদারিত্বের (Partner Ship) ওকালত থেকে ভিন্নতর। অংশীদারিত্বে প্রত্যেক অংশীদারের ওকালত এমন প্রবল যে, একজন অংশীদারও কারবারে আপত্তি জানালে কারবার হবে না। অংশীদারিত্বে সকলের একমতেই সিদ্ধান্ত হয়। কোম্পানীতে উকিল মুয়াক্কেলের সম্পর্ক এমন প্রবল নয় যে, একজন শেয়ার হোল্ডার আপত্তি জানালে সিদ্ধান্ত হবে না। কোম্পানীতে সকলের একমতে সিদ্ধান্ত হয় না এবং এমন সম্ভবও নয়। এখানে অধিকাংশের মতে সিদ্ধান্ত হয়।

তাই যদি একজন সুদীলেনদেনের বিপক্ষে কথা বলে আর কম হওয়ার কারণে তার উপর আমল না করে সুদী কারবার চলতেই থাকে তাহলে একথা বলা যাবে না যে, তার প্রতিনিধিত্বে ও সন্তুষ্ঠিতেই সুদী কারবার চলছে। তাই বুঝা যায় কোম্পানীর মূল কারবার হালাল হলে কখনো সুদের উপর ঋণ নিলেও তার শেয়ার ক্রয় করা বৈধ হবে। তবে তাকে সুদের বিপক্ষে আওয়াজ তুলতে হবে।

কোম্পানীর সুদী লেনদেনের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো ঃ

কোম্পানী ঋণদিয়ে সুদ নিবে। যেমন বর্তমানের অধিকাংশ কোম্পানী অতিরিক্ত অর্থ ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাবে জমা রেখে তার উপর সুদ গ্রহণ করে।

এখানে দুটি প্রশ্ন ঃ এক ঃ এই সুদী লেনদেনে শেয়ার হোল্ডারগণও অংশীদার হয়ে যাবে। এর উত্তর উহাই যা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

দুই ঃ কোম্পানী যে লভাংশ (Dividend) বন্টন করবে এর মধ্যে সুদ ও অর্ন্তভূক্ত থাকে। আমদানীর যে অংশ সুদের দ্বারা অর্জিত হয় তা হারাম। এ ব্যাপারে হযরত থানভী (রাঃ) দুটি কথা বলেছেন।

প্রথমত ঃ প্রত্যেক কোম্পানীর ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নয় যে, সে সুদ গ্রহণ করে। গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করা আমাদের দায়িত্ব নয়।

দ্বিতীয়ত ঃ সুদ গ্রহণের ব্যাপারটি মেনে নিলেও তা খুব কম এবং হালাল মালের সাথে মিশ্রিত। মিশ্রিত মালের অধিকাংশ হালাল হলে তা ব্যবহারের অবকাশ আছে। কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকেই যায় তাহলো যদি কোন ব্যক্তি হালাল হারাম মিশ্রিত মাল থেকে হাদিয়া দেয় তাহলে সে মালের মধ্যে হারাম অংশ কম থাকলে হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ। কারণ মনে করা হয় যে এই হাদিয়া হালাল মাল

থেকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোম্পানীর যা আয় হয় তার প্রতি পরিমাপের এক অনুরূপ অংশ লভ্যাংশের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়। তাই সুদেরও এক অনুরূপ অংশ লভ্যাংশের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়। মনে করি, যদি কোম্পানীর শতকরা দশ ভাগ সুদী একাউন্ট থেকে আয় হয় তাহলে লভ্যাংশেরও শতকরা দশ ভাগ সুদী হবে। তাই লভ্যাংশের যে অংশ সুদী হবে তা সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া সাদকা করা জরুরী। আমদানীর সুদী অংশ কোম্পানীর আয়ের বিবরণপত্র থেকে জানা যেতে পারে। এতেও স্পষ্ট না হলে কোম্পানী পরিচালকগনের থেকে জানা যেতে পারে।

সার কথা ঃ

কোন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের চারটি শর্ত।

(১) কোম্পানীর মূল কারবার হালাল হওয়া।

(২) লিখিত মূল্যের (Face value) চেয়ে কম বেশীতে বিক্রয়ের জন্য কোম্পানীর পন্য শুধু নগদ না হওয়া।

(৩) সুদের বিপক্ষে প্রতিবাদ করা

(৪) কোম্পানীর আমদানীতে সুদ অন্তর্ভূক্ত হলে লভ্যাংশের সে পরিমাণ সদকা করা।

শেয়ার ব্যবসার (Capital Gain) হুকুম

শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের যে আলোচনা করা হল তা তখনই প্রযোজ্য যখন ক্রেতা কোম্পানীর অংশীদার হয়ে পুজি বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয় করে। কিন্তু যদি ক্রেতা মূল্য বৃদ্ধি পেলে বিক্রয় করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে ক্রয় করে তবে তা বৈধ হবে কি না? এ ব্যাপারে ইসলামী বিশ্বের প্রশিদ্ধ ফক্বিহ শাইখ মুহাম্মদ সিদ্দীক আদদরীরের মতে ঃ এ পদ্ধতির ভিত্তি শুধু অনুমান ও আন্দাজের উপর। যাকে (Speculation) বলে। অনুমানের ভিত্তিতে ক্রয় বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা এক ধরনের জুয়ার পথ খুলে দেয়। তাই এই পদ্ধতিতে শেয়ার ক্রয় বিক্রয় বৈধ হবে না। তার মতে কেবল মাত্র কোম্পানীর লাভ ক্ষতিতে অংশীদার হয়ে পুঁজি বিনিয়োগের উদ্দেশ্যেই শেয়ার ক্রয় করা বৈধ। তবে মৌলিক ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এখানে ক্রেতা কি উদ্দেশ্যে ক্রয় করছে সে প্রশ্ন নয়।

প্রশ্ন হলো শুধু শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের যোগ্য কিনা? যদি ক্রয় বিক্রয়ের যোগ্য বলে মেনে নেয়া হয় তখন শেয়ার বিক্রয় অর্থ কোম্পানীর আসবাবপত্রের মধ্যে অনুরূপ অংশের বিক্রয় যে নিয়্যাতেই হোক তা বৈধ। চাই শেয়ার নিজের কাছে রেখে পুজি বিনিয়োগ উদ্দেশ্য হোক অথবা মূল্য বৃদ্ধি পেলে বিক্রয় করে লাভবান হওয়া উদ্দেশ্য হোক। কেননা কোন জিনিসকে ক্রয় বিক্রয়ের যোগ্য মেনে নেয়ার পর শুধু নিয়্যাতের ভিত্তিতে বৈধ ও অবৈধর পার্থক্য করার ফেক্বহী যৌক্তিকতা

নাই। হাঁ! ক্রয় বিক্রয়ের শরীয়ত সম্মত শর্তাবলী পালন করা জরুরী এবং এ শর্তাবলীর প্রতি মনোযোগ দিলে জুয়ার সমস্ত পথ নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে যাবে। অনুমান ও আন্দাজ সরাসরি হারাম হওয়ার যে কথাটি প্রসিদ্ধ আছে তা ঠিক নয়।

অনুমান (Speculation) অর্থাৎ কোন জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে. কোন জিনিসের হ্রাস পাচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা,যার মূল্য হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা তা বিক্রয় করে দেয়া, যার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা তা রেখে দেওয়া। এমন কাজ সরাসরি নিষেধ নয়। এমনটি প্রত্যেক ব্যবসাতেই করা হয়ে থাকে। নিষেধ হলো ক্রয় বিক্রয়ের শরীয়ত সম্মত শর্তসমূহ উপেক্ষা করা। **যেমন ঃ** মালিকানা ছাড়া হাতে পাওয়ার পূর্বেই বিক্রয় করা অথবা এমন ভাবে বিক্রয় করা যা জুয়ার আকৃতি ধারণ করে। উল্লেখিত ব্যাখ্যার আলোকে শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের খুটিনাটির উপর চিন্তা করলে নিম্ন লিখিত মাসআলা সমূহ পাওয়া যায়।

(১) পূর্বে বর্ণিত হয়েছে কিছু কোম্পানী সমূহের অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকা ভুক্ত (Listed) হয়ে যায়। এমন (Provisionally Listed) কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় বিক্রয় বৈধ নয়। কেননা শেয়ার বিক্রয়

মূলত ঃ কোম্পানীর আসবাব পত্রের বিক্রয়।

এখানে এখানো কোম্পানীর মালিকানার আসবাব পত্র নাই। তাই এখানে মালিকানা বিক্রয় হচ্ছে যা অবৈধ। কার্যত এমন শেয়ারের ক্রয় বিক্রয়ও স্টক একচেঞ্জে হয়ে থাকে। এমনও দেখা গিয়েছে যে, কোম্পানীর অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই তার ১০ টাকার শেয়ার ১৮০ টাকা পর্যন্ত বিক্রয় হয়েছে।

(২) **(Future sales)** অর্থাৎ শেয়ারের এমন ক্রয় বিক্রয় যেখানে শেয়ার লেনদেন উদ্দেশ্য নয় বরং লাভ ক্ষতি সমান করে লাভবান হওয়াই উদ্দেশ্য। এমন ক্রয় বিক্রয়ও বৈধ নয়।

(৩) (Forward Sale) অর্থাৎ যেখানে শেয়ার বিক্রয়ের সম্পৃক্ততা ভবিষ্যতের দিকে করা হয়।ইহাও শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। কেননা বিক্রয়ের সময় ভবিষ্যতের দিকে সম্পৃক্ততা করা বা ঝুলিয়ে রাখা ফুকাহার সর্ব সম্মতিতে অবৈধ। হ্যাঁ! ভবিষ্যতে বিক্রয়ের অঙ্গিকার করা যেতে পারে। তবে সময় এলে নিয়তান্ত্রিক বিক্রয় করতে হবে।

(৪) (Spot sale) অর্থাৎ উপস্থিত বিক্রয়। যে উদ্দেশ্যেই হোক ইহা বৈধ।

(৫) (Spot sale) উপস্থিত বিক্রয়েও কখনো কিছু ব্যবস্থাপনার অপরাগতার কারণে শেয়ার হাতে আসতে এক থেকে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত দেরী হয়। উপস্থিত বিক্রয়ের পর শেয়ার উসুল করার পূর্বে তা বিক্রয় করা বৈধ কিনা?

যদি হস্তগত হওয়ার পূর্বে হয় তাহলে অবৈধ। আর যদি হস্তগত হওয়ার পর হয় তাহলে বৈধ। এ সিদ্ধান্তের পূর্বে আমাদের শেয়ার হস্তগত হওয়ার ব্যাখ্যা জানতে হবে। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে শেয়ার মূলত কোম্পানীর সম্পদে অনুরূপ অংশীদারিত্বের নাম এবং শেয়ার সার্টিফিকেট মূলত সে অংশীদারিত্বের লিখিত প্রমাণ পত্র। তাই ক্রয়কৃত মাল লিখিত প্রমাণ পত্র নয় বরং কোম্পানীর সম্পদের এক যৌথ অংশ। বিক্রয় পুরা হলেই সে যৌথ অংশ ক্রেতার দিকে প্রত্যাবর্তন হয়। সে অংশ যৌথ হওয়ায় তার হস্তগত হওয়া অনুভূত নয়। তাই সেখানে সাদৃশ্যগত হস্তগত হওয়াই গ্রহণ যোগ্য। আর তা হয়তো সার্টিফিকেট হাতে এলে হবে নয়তো যৌথ অংশ ক্রেতার দায়িত্বে এলে হবে। এর সিদ্ধান্তের জন্য হস্তগত হওয়ার পূর্বে বিক্রয়ের বাস্তবতা জানা দরকার। হস্তগত করার পুর্বে বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ দুটি।

(১) হস্তগত হওয়ার পূর্বে ক্রয়কৃত মাল ক্রেতাকে অর্পন করা নিশ্চিত নয়। যা এক প্রকার ধোকা হওয়ায় বিক্রয় অবৈধ। অর্থাৎ বিক্রয়ের অনেক অবস্থা এমনও আছে যেখানে কোন রূপ ধোকা পাওয়া যায় না ঠিকই, কিন্তু ক্রয় কৃত মাল অনুভূত ভাবে হস্তগত হয় না। তবে কার্যত ঃ তা ক্রেতার হস্তক্ষেপে আসে। সেজন্য এরূপ ক্ষেত্রে হস্তগত হওয়ার পূর্বে বিক্রয় পাওয়া যাচ্ছে না।

(২) হস্তগত হওয়ার পূর্বে বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো হস্তগত হওয়ার পূর্বে ক্রয় কৃত মাল বিক্রেতার যিম্মায় আসে না। আর رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ অর্থাৎ যিম্মায় নাই এমন লাভ বৈধ নয়। যেথানে অনুভূত হস্তগত হয়নি কিন্তু কার্যত ক্রেতার হস্তগত হয়েছে অর্থাৎ ক্রয় কৃত মাল দ্বারা উপকৃত হওয়া ক্রেতার হস্তক্ষেপে এসেছে এবং তার যিম্মাও প্রমাণিত হয়েছে তাহলে তার বিক্রয় বৈধ হবে। স্টক একচেঞ্জে দায়িত্বশীলদের সাথে বিস্তারিত আলোচনার দ্বারা জানা গিয়েছে যে, উপস্থিত বিক্রয় হওয়ার পরে সমস্ত দায় দায়িত্ব ক্রেতার দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তা ক্রেতার যিম্মায় প্রবেশ করে। তাই উপস্থিত বিক্রয় হয়ে যাওয়ার পর শেয়ারের উপর অনুভূত ভাবে হস্তগত হওয়ার পূর্বে যদি কোন দুর্যোগে কোম্পানী নিঃশেষ হয়ে যায়। তাহলে ক্রেতারই ক্ষতি বুঝা যাবে। স্টক একচেঞ্জ বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করবে।

তেমনি হস্তগত হওয়ার পূর্বেই লভ্যাংশ (Divident) বন্টন হলে কোম্পানী বিক্রেতার নামেই লভ্যাংশ জারী করবে। কেননা কোম্পানীর রেকর্ডে এখানো বিক্রেতার নামই লিখিত আছে। তবে শেয়ারের সাথে লভ্যাংশও ক্রেতাকে দিতে বাধ্য থাকবে। উল্লেখিত আলোচনার দ্বারা জানা গেল, অনুভূত ভাবে হস্তগত হওয়ার পূর্বেই শেয়ার ক্রেতার যিম্মায় এসেছে। এখন শুধু শেয়ার মালিকানার লিখিত প্রমাণ পত্র আসা বাকী আছে। আর শুধু এতটুকুর দ্বারা হস্তগত হয় নাই বলা যাবে না। তাই সার্টিফিকেট হাতে আসার পূর্বেই শেয়ার বিক্রয় বৈধ হবে।

কিন্তু অপর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, প্রত্যেক জিনিস হস্তগত করার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। প্রচলিত অর্থে সার্টিফিকেট হস্তগত হওয়ার পরেই শেয়ার হস্তগত হয়েছে বলে বোঝা যায়। তাই অবৈধ হওয়া উচিত। বিশেষ ভাবে যখন এমন লেনদেনে এক ধরনের জুয়ার প্রতি উৎসাহ দান করা হয়। সেজন্য এসব বিভিন্ন দিক চিন্তা করে সার্টিফিকেট পাওয়ার আগে বিক্রয় না করাই শ্রেয়।

শেয়ারের উপর যাকাত ঃ

কোম্পানীর শেয়ারে যাকাতের আহকাম কি? এ ব্যাপারে তিনটি কথা উল্লেখ্য। (১) কোম্পানীর উপর কোম্পানী (যা আইনানুগ এক ব্যক্তি) হিসাবে যাকাত ওয়াজিব নয়।

এর ভিত্তি خلطة الشيوع যৌথের অংশীদারিত্বের মাসআলার উপর। ঈমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদ বিন হাম্বল (রাহঃ) গনের মতে خلطة الشيوع গ্রহণযোগ্য এবং সামগ্রীক ভাবেই জাকাত ওয়াজিব।

ঈমাম শাফেয়ী (রাহঃ) এর নিকট خلطة الشيوع শুধু জন্তুই নয় বরং ব্যবসার মালের মধ্যেও গ্রহণযোগ্য। তাই কোম্পানীর উপর যাকাত ওয়াজিব।

যদিও কোম্পানী শরীয়তের মুকাল্লাফ (আদেশ প্রাপ্ত) ব্যক্তি নয়। যাকাত একটি ইবাদত যা একমাত্র মুকাল্লাফ ব্যক্তির উপর জরুরী।

কিন্তু শাফেয়ীর (রাঃ)-এর উসুল হলো যাকাত মানুষের উপর ওয়াজিব হয় না বরং সম্পদের উপর ওয়াজিব। একারণেই অপ্রাপ্ত বয়স্কদের সম্পদের উপর ওয়াজিব অথচ সে মুকাল্লাফ নয়, তাই কোম্পানীর উপর যাকাত ওয়াজিব।

তবে শেয়ার হোল্ডারদের উপর জাকাত ওয়াজিব হবে না, কেননা হাদীসে (রাঃ) এসেছে لا ثنى فى الاسلام অর্থাৎ এক মালের উপর দুবার যাকাত ওয়াজিব হয় না। হানাফীদের নিকট خلطة الشيوع গ্রহণযোগ্য নয় এবং তদের নিকট মানুষের উপর যাকাত ওয়াজিব। এজন্য হানাফিয়াদের নিকট কোম্পানীর উপর আইনানুগ এক ব্যক্তি হিসাবে যাকাত ওয়াজিব নয় বরং শেয়ার হোল্ডারদের উপর যাকাত ওয়াজিব।

(২) শেয়ারের উপর যাকাত কি হিসাবে দেয়া যাবে। এ ব্যাপারে দুটি বিষয় উল্লেখ্য।

প্রথমতঃ শেয়ারের মূল্য তিন প্রকার।

(ক) Face Value অর্থাৎ সার্টিফিকেটে লিখিত মুল্য

(খ) Market Value অর্থাৎ বাজারী মূল্য যে মূল্যে বাজারে বিক্রয় হয়।

(গ) Break up Value অর্থাৎ যদি কোম্পানী অবসারন হয়ে যায় তাহলে প্রত্যেক শেয়ারের বিনিময়ে কোম্পানীর আসবাব পত্রের যে অংশ আসে।

এই তিন ধরনের মূল্যের মধ্যে কি হিসাবে যাকাত ওয়াজিব হবে?

যদি কোন কোম্পানীর ব্রেক অব ভেলিউ সহজ মনে হয় তাহলে যাকাতের হিসাবের জন্য সেটাই সবচেয়ে সমীচীন। কিন্তু ব্রেক অব ভেলিউ নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। বিশেষ ভাবে সাধারণ অংশীদারদের জন্য। সেজন্য সমকালীন সমস্ত ওলামা একমত হয়েছেন যে, বাজারী মূল্যই গ্রহণযোগ্য। কেননা লিখিত মূল্য যদিও প্রথমে পুজি বিনিয়োগের সময় বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু পুজি কোম্পানীর আসবাব পত্রে রূপান্তরিত হওয়ার পর লিখিত মুল্য বাস্তবতার কাছাকাছি থাকে না। কেননা আসবাব পত্রের মূল্য কমবেশী হয়। অপর দিকে বাজারী মূল্যে আসবাব পত্র ছাড়া অন্যান্য কর্ম প্রতিক্রিয়াশীল হলেও বাস্তবতার বেশী নিকটবর্তী।

দ্বিতীয়ত ঃ শেয়ার কোম্পানীর সমস্ত আসবাব পত্রের মধ্যে অনুরূপ অংশের মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে। কোম্পানীর কিছু আসবাবের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়। যেমন ঃ নগদ অর্থ, ব্যবসার মাল ইত্যাদি। আর কিছু আসবাবের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। যেমন ঃ বিল্ডিং মেশিনারী ইত্যাদি। শেয়ারের যাকাত আদায়ে এই দুই প্রকারে আসবাব পত্রের পার্থক্য করা হবে কিনা? এ ব্যাপারে মিশরের মারহুম শাইখ আবু যুহরার (রাহঃ) বলেন; শেয়ার নিজেই ব্যবসার পণ্য হয়ে গিয়েছে। এ জন্য তার বাজারী মুল্য হিসাবে যাকাত দিতে হবে। তার পশ্চাতে কি পরিমাণ যাকাতের যোগ্য আসবাব, কি পরিমাণ যাকাতের অযোগ্য আসবাব তা দেখার প্রয়োজন নাই।

অন্যান্য ওলামা বলেন ঃ শেয়ার যেহেতু কোম্পানীর আসবাব পত্রের মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে তাই যাকাত যোগ্য ও অযোগ্য আসবাব পত্রের বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। আমার মতে দুটি মতকেই সমতায় আনা সম্ভব। যদি কেহ কোম্পানীর লভ্যাংশে অংশীদারিত্বের জন্য শেয়ার নেয় তাহলে তাকে ব্যবসার মালে গণ্য করা মুশকিল। কাউরো জন্য যাকাতের যোগ্য ও অযোগ্য আসবাব পৃথক করা সম্ভব হয় তাহলে করবে নতুনা সতর্কতামূলক পূর্ণ বাজারী মূল্যে যাকাত প্রদান করবে। আর যদি কেহ ব্যবসার (Capital Gain) জন্য এবং পরবর্তীতে বিক্রয় করে লাভবান হওয়ার জন্য শেয়ার ক্রয় করে তাহলে ব্যবসার মালে গন্য হবে। কেননা সে কোম্পানীর আসবাব পত্রের এক অনুরূপ অংশ পরবর্তীতে বিক্রয়ের জন্যই ক্রয় করেছে। এজন্য তার সম্পূর্ণ মূল্যের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

(৩) ফেক্বহী নীতিও হলো, কাউরো ঋণ থাকলে তা বিয়োগ করে অবশিষ্ট মালের যাকাত দিতে হয়। কিন্তু চিন্তার বিষয় হলো বর্তমানে অধিকাংশ বড় বড় পুজিপতিরা ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমুহের কাছে এই পরিমাণ ঋণ নিয়ে রেখেছে যদি তাদের এই ঋণ বিয়োগ করা হয় তাহলে তাদের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে নিজেই যাকাতের অধিকারী সাব্যস্ত হবে। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়া হয় যে, মেশিনারীর উপর যাকাত ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হবে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত এজন্যই উপেক্ষিত যে, মেশিনারীকে যাকাতের মালে গন্য করা যাবে না যা সুস্পষ্ট।

এ মাসআলার সঠিক সমাধান হলো, যাকাত থেকে ঋণ বিয়োগ করার মাসআলায় ফুকাহায়ে কিরাম একমত নয়। হানাফীয়া ও হানাবেলাদের নিকট ঋণ বিয়োগ করতে হলেও শাফেয়ীদের নিকট বিয়োগ করতে হবে না। মালেকীদের নিকট নগদ হলে ঋণ বিয়োগ করতে হয় নগদ না হলে বিয়োগ করতে হয় না।

كِتَابُ الْفِقْهِ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ لِلْجَزِيرِيِّ مَبْحَثُ زَكَاةِ الدَّيْنِ -وفقة الاسلام واد لته ٢- ٧٤٧

এ মাসআলার ব্যাপারে আমার মত হলো, দেখতে হবে যে ঋণ নেয়া হয়েছে তা কোথায় খরচ করা হয়েছে। যদি সে ঋণ দ্বারা এমন পণ্য ক্রয় করা হয়েছে যা যাকাতের উপযুক্ত তাহলে এই ঋণ যাকাত থেকে বিয়োগ হবে। আর যদি সে ঋণ দ্বারা এমন পণ্য ক্রয় করা হয় যা যাকাতের উপযুক্ত নয় তাহলে সে ঋণ বিয়োগ হবে না। সে ঋণের ব্যাপারে ঈমাম মালিক ও শাফেয়ী (রাঃ) দ্বয়ের কথায় আমল করা যাবে এই মত ব্যক্ত করার পর হাফেজ মারদ্বীনী (রাহঃ) এর কিতাব الجوهر النقى তে দেখেছি, ঈমাম মালেক (রাহঃ) এর কথা এর কাছাকাছি। তিনি বলেন ঃ

إِنْ كَانَ عِنْدَهُ عُرُوْضٌ تَفِيْ بِدَيْنِهِ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْعَيْنِ (الجوهر النقى حاشية بيهقى صـ ١٤٩ ج ٤ باب الدين مع الصدقه)

তৃতীয় অধ্যায় ঃ মুদ্রা (Money)

মুদ্রার সংজ্ঞা ঃ

যা বিনিময়ের মাধ্যমে হিসাবে ব্যবহার হয়, মূল্যের পরিমাপক হয় ও যার মাধ্যমে পুঁজি সংরক্ষণ করা যায় তাকে মুদ্রা বলে।

এ তিনটি গুণ যার মধ্যে পাওয়া যায় অর্থনীতির পরিভাষায় তাকে আরবীতে نقد ইংরেজিতে Money, বাংলায় অর্থ বা মুদ্রা বলা হয়। পুঁজি সংরক্ষণের অর্থ হলো যেমন– কাউরো কাছে এমন পণ্য আছে যার মূল্য কম বেশী হতে পারে। সর্বদা এর ক্রেতা বিদ্যমান থাকা ও জরুরী নয়। এজন্য এর পুঁজি পরিপূর্ণ সংরক্ষিত হয় না। কিন্তু মুদ্রা রাখলে সাধারণত তার পুঁজি সংরক্ষিত থাকে। কারণ অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি না হলে মুদ্রার প্রকৃত মূল্য একই থাকে। তাছাড়া এর দ্বারা যে কোন দ্রব্য চাহিদা মত ক্রয় করা যায়।

মুদ্রা ও কারেন্সির মধ্যে পার্থক্য ঃ

মুদ্রা হলো বিনিময়ের মাধ্যমে মূল্যের পরিমাপক এবং সঞ্চয়ের বাহক। কিন্তু ইহাকে আইনগতভাবে বিনিময়ের মাধ্যম সাব্যস্ত করা জরুরী নয়। যেমন চেক বা প্রাইজ বন্ড ইত্যাদির মত প্রমাণ পত্রের মাধ্যমেও মানুষেরা বিনিময় করে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি প্রাইজ বন্ড দ্বারা পাওনা আদায় করতে চায় তাহলে পাওনা নিতে না চাইলে আইনগতভাবে বাধ্য করা যাবে না। কারেন্সী এমন মুদ্রা যাকে কোন দেশে আইন গত ভাবে বিনিময়ের মাধ্যম সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন টাকা। যদি কোন ব্যক্তি টাকা দিতে চায় তাহলে তা গ্রহণ করতে আইনগত ভাবে বাধ্য করা যাবে। এমন আইনগত কারেন্সীকে আরবীতে عملة قانونية ইংরেজিতে Legal Tender ও বাংলায় বিহিত মুদ্রা বলে।

বিহিত মুদ্রা দুই প্রকার ঃ

এক. এমন কারেন্সী যা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আইনগত ভাবে পরিশোধ যোগ্য। যেমন– ১ পয়সা, ৫ পয়সা, ১০ পয়সা। আমাদের দেশে এ সব মুদ্রা দ্বারা ১০ টাকার বেশী কাউকে গ্রহণ করতে আইনগত ভাবে বাধ্য করা যায় না। একে আরবীতে عملة قانونية محدودة ইংরেজিতে Limited Legal Tender ও বাংলায় সসীম বিহিত অর্থ বলে।

দুই. যা আইনগত সীমাবদ্ধ নয়। একে আরবীতে عملة قانونية غير محدودة ইংরেজিতে Unlimited Legal Tender ও বাংলায় অসীম বিহিত মুদ্রা বলে। যেমন– এক টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা ইত্যাদি।

মুদ্রার ক্রমবিকাশ ও বিভিন্ন মুদ্রানীতি

প্রাথমিক যুগে মানুষের মধ্যে পণ্যের পরিবর্তে পণ্য বিক্রয়ের পদ্ধতি চালু ছিল। যাকে مقابضة (Beter) বলে। কিন্তু এ পদ্ধতির অনেক ক্ষতি কর দিক ছিল। যেমন– এ পণ্যের আনা নেয়া কষ্টকর ছিল। এ পদ্ধতিতে চাহিদা ও যোগান এক সাথে পাওয়া মুশকিল হত। যেমন– এক ব্যক্তি গম দিয়ে কাপড় ক্রয় করতে ইচ্ছক। কিন্তু কাপড় মালিকের হয়তো গম প্রয়োজন নাই। পণ্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে ভাগ করে তাকে কারবারের ভিত্তি বানানো কষ্টসাধ্য ছিল। مقابضة বা (Beter) এর পরে কিছু গুরুত্ব পূর্ণ পণ্যকে মূল্যমান ধায্য করা হয়েছিল। যেমন– গম, যব, চামড়া ইত্যাদি। এরপর বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণে স্বর্ণকে মুল্যমান ধায্য করা হয়েছে। এর আনা নেয়াও সহজ। প্রাথমিক যুগে স্বর্ণের মাধ্যমে মুদ্রা তৈরী ছাড়াই ওজনের ভিত্তিতে বিনিময় করা হতো। এরপর মুদ্রা তৈরী শুরু হলো। প্রথমে সবাই মুদ্রা তৈরী করতে পারতো, এ যুগের নীতিকে আরবীতে قاعدة الذهب ইংরেজিতে Gold Standard, বাংলায় স্বর্ণমান বলে। এরপর স্বর্ণ ছাড়া রৌপের মুদ্রা তৈরী শুরু হলো। স্বর্ণ ও রোপ্যের মুদ্রা তৈরীর নীতিকে দ্বী ধাতুমান (Bi Metallic Standard) ও আরবীতে نظام المعدنين বলে।

মানুষেরা স্বর্ণ, রৌপ্যের মুদ্রা স্বর্ণকারদের নিকট আমানত রাখতো। স্বর্ণকারগণ প্রমাণের জন্য রসিদ লিখে দিত। প্রয়োজনে রসিদ দিয়ে স্বর্ণকারদের থেকে নিজের স্বর্ণ ফেরৎ নিত। পরবর্তীতে মানুষেরা স্বর্ণকারদের প্রদত্ত্ব রসিদ দ্বারাই সামগ্রী ক্রয় আরম্ভ করে। অর্থাৎ ক্রেতা স্বর্ণকারদের কাছ থেকে স্বর্ণ নিয়ে বিক্রেতাকে প্রদান করা ও বিক্রেতা স্বর্ণ গ্রহণ করে স্বর্ণকারদের কাছে রাখার পরিবর্তে ক্রেতা বিক্রেতাকে স্বর্ণের রশিদ দিয়ে দিত। যার অর্থ দাঁড়ায় এই রসিদের স্বর্ণ বিক্রেতার দিকে পরিবর্তন হয়ে যায়। এভাবে রসিদের মাধ্যমে লেনদেন চলতে লাগলো এবং স্বর্ণকারদের থেকে স্বর্ণ ফিরিয়ে নেয়ার প্রয়োজন কমে গেল। যখন স্বর্ণকারগণ দেখলো যে, মানুষেরা সাধারণত স্বর্ণ ফিরিয়ে নিতে আসে না। তখন তারা মানুষের গচ্ছিত স্বর্ণ অন্যদেরকে ঋণ দিতে শুরু করলো। এভাবেই নোট ও ব্যাংকিং নীতির প্রচলন হলো। অর্থাৎ স্বর্ণকারদের জারীকৃত রসিদ নোটে পরিণত হলো। (যার বিস্তারিত বিবরণ ব্যাংকিং অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।) প্রথম দিকে প্রত্যেক ব্যক্তিই নোট চালু করতে পারতো। কিন্তু তখন ইহা বিহিত মুদ্রা ছিল না। শুধু মানুষের লেনদেনের কারণে গ্রহণযোগ্য ছিল। এই গ্রহণযোগ্যতা ও সহজলভ্য হওয়ার কারণে নোটকে বিহিত

অর্থ ও সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু বিহিত মুদ্রার নোট প্রত্যেকের চালু করার অনুমতি ছিল না। রাষ্ট্রের অনুমদিত (Authorised) প্রতিষ্ঠানই (ব্যাংক) চালু করতে পারতো। প্রাথমিক যুগে প্রত্যেক বাণিজ্যিক ব্যাংকই নোট চালু করতে পারতো। পরবর্তীতে এ অধিকার শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংক পর্যন্তই সীমিত করে দেয়া হয়েছে। নোটের বিহিত মুদ্রায় (Legel Tender) রূপান্তরিত হওয়ার পরে এর উপর কয়েক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। এক যুগ এমন ছিল যখন নোটের পিছনে শতকরা ১০০ ভাগ স্বর্ণ ছিল।

স্বর্ণের মওজুদ পরিমান নোট চালু করা আইনগত জরুরী ছিল। এ নীতিকে আরবীতে قاعدة سبائك الذهب ইংরেজিতে (Gold Bullion Standard) ও বাংলায় স্বর্ণ পিন্ডমান বলে। যখন দেখা গেল মানুষ খুব কম স্বর্ণ নিতে আসে তখন নোটের পিছনে স্বর্ণের হার হ্রাস পাওয়া আরম্ভ হলো। এমন নোট যার পিছনে শতকরা ১০০% স্বর্ণ থাকে না তাকে نقود الثقة (Fiduciary Money) বলে। অতঃপর স্বর্ণের হার হ্রাস পেতে পেতে শূন্যে পৌছল এবং বিশেষ করে দেশীয় লেনদেনে নোটের পিছনে স্বর্ণের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা থাকল না। এমন নোটকে النقود الرمزية (Token Money) বলে। এই মুদ্রার আইনগত মূল্য প্রকৃত মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে না। যেমন ১০০ টাকার নোটের আইনগত মূল্য ১০০ টাকা। কিন্তু কাল পর্যন্ত Token Money টোকেন মানীর বিশ্বস্ততা এমন ছিল যে, অধিকাংশ রাষ্ট্র নিজ নিজ নোটকে ডলারের সাথে সম্পৃক্ত করে রেখে ছিল। মনে হয় যেন তাদের নোটের পিছনে ডলার আছে। আমেরিকা ডলারের পরিবর্তে স্বর্ণ প্রদানের কথা স্বীকার করায় ডলারের পিছনে স্বর্ণ ছিল। তাই অন্য দেশের নোটও পরোক্ষভাবে স্বর্ণের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে আমেরিকাও স্বর্ণের সাথে ডলারের সম্পৃক্ততা নিঃশেষ করে দিয়েছে। যার বিবরণ সামনে আসছে। বর্তমানে কোন নোটের পিছনেই স্বর্ণ বা রৌপ্য নাই। এখন নোট শুধু একটি পারিভাষিক মূল্য যা শুধু ক্রয় ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে।

বিনিময়ের হার নির্ধারণ ঃ

বিভিন্ন দেশের কারেন্সীর পারস্পরিক বিনিময়ের হার কিভাবে নির্ধারিত হয়? এর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদ্ধতি চালু হয়ে আসছে। ১৮৮০ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত পৃথিবীতে স্বর্ণমান পদ্ধতি চালু ছিল।

এর পূর্বে স্বর্ণমান পদ্ধতি চালু থাকলেও উল্লেখিত সময়ের মত পরিপূর্ণ ছিল না। স্বর্ণমান পদ্ধতিতে প্রত্যেক দেশের কারেন্সী স্বর্ণের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন- ইংল্যান্ড পাউন্ডের পিছনে স্বর্ণের একটা পরিমাণ

নির্ধারণ করে রেখেছে। আমেরিকাও তেমনি ডলারের পিছনে স্বর্ণের একটা পরিমাণ নির্ধারণ করে রেখেছে। যখন এই স্বর্ণমান পদ্ধতি চালু ছিল তখন দুদেশের কারেন্সীর মধ্যে বিনিময়ের হার ঐ কারেন্সীর পিছনে মজুদ স্বর্ণের পরিমাণ অনুযায়ী হতো। অর্থাৎ প্রত্যেক দেশের কারেন্সীর পিছনে স্বর্ণের পরিমাণ দেখা হতো। দু দেশের কারেন্সীর পরিবর্তে প্রাপ্ত স্বর্ণের পরিমাণ হিসাবেই কারেন্সীর বিনিময় হতো। যেমন যদি ইংল্যান্ডের পাউন্ডের পিছনে চার তোলা স্বর্ণ থাকে আর আমেরকির ডলারের পিছনে দুই তোলা স্বর্ণ থাকে তাহলে পাউন্ড ও ডলারের মধ্যে এক ও দুইয়ের সর্ম্পক হবে। এক পাউন্ড দুই ডলারের দ্বারা বিনিময় হবে।

পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে স্বর্ণমান পদ্ধতি শেষ হয়ে যায়। এরপর বিনিময়ের হার নির্ধারণের যে পদ্ধতি চালু হয়েছে তা বোঝার জন্য আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য নীতিতে যে পরিবর্তন এসেছে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন মনে করি। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর পৃথিবীর অর্থব্যাবস্থা ধ্বংস হয়ে পড়ে। ১৯৩০ সালে বিশ্ব ব্যাপী পড়তি বাজার সৃষ্টি হয় এবং সমস্ত দেশ নোটের উপর স্বর্ণ প্রদান বন্ধ করে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংল্যান্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ সমূহ অর্থনৈতিক ভাবে ভেঙ্গে পড়ে। তবে আমেরিকা অর্থনৈতিক ভাবে বেশ দৃঢ় ছিল। তাদের কাছে স্বর্ণের যথেষ্ট মজুদ ছিল। ১৯৪৪ সালে আমেরিকার সহায়তায় ইউরোপকে নতুন ভাবে গঠন করার জন্য বিভিন্ন দেশ নিয়ে একটি বৃহৎ কনফারেন্সের আয়োজন করা হয় এবং যা আমেরিকার Bretton Woods শহরে অনুষ্ঠিত হয়। যার বিষয় বস্তু ছিল বিশ্ব বাণিজ্যকে কিভাবে উন্নত করা যায়? পুজি বিনিয়োগকে কিভাবে সম্প্রসারণ করা যায়? আন্তজার্তিক মুদ্রা বিনিয়োগ নীতি কিভাবে নির্ধারণ করা যায়? এ কনফারেন্সে তিনটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার প্রস্তাব গৃহিত হয় এবং একটি নীতি নির্ধারণ করা হয়। প্রথমে সে তিনটি প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করা হচ্ছে অতঃপর সে নীতির ব্যাপারে আলোচনা করা হবে।

ব্রিটেন উডসের তিনটি প্রতিষ্ঠান

প্রথম ঃ International Trade Organization যাকে আরবীতে منظمة التجار الدولة। অর্থাৎ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বলে।

এর পেক্ষাপট হলো ষোল শতাব্দী থেকে আঠারো শতাব্দী পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য মতবাদ অর্থাৎ প্রত্যেক দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নিজ নিজ স্বর্ণ বৃদ্ধি করবে এবং এর জন্য রপ্তানী বৃদ্ধি, উন্নতি করবে ও আমদানীতে বাধা সৃষ্টি করবে। এ মতবাদকে Mercantilism এবং আরবীতে مذهب التجارين বলে। পরবর্তীতে এ

মতবাদ রহিত হয়ে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে আরেকটি মতবাদ তা হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিশ্ব বাণিজ্য কে বিস্তার করা এবং আমদানির উপর এমন বাধ্যবাধকতা আরোপ না করা যাতে বিশ্ব বাণিজ্য বাধা প্রাপ্ত হয়। এ মতবাদ কে সামনে রেখে কনফারেন্সে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। যার উদ্দেশ্য ছিল যে, বিশ্ব বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা দূরকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কিন্তু আমেরিকা এই সংস্থা স্থাপনের বিরোধিতা করে।

কারণ, আমেরিকা একটি কৃষি নির্ভর দেশ। বিশ্ব বাণিজ্য বিস্তার লাভ করলে ইউরোপের পণ্য স্বল্প মূল্যে আমেরিকায় আসবে এবং কৃষক কৃষিকাজ ছেড়ে ব্যবসায় দিকে ঝুকে পড়বে। এ ফলে আমেরিকার কৃষি বিষয়ক পলিসি ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা আছে। এক যুগ পর্যন্ত এই সংস্থা স্থাপন করা না করা নিয়েই আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের মধ্যে দুঃসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এমনকি ১৯৪৮ পরস্পরের মাঝে সন্ধি হলে "General Agreement on Tariff and Trade সংক্ষেপে Gatt নামে আরেকটি সংস্থা অস্তিত্ব লাভ করে। আরবীতে এই সংস্থাকে اَلْاِتِّفَاقِيَّةُ الْعَامَّةُ لِلتَّصَرُّفَاتِ الْجَمْرِكِيَّةِ وَالتِّجَارَةِ বলে। বাংলা অর্থ দাঁড়ায় শুল্ক ও ব্যবসার সাধারণ চুক্তি। এ চুক্তি থেকে উৎপাদিত শস্যকে বাদ দেয়া হয়েছে। ফসল ছাড়া অন্যান্য শিল্প সামগ্রীতে বিশ্ব বাণিজ্য বিস্তারের জন্য নিম্নবর্ণিত নীতি সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে।

১. কোন দেশ বিশ্ব বাণিজ্যে কোন বাধ্য বাধকতা বা বাধা সৃষ্টি করলে অন্যান্য দেশ ঐ সমস্ত বাধা দূর করণে Gatt -এ অভিযোগ করতে পারবে। GATT এর সদস্য ভূক্ত দেশ GATT এর সিদ্ধান্ত পালন করতে বাধ্য থাকবে। বাণিজ্যে দুভাবে বাধা আসে

এক ঃ শুল্ক ভিত্তিক বাধা। যেমন ঃ কোন দেশ কোন দেশের উৎপাদিত পণ্যের উপর বেশী শুল্ক আরোপ করলে। যার ফলে সে দেশের পণ্য এ দেশে বেশী দামী হওয়ায় তার ক্রয় বিক্রয় কমে যায়।

দুই ঃ শুল্ক বিহীন বাধা। অর্থাৎ শুল্ক ছাড়া অন্য কোন এমন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যার কারণে অন্যান্য দেশের উৎপাদিত পণ্য নিতে মানুষেরা সংকির্ণতা অনুভব করে। যেমন ফান্স জাপানের তৈরি V.C.R এর উপর এ আদেশ দিয়ে রেখেছে যে, তা শুধু নির্ধারিত একটি পোর্ট দিয়েই আসতে পারবে। ২. সকল দেশ সকল দেশের সাথে সমান আচরণ করবে, যদি কোন দেশ এক দেশের সাথে একরকম অন্য দেশের সাথে অন্য ব্যবহার করে। তাহলে সে দেশ GATT এ অভিযোগ করতে পারবে।

৩. কোন দেশের উপর পৃথক শুল্ক আরোপ করা যাবে না। যদি কোন দেশের উপর পৃথক ভাবে শুল্ক আরোপ করা হয় তাহলে সে দেশ GATT এ অভিযোগ করতে পারবে।

৪. গরীব দেশ গুলিকে বৈদেশিক পন্যের উপর বেশী শুল্ক আরোপ করার অনুমতি প্রদান করা হবে। কারণ গরীব দেশ গুলি বৈদেশিক পণ্যের উপর শুল্ক কম করলে বৈদেশিক পণ্য স্বল্প মূল্যে পাওয়া যাবে। যার ফলে দেশীয় পণ্যের চাহিদা কমে যাবে এবং দেশীয় শিল্প ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।

৫. দু দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক দ্বন্দ দেখা দিলে GATT এর মাধ্যমে পরস্পরের মীমাংসা হবে।

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল। যাকে আরবীতে صدوق النقد الدولى ইংরেজিতে International Monetary Fund সংক্ষেপে I.M.F বলে। ১৯৪৪ সালে I.M.F স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ে ১৯৪৮ সালে স্থাপিত হয়। যেমন প্রত্যেক দেশের কয়েকটি ব্যাংকের একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে তেমনি কয়েকটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই প্রতিষ্ঠান। যেন এটি পুরো পৃথিবীর কেন্দ্রীয় ব্যাংক। যা নির্ধারিত সময়ে আদায়যোগ্য স্বল্প মেয়াদী ঋণ প্রদান করে। অনেক সময় কোন দেশ অর্থনৈতিক ভাবে দৃঢ় হওয়ার পরও সাময়ীক ভাবে কোন ব্যবসায় পরিশোধ করার মত নগদ অর্থের যোগান দিতে পারে না। এমন পরিস্থিতিতে এই প্রতিষ্ঠান ঋণ প্রদান করে।

এই প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক দেশের একটি কোটা (Quota) থাকে। এই কোটা বিশ্ব বাণিজ্যের সাথে সে দেশীর বাণিজ্যের মিল রেখে নির্ধারণ করা হয়। যেমন বিশ্ব বানিজ্য এক মিলিয়ন ডলার এবং কোন দেশের বাণিজ্য পাঁচ কোটি ডলার। তাহলে সে দেশ শতকরা ৫% ভাগ কোটা পাবে।

এই কোটার হার কম বেশীও হতে পারে। কোটার সংখ্যা ডলার দ্বারা বর্ণনা করা হয়। প্রত্যেক দেশ নিজ কোটার শতকরা ২৫% স্বর্ণের ও ৭৫ ভাগ নিজ স্বদেশীয় কারেন্সী প্রতিষ্ঠানের নিকট জমা করে। এভাবে I.M.F এর নিকট বেশ কিছু স্বর্ণ এবংসমস্ত দেশের কারেন্সী জমা হয়ে যায়। প্রত্যেক দেশ I.M.F এ ফান্ড জমা করার ভিত্তিতেই ঋণ নেয়ার অধিকার লাভ করে। যাকে Drawing Rights এবং আরবীতে حقوق السحب বলা হয়। জমাকৃত অর্থের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট হারের ঋণের অধিকারে লাভ করে। যেমন– প্রত্যেক দেশ জমা কৃত অর্থের পাঁচগুণ ঋণ নিতে পারে। তবে এ পরিমাণের হার পরিবর্তনও হতে পারে।

Orawing Rights এর উপর যে ঋণ পাওয়া যায় একে কয়েক অংশে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক অংশকে Tranche বলে। প্রথম Tranche ঋণের শতকরা ২৫% ভাগ হয়। যা প্রত্যেক দেশই নিতে পারে। এই Tranche এর উপর ঋণ কোন শর্ত ছাড়াই পাওয়া যায় এবং সুদও কম। এ Tranche কে Gold Tranche বলে। এর পরবর্তী Tranche সমূহে ঋণ নিতে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। I.M.F ঋণ দেয়ার জন্য অনেক শর্তাবলী আরোপ করে। সুদের হার বেশী হয়। ঋণ ও স্বল্প মেয়াদী হয়। এই Tranche সমূহকে Conditionality Tranches বলে। এই প্রতিষ্ঠানের পলিসি সদস্যগণ দেশ সমূহের ভোটে নির্ধারিত হয়। ভোটের অধিকার দেশ সমূহের কোটার ভিত্তিতে হয়ে থাকে I.M.F এ Special Drawing Rights সংক্ষেপে S.D.R নামে অন্য একটি একাউন্ট থাকে যাকে আরবীতে حقوق السحب الخاصة বলে। যার সার কথা হলো সদস্যগণ নির্ধারণ করে যে, এই বৎসর অনুমোদিত ঋণ ছাড়া কি পরিমাণ অতিরিক্ত ঋণ প্রদান করা যেতে পারে? অতিরিক্ত ঋণ দেশ সমূহের উপর বণ্টনও কোটার হার অনুযায়ী হয়।

বিশ্ব ব্যাংক ঃ

তৃতীয় ঃ International Bank For Reconstruction and Development সংক্ষেপে I.B.R.D। যাকে আরবীতে اَلْبَنْكُ الدُّوَلِيُّ لِلْإِنْشَاءِ وَالتَّعْمِيْرِ বলে। অবশ্য সংক্ষেপে এ প্রতিষ্ঠান World Bank (বিশ্ব ব্যাংক) নামেই পরিচিত। World Bank ও I.M.F এর মধ্যে পার্থক্য হলো– I.M.F স্বল্প মেয়াদে ঋণ প্রদান করে যার মেয়াদ তিন থেকে পাঁচ বৎসর মেয়াদী হয় আর বিশ্বব্যাংক দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদান করে যার মেয়াদ পনর থেকে ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত হয়। প্রথমে এই প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন মূলক কাজে ঋণ প্রদান করতো যেমন– বিশ্বরোড তৈরী ইত্যাদি। কিন্তু ১৯৬০ সালের পরে থেকে সাধারণ ঋণ প্রদান শুরু করে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান পলিসি ভিত্তিক ঋণ প্রদান করে অর্থাৎ বলে দেয়, যদি দেশের পলিসি এমন গ্রহণ কর তাহলে এই পরিমাণ ঋণ পাবে।

ব্রিটেন উডসের বিনিময় হার নীতি ঃ

ব্রিটেন উডস কনফারেন্সে যে তিনটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়েছিল তার পরিচিত বর্ণনা করা হলো, উক্ত কনফারেন্সে কারেন্সী বিনিময়ের যে পদ্ধতি গৃহিত হয়েছিল তা Bretton woods System of Exchange Rate নামে পরিচিত। ১৯৩২ সালে স্বর্ণ মান পদ্ধতির পতন হলেও কারেন্সীর পরিমাণের পরিমাপ মৌলিক ভাবে স্বর্ণই ছিল। কিন্তু প্রত্যেক দেশের কারেন্সীর উপর স্বর্ণ পাওয়া যেত না। বর্তমানে বিশ্ব বাণিজ্যে বিনিময়ের মাধ্যম ডলারকে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আমেরিকার ডলারকে স্বর্ণের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছে। কেননা আমেরিকার (অর্থনৈতিক) অবস্থা দৃঢ় থাকায় তারা ডলারের উপ স্বর্ণ দিতে প্রস্তুত ছিল। প্রাথমিক কালে এক আউন্স স্বর্ণের পরিবর্তে ৩৫ ডলার হতো। পরবর্তীতে আমেরিকা ডলারের মূল্য বৃদ্ধি করায় ৪২ ডলারে এক আউন্স স্বর্ণ পাওয়া যেত। প্রত্যেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকই কেবল আমেরিকাকে ডলার দিয়ে স্বর্ণ নিতে পারতোএবং আমেরিকাও দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু কার্যত সাধারণত কোন দেশ স্বর্ণ নিত না। ডলার দ্বারাই লেনদেন চলতো। এভাবে ডলার স্বর্ণের সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং সমস্ত দেশ সমূহের কারেন্সীকে ডলারের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছিল। I.M.F এ চুক্তি হয়েছিল যে, প্রত্যেক দেশ নিজ কারেন্সীর হার একই সাথে ডলার এবং স্বর্ণ উভয় দ্বারাই বর্ণনা করবে। যেমন ঃ এই পরিমাণ টাকায় এই পরিমাণ ডলার এবংএই পরিমাণ স্বর্ণ হবে। কিন্তু কার্যত ঃ কারেন্সীর হার শুধু ডলার দ্বারাই বর্ণনা করা হয়েছে।

এভাবে সমস্ত কারেন্সী ডলারের সাথে এবং সমস্ত ডলার স্বর্ণের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। I.M.F এ এসিদ্ধান্ত ও গৃহিত হয়েছে যে দেশের কারেন্সীর মূল্য ডলার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। যদি দেশের কারেন্সীর মূল্য উঠানামা করে এবং সে উঠানামা শতকরা দুই ভাগ পর্যন্ত হলে ভাল অর্থাৎ কারেন্সীর নির্ধারিত রেট থেকে শতকরা দুইভাগ কম বেশি হয় তাহলে কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু কারেন্সীর মূল্য শতকরা দুই ভাগের থেকে বেশী বেড়ে যায় বা কমে যায় তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূল্যের উপর প্রভাবিত হয়ে কারেন্সীকে নির্ধারিত মূল্যে নিবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রভাবিত হওয়ার অর্থ হলো কারেন্সীর মূল্য বাজারে নির্ধারিত দর থেকে কম হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বেশী মূল্যে কারেন্সী ক্রয় শুরু করবে। তাহলে দাম বৃদ্ধি হওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। পক্ষান্তরে কারেন্সীর মূল্য বাজারে নির্ধারিত দর থেকে বেশী হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বল্প মূল্যে ক্রয় শুরু করবে যার ফলে মূল্য হ্রাস পাওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। এ ভাবেও মূল্য নিয়ন্ত্রণ না হলে I.M.F এর সহায়তা নিতে হবে। I.M.F রেট নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অতিরিক্ত ডলার প্রদান করবে অথবা সে দেশের কারেন্সীর রেট পরিবর্তন করে দেবে।

উপরের বিস্তারিত বিবরণ দ্বারা বুঝা গেল যে, ব্রিটেন উড্স এর নীতিতে বিনিময় হার নির্ধারিত (Fixed)। এজন্য এ নীতিকে ইংরেজীতে Fixed Exchange Rate System এবং আরবীতে نِظَامُ سِعْرِ الصَّرْفِ الثَّابِتِ বলে। ইতি পূর্বে বিনিময় হারের যে স্বর্ণমান পদ্ধতি চালু ছিল এর গুরুত্ব পূর্ণ বৈশিষ্ট্য, কারেন্সীর পিছনে স্বর্ণের পরিমাণ নির্ধারিত ছিল। এর দর একই (Fixed) থাকতো। যার

ফলে প্রত্যেক ব্যবসায়ী কারেন্সীর দরে উঠানামার আশংকা ছাড়া পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে ব্যবসা করতো ব্রিটেন। উড্সের নীতিতেও স্বর্ণমানের এই বৈশিষ্ট্যকে ঠিক রোখার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সাথে স্বর্ণমান পদ্ধতিতে একটি ত্রুটি ছিল তা থেকে বাঁচার পথ বের করা হয়েছে। ত্রুটিটি হলো স্বর্ণ মান পদ্ধতিতে বিনিময় হার পরিবর্তনে রাষ্ট্রের কোন অধিকার ছিল না, ব্রিটেন উড্স পদ্ধতিতে বিনিময় হার পরিবর্তনের সুযোগ রাখা হয়েছে।

বৃটেন উস্ড পদ্ধতির পতন

উল্লেখিত নীতির ভিত্তি ছিল যে কোন ঋণী দেশ নিজের কারেন্সীর উপর স্বর্ণ প্রদানে প্রস্তুত থাকবে সুতরাং সে সময় আমেরিকা এর জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু কার্যত কেউ আমেরিকার কাছে স্বর্ণের দাবী করতো না। তবে ফ্রান্স আমেরিকার কাছে ডলারের বিনিময়ে স্বর্ণের দাবী শুরু করে। যার ফলে উভয় দেশের অবস্থাদীও যুৎসই থাকেনি। আমেরিকার কাছে স্বর্ণ হ্রাস পেতে থাকে। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে আমেরিকা স্বর্ণ প্রদানে অস্বীকার করে বসে এবং ব্রিটেন উড্স নীতির পতন ঘটে Fixed Exchange Rate System শেষ হয়ে যায়। বর্তমানে বিনিময়ের হার নির্ধারণের জন্য দুটি ধারণা সামনে এসেছে।

(১) অন্যান্য দ্রব্যের যেমন কোন দর নির্ধারণ করা হয় না বরং মুক্ত বাজার নিজেই চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে দর নির্ধারণ করে। ঠিক তেমনি কারেন্সীর দরও মুক্ত বাজারের উপর ছেড়ে দেয়া হবে। চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতেই দর নির্ধারিত হবে। যেমন ডলার এবং টাকার চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে টাকার ডলারের সাথে দর নির্ধারিত হবে। বিশ্ব বাণিজ্য বাজারে চাহিদা ও যোগানের দ্বারা অন্যান্য কারেন্সীর সাথে টাকার রেট নির্ধারিত হবে। এ মতবাদকে Freely Floating Exchange Rates ও আরবীতে إِسْعَارُ الصَّرْفِ الْعَائِمَةِ الْحُرَّةِ বলে।

(২) মৌলিকভাবে দর মুক্তই থাকা উচিত। তবে এর প্রতি রাষ্ট্রের দৃষ্টি থাকবে। যদি কখনো দর মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যায় বা কমে যায় তাহলে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারে এসে দরে প্রভাব সৃষ্টি করবে। এ মতবাদ কে Managed Float ও আরবীতে إِسْعَارُ الصَّرْفِ الْعَائِمَةِ الْمُدَارَةِ বলে।

কাগজী নোটের অবস্থান ও তার ফিকহী আহকাম

কাগজী নোটের উপর কয়েক যুগ অতিবাহিত হয়েছে, প্রথমে এর পিছনে পরিপূর্ন হারে স্বর্ণ ছিল, যাকে Gold Bullion Standard বলে। এর পর Fiduciary Money এর যুগ। তখন মুদ্রার পিছনে পরিপুর্ণ হারে স্বর্ণ ছিল না ঠিকই তবে

বিশেষ সমীচীন হারে ছিল, এরপরবর্তী যুগে সমস্ত কারেন্সী ডলারের সাথে সপৃক্ত ছিল এবং ডলার স্বর্ণের সাথে সম্পৃক্ত ছিল । ১৯৭১সালের পর আমেরিকা স্বর্ণ প্রদানে অস্বীকার করার পর এখন নোটের পেছনে কোন কিছুই থাকে না। নোটে লিখিত কথা "চাহিবা মাত্র ইহার বাহককে এত টাকা দিতে বাধ্য থাকিবে" অর্থহীন হয়ে গিয়েছে এখন উহা শুধু বিনিময়ের মাধ্যম হওয়ার একটি পরিভাষা মাত্র । বর্তমান পরিস্থিতিতে কাগজী নোটের অবস্থান কি? এর দুটি ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো।

১। অধিকাংশ অর্থনীতিবিদের মতে স্বর্ণ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে পরিচিত লাভ করায় নোটের পেছনে স্বর্ন রাখা হত ও সর্বত্র এর ভিত্তিতে ব্যবসা বাণিজ্য হত। যদি কাগজী নোটের দ্বারা এ উদ্দেশ্য স্বর্ণের সম্পৃক্ততা ছাড়াই অর্জিত হয় এবং যদি তা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে পরিচিতি লাভ করে তাহলে স্বর্ণকে মাধ্যম হিসাবে ধরার কোন প্রয়োজন নাই । এই মত অনুযায়ী নোট একটি বিশেষ ক্রয় শক্তির নাম। অর্থাৎ নোটের দ্বারা এই পরিমাণ মূল্যের পন্য ক্রয় করা যেতে পারে। তাই নোটের সাথে অনির্দিষ্ট বিভিন্ন পন্য জড়িত থাকে। যাকে ইংরেজিতে Basket of Goods আরবীতে سلة البضائع পন্যের ঝুড়ি বলে।

২। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা যা ফেক্বার বেশী নিকটবর্তী, নোটকে পারিভাষিক অর্থ ও প্রচলিত মূল্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যদিও কাগজের মৌলিক কোন মূল্য নাই কিন্তু পরিভাষায় তাকে একটি নির্দিষ্ট সম্পদের বিনিময়ের মাধ্যম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

নোটের ফেক্বহী অবস্থান

নোটের ফিক্বহী অবস্থান নিয়ে আলেমদের কয়েকটি অভিমত আছে। কিছুকাল পূর্বে হিন্দুস্থানের আলেমদের অধিকাংশের মত ছিল নোট নিজে মাল নয় বরং ঋণের রশিদ। কাউকে নোট দেয়া মানে ঋণ অর্পন করা। এর থেকে কয়েকটি মাসআলা বের হয়। যেমনঃ নোট প্রদানে যাকাত আদায় হয় না যতক্ষণ না যাকাত গ্রহণ কারী তার দ্বারা কোন কিছু ক্রয় করে। নোটের দ্বারা স্বর্ণ ও রৌপ্য ক্রয় করা বৈধ নয়। কেননা নোট স্বর্ণের প্রতিনিধিত্ব করে তাই ইহা বাইয়ে ছরফ অর্থাৎ স্বর্ণ দ্বারা স্বর্ণ বিক্রয়। যে নোট নিয়েছে সে এখন পর্যন্ত স্বর্ণ হাতে পায় নাই অতএব বিক্রয় স্থলে হাতে হাতে গ্রহণ করা হলো না যা বাইয়ে সরফের আবশ্যকীয় শর্ত। এমতানুযায়ী দুই নোটের পারস্পারিক লেনদেনও বৈধ হবে না। কেননা ইহা ঋণ দ্বারা ঋণ বিক্রয় যা অবৈধ।

এ অভিমত এক সময় ঠিক থাকলেও বর্তমানে রহিত হয়েছে। কারণ বর্তমানে নোটের পিছনে স্বর্ণ হয় না। শুধু এগুলোকেই মূল্য সাবস্ত করা হয়েছে। তাই একে রশিদ বলা ঠিক নয়।

দুই ঃ এক টাকার নোট নিজেই সম্পদ। বাকী নোটগুলো তার রশিদ। এই অভিমত একটি মতবাদ হিসাবে ঠিক হতে পারে কেননা এক টাকার নোট ও অন্যান্য নোটের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। এক টাকার নোট সরকার চালু করে অবশিষ্ট নোটগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক চালু করে। অন্যান্য নোটের উপর লেখা থাকে "চাহিদা মাত্র ইহার বাহককে এত টাকা দিতে বাধ্য থাকিবে"। এক টাকার উপর লিখা থাকে না। সরকারের টাকার প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট প্রকাশ করে ঋণ প্রদান করে। এ পার্থক্যের মর্ম এটাই যে, এক টাকার নোট নিজেই মাল, বাকী নোটগুলো এর রশিদ মাত্র। কিন্তু কার্যত এমন হয় না। কেননা বড় নোটগুলো এক টাকার নোটের পরিমাণ হিসেবে ছাপা হয় না। বড় নোট গুলোর এক টাকার নোটের সাথে কোন সম্পর্কই থাকে না। তাছাড়া কোন জিনিসকে প্রচলিত মুদ্রা সাব্যস্ত করার জন্য এমন কোন শর্ত নাই যে তা অমুক জিনিস হতে হবে, তাই যদি কোন রশিদকেই মুদ্রা ধরা হয় তাহলে তার উপরই প্রচলিত মুদ্রার আহকাম জারী হতে পারবে।

(৩) অধিকাংশ আরব উলামাদের মতে নোট স্বর্ণ ও রৌপ্যের স্থলা ভিষিক্ত। স্বর্ণ রৌপ্যের ও নোটের একই আহকাম। কারণ স্বর্ণ ও রৌপ্য বর্তমানে বিনিময়ের মাধ্যম নাই। স্বর্ণ রৌপ্যের স্থান নোট দখল করে নিয়েছে, তাই জাকাত, বাইয়ে ছরফ এবং সুদ ইত্যাদির সমস্ত মাসআলায় নোটের হুকুম স্বর্ণ রৌপ্যের মতই হবে। কিছু আরব ওলামা এমন পর্যন্ত বলেছেন যে, স্বর্ণ রৌপ্য এখন আর মূল্য নয় বরং সম্পদের অর্ন্তভূক্ত। এগুলোর উপর সাধারণ সম্পদের হুকুম জারী হবে।

এ অভিমতের ভিত্তি হলো কোন জিনিসই সৃষ্টিগত ভাবে মূল্য নয়। যাকেই মানুষ বিনিময়ের মাধ্যম স্থির করবে সেটাই মূল্য হবে। এ অভিমত ঠিক বলে মনে হয় না। কারণ স্বর্ণ, রৌপ্যও নোটের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। স্বর্ণ রৌপ্যকে সৃষ্টিগত ভাবে প্রকৃত মূল্যমান বলা হোক বা না হোক সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু এ কথা অবশ্যই স্বীকৃত যে, স্বর্ণ রৌপ্যকে শরীয়ত প্রকৃত মূল্যমান সাব্যস্ত করেছে। মানুষ সেটাকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করুক বা পণ্য হিসাবে ব্যবহার করুক শরীয়তের দৃষ্টিতে তার হুকুম একটিই হবে। এ কারণেই স্বর্ণ রৌপ্যের অলংকার স্বর্ণ রৌপ্যের বিনিময়ে বিক্রয় করলেও ছরফের আহবান জারী হবে। অথচ এখানে ইহা বিনিময়ের মাধ্যম হয়নি। তাই বুঝা গেল স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রকৃত শরয়ী মূল্যবান। আর নোট ধরে নেয়া মূল্যমান। তাই নোটকে স্বর্ণ রৌপ্যের স্থলাভিষিক্ত করা বিশুদ্ধ হবে না এবং একথা বললে ঠিক হবে না যে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্যমান নিঃশেষে হয়ে গিয়েছে।

(৪) বিশুদ্ধ মত হলো -- নোট রশিদ নয় বরং নিজেই মাল। স্বর্ণ রৌপ্যের মত মৌলিক মূল্যমান নয় তবে প্রথাগত মূল্যমান। এর হুকুম মুদ্রার ন্যায়। এ দৃষ্টিকোন থেকে সংক্ষেপে নোটের মাসআলা আলোচনা করা হল। যখন নোট নিজেই মাল তখন তা দ্বারা জাকাত আদায় হবে। এর পারস্পরিক লেনদেন বাইয়ে সরফ হবে না।

নোট বিনিময়ের হুকুম

নোট বিনিময়ের দুটি অবস্থা।

এক, স্বদেশীয় এক নোটকে অন্য নোটের মাধ্যমে বিনিময় করা। যেমন ১০০ টাকার নোটকে ১০ টাকার ১০ টি নোটের মাধ্যমে বিনিময় করা।

দুই, একে দেশের কারেন্সী অন্য দেশের কারেন্সীর মাধ্যমে বিনিময় করা।

প্রথম অবস্থার হুকুম হলো যেহেতু ইহা বাইয়ে সরফ নয় তাই একই বৈঠকে উভয়েই গ্রহণ কথা জরুরী নয়। তবে যে কোন একটিকে কব্জা করা জরুরী যেন بيع الدين بالدين অর্থাৎ বাকীর দ্বারা বাকী বিক্রয় না হয়। বিনিময়ে কমবেশী বৈধ কিনা? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যাবে যে, যদি উভয় বিনিময় (আদান-প্রদান) অনির্দিষ্ট হয় তাহলে হানাফীদের তিন ইমামের নিকট কমবেশী বৈধ হবে না। কারণ অর্থের মধ্যে গুণগত কমবেশী গ্রহণ যোগ্য নয়। সবই সমান। একটির পরিমাণগত বেশি হওয়া আরেকটির গুণগত উন্নত হওয়ার বিনিময় হতে পারে না। তাই এই বৃদ্ধি বিনিময় ছাড়া হওয়ায় সুদে পরিণত হবে। আর যদি বিনিময় নির্দিষ্ট হয় তাহলে আবু হানিফ (রাঃ) ও আবু ইউসুফ (রাঃ) এর নিকটে কমবেশী বৈধ হবে। কেননা উভয় পক্ষের নির্দিষ্ট করণের মাধ্যমে তার মূল্যমান বাতিল হয়ে পণ্যে পরিণত হয়েছে। তাই কমবেশী বৈধ। ইমাম মুহাম্মদ (রাহঃ) এর নিকটে এখানেও কমবেশী বৈধ হবে না। কারণ তাদের নির্ধারণ করার মাধ্যমে মূল্যমান বাতিল হয়নি। বর্তমানে ইমাম মুহাম্মদ (রা) এর মতে ফৎওয়া দেয়া উচিত। কেননা ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) ও আবু ইউসুফের (রাহঃ) এর মত গ্রহণ করলে সুদের পথ খুলে যাবে। পূর্ববর্তী ফকীহদের মধ্যেও ইমাম মুহাম্মদ (রাহঃ) এর মতের উপর ফতওয়া দেয়ার উদাহরণ আছে। যেমন ফুকাহায়ে মা-ওরাউর নাহার "আদালী" এবং "গাতারিফাহ" (এক ধরনের মুদ্রা) দ্বয়ের মধ্যে কমবেশী হারাম হওয়ার ফৎওয়া দিয়েছেন। অথচ এগুলোর মধ্যে প্রচুর গুণগত কম বেশী ছিল। তাই বুঝা গেল, এক দেশের নোটের মধ্যে কমবেশী বৈধ হবে না। সমান সমান হতে হবে, এবং এই সমতা নোটের গণনার দ্বারা নয়

বরং তার (Face Value) লিখিত মূল্য অনুযায়ী হতে হবে। দ্বিতীয় অবস্থার হুকুম হলো দুদেশের কারেন্সীর ধরণ আলাদা হওয়ায় যে কোন একটির কব্জার শর্তে কম বেশী বৈধ হবে। বরং ইহা নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্রয় ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে। প্রত্যেক দেশের কারেন্সীর ক্রয় ক্ষমতা ভিন্ন হবে এজন্য প্রত্যেক দেশের কারেন্সী ভিন্ন ভিন্ন ধরণ হিসেবে গণ্য হবে ও কমবেশীতে পরস্পরের বিনিময় বৈধ হবে। সরকার অন্যান্য দেশের কারেন্সীর সাথে স্বদেশের কারেন্সীর রেট নির্ধারণ করে দেয়। এ রেটের চেয়ে কম বেশীতে লেনদেন করা সুদ হবে না। তবে নীতি বহির্ভূত হওয়ায় ও রাষ্ট্র প্রধানের বৈধ কাজের অনুসরণ না করার কারণে গোনাহ্ হবে।

মুদ্রাস্ফিতি, মুদ্রা সংকোচন ও মূল্য সূচক

পূর্বের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, কাগজী নোটের (Paper Currency) প্রকৃত কোন মূল্য নাই। ইহা কিছু পণ্য ও সেবা (Goods and Services) ক্রয় শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। সে ক্রয় শক্তিকেই Value of Money বা মুদ্রার মূল্য বলে। নোটের মূল্য পণ্য ও সেবার মুল্য হিসাবে নির্ধারণ হয়। পণ্য ও সেবার মূল্য কম হলে নোটের মূল্য বৃদ্ধি হয় আবার পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলে নোটের মূল্য কমে যায়। তাই পণ্য ও সেবার মূল্য এবং নোটের মূল্য দুটো দুই বিপরীত দিকে ভ্রমণ করে। যখন মুদ্রার বিস্তার বৃদ্ধি পায় তখন পণ্যের চাহিদা বাড়ে। ফলে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে মুদ্রার মূল্য কমে যায়। এই অবস্থাকেই মুদ্রাস্ফিতি, আরবীতে تضخم এবং ইংরেজিতে Inflation বলে। পরে এই পরিভাষা ব্যাপকতা লাভ করে এবং পণ্যের মুল্যের যে কোন অতিরিক্তের জন্য ব্যবহার করে। মুদ্রাস্ফিতি পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে হলে তাকে Demand pull inflation এবং আরবীতে تضخم بسبب رفع الاسعار বলে। মুদ্রাস্ফিতি পণ্য তৈরীর খরচ বৃদ্ধির কারণে হলে (যেমন শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি হওয়া) তাকে Cost push inflation আরবীতে تضخم جسبب رفع الاسعار বলে। মুদ্রাস্ফিতির ঠিক বিপরীতে যদি পণ্যের মূল্য কম হয় আর মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি হয় তাকে মুদ্রাসংকোচন, আরবীতে انكماس। এবং ইংরেজীতে Deflation বলে।

মূল্যসূচক মুদ্রার মূল্য, মুদ্রাস্ফিতি, মুদ্রা সংকোচন এগুলোর পরিমাপ পণ্য ও সেবার মূল্যের ভিত্তিতে হয়। পন্যের মূল দেখে মুদ্রার মূল্য, মুদ্রাস্ফিতি ও মুদ্রা সংকোচন পরিমাপ করার একটি হিসাব নীতি আছে যাকে আরবীতে قائمة الاسعار। ইংরেজিতে Price index বা মূল্য সূচক বলে। এর পদ্ধতি হলো নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সমূহ যার মূল্যের কম বেশী মানুষকে প্রভাবিত করে এর সূচী

তৈরী করতে হবে, অতঃপর যে সময়ের মধ্যে মুদ্রার মূল্য কম বেশীর অনুমান করা হবে যে সময়ের শুরু এবং শেষের মূল্য নিয়ে তার গড় বের করতে হবে। অর্থাৎ দেখতে হবে যে ঐ সময়ের মধ্যে মূল্যের গড় শতকরা কত বেশী বা কম হয়েছে। ইহা মূল্যে কম বেশীর সরল গড়। এর দ্বারা মুদ্রার মূল্যের বিশুদ্ধ পরিমাপ করা যায় না। কারণ এই গড় বের করার জন্য সমস্ত পণ্যকে সমান রাখা হয়েছে। অথচ সমস্ত মূল্যের কম বেশী মানুষকে সমান ভাবে প্রভাবিত করে না। যে সমস্ত পণ্যের প্রয়োজনীয়তা বেশী সেগুলোর মূল্যের কম বেশী যেভাবে প্রভাব সৃষ্টি করে, যে গুলোর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা কম সে গুলোর মূল্যের কমবেশী সে পরিমান প্রভাব সৃষ্টি করে না। তাই বিশুদ্ধ পরিমাপের জন্য প্রত্যেক পণ্যের গুরুত্ব অনুযায়ী তার একটা ওজন দেয়া হয়। সে ওজনকে আরবীতে وزن البضائع। ইংরেজীতে Weight of Commodity বলে।

এই ওজনকে সরল গড়ের সাথে গুণ দিয়ে যে গড় পাওয়া যাবে তাকে পরিমাপকৃত গড়, আরবীতে المعدول الموزون। ইংরেজিতে Weighted Average বলে। এই পরিমাপ কৃত গড়ের সমষ্টি মূল্যের কমবেশীর সূচক হবে। এর দ্বারা মুদ্রার মূল্যের মধ্যে কমবেশী অনুমান করা যায়।

নিম্নের ছকের দ্বারা (Price index) মূল্য সূচকের সংক্ষিপ্ত ধারণা হতে পারে।

Price index (মূল্য সূচক)

পণ্য	১৯৯১ সালের মূল্য	১৯৯২ সালের মূল্য	সরল গড়	ওজন	পরিমাপ কৃতগড়
খাদ্য	৫০	১০০	২	.৫	১.০০
বস্ত্র	২০	৩০	১.৫	.২	.৩
বাসস্থান	৩০	৬০	২	.৩	.৬
			সমষ্টির গড় = ১.৮৩		সমষ্টি ১.৯

সরল গড়ের দ্বারা বুঝা যায় যে, মূল্য ১ থেকে ১.৮৩ হয়েছে তাই মুদ্রার মূল্যও শতকরা ৮৩ ভাগ কমে গিয়েছে।

পরিমাপ কৃতগড় দ্বারা বুঝা গেল মূল্য ১ থেকে ১.৯ হয়েছে। তাই মুদ্রার মূল্যেও শতকরা ৯ ভাগ কমে গিয়েছে।

এই ব্যাখ্যার দ্বারা জানা গেল যে, মূল্য নির্দেশক সূচক আনুমানিক, বাস্তবিক নয়। কারণ এতে কোন পণ্যকে নেয়া হবে তার সিদ্ধান্তও আনুমানিক। তাছাড়া প্রত্যেক পন্যের যে ওজন দেয়া হয় যে মূল্য নেয়া হয় সবই আনুমানিক। অনেক সময় অন্যান্য লেনদেনকেও মূল্য সূচকের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়। যেমন এক সময় পাকিস্তানে কর্মচারীদের বেতনকেও মূল্য নির্দেশক সূচকের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছিল। রুপির মূল্য যতই কম হবে বেতন ততই বেশী হবে। কোন জিনিসকে মূল্যে নির্দেশক সূচকের সাথে সম্পৃক্ত করাকে Indexation বলে।

ঋণ পরিশোধে মুদ্রাস্ফিতির প্রতিক্রিয়া ঃ

নোটের একটি মূল্য তার উপরে লেখা থাকে একে قيمة الاسمية (Face Value) লিখিত মূল্য বলে এবং আকেরটি ক্রয় মূল্য একে قيمة الحقيقية (Real Value) প্রকৃত মুল্য বলে। লিখিত মূল্য একই থাকে কিন্তু প্রকৃত মূল্য মুদ্রাস্ফিতির কারণে কমে যায়। এখন কোন ব্যক্তি অপরের কাছে ঋণী থাকলে কিছু দিন পর লিখিত মূল্য হিসাবে পরিশোধ করবে নাকি প্রকৃত মূল্য হিসাবে পরিশোধ করবে? যেমন কোন ব্যক্তির ১০০ টাকা ঋণ আছে। এক বৎসর পরে ১০০ টাকার প্রকৃত মূল্য শতকরা ১০ ভাগ কমে গেল।

এখন লিখিত মূল্য হিসাবে ১০০ টাকার নোট পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু প্রকৃত মূল্য হিসাবে ১১০ টাকা দিতে হবে। বর্তমানে এটি একটি আলোচিত সমস্যা। লিখিত মূল্য হিসাবে পরিশোধ করলে ঋণ দাতার ক্ষতি এবং তার উপর জুলুম। বিশেষ করে ঐ সমস্ত দেশে যেখানে মুদ্রাস্ফিতি বেশী। যেমন ঃ বৈরুতের কারেন্সী লীরা (Lira) এক সময় ডলারের কাছাকাছি ছিল বর্তমানে এর মূল্য এমন কম যে, এক ডলারে ৬/৭ শত লীরা পাওয়া যায়। এ সমস্যার সমাধানে অর্থনীতিবিদ ও আলেমগণের বিভিন্ন অভিমত আছে।

১. নোট ঋণ দিলে প্রকৃত পক্ষে ঐ স্বর্ণ দেয়া হয়েছে যা তার পিছনে আছে। এখন সে পরিমাণ স্বর্ণ নেয়াই তার অধিকার। সে ততটুকু স্বর্ণ বা তার মূল্য টাকার মাধ্যমে নিতে পারে। এই মতের ভিত্তি হলো নোটের পিছনে স্বর্ণ আছে। এই মতবাদের রহিত হওয়ার কথা পূর্বেই স্পষ্ট হয়েছে।

২. নোটের পিছনে স্বর্ণ থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু বুঝতে হবে যে, নোটের লেনদেন মূলতঃ স্বর্ণের লেনদেন। কারণ পূর্বে স্বর্ণই মুদ্রা ছিল। বর্তমানে নোট

স্বর্ণের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। তাই স্বর্ণের মূল্য হিসাবেই পরিশোধ করতে হবে। এই মতবাদও সঠিক মনে হয় না। কেননা একথা সর্ব স্বীকৃত যে বর্তমানে নোট স্বর্ণের প্রতিনিধিত্ব করে না। নোট নিজেই প্রচলিত মূল্য এবং পয়সার মত। প্রচলিত মূল্য এবং পয়সার নিজস্ব মানই গ্রহণযোগ্য। ইহা পরিশোধের সময় স্বর্ণের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় না। এখানে অনেকে ঈমাম আবু ইউসুফ (রাহঃ) এর উক্তি দ্বারা প্রমাণ দিয়ে থাকেন। তাঁর উক্তি হলো পরিশোধের পূর্বে পয়সার মূল্য বৃদ্ধি পাক বা কম হোক পরিশোধ মূল্য হিসেবে হবে। (রাসায়েলে ইবনে আবেদীন, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬) কিন্তু এই প্রমাণ সহীহ মনে হয় না। কারণ নোট ও পয়সার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। পয়সা স্বর্ণ রৌপ্যের সাথে সম্পৃক্ত এবং পয়সার মূল্য স্বর্ণ রৌপ্যের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হত। এজন্য পয়সার অবস্থান দিরহাম ও দিনারের রেজগীর মত ছিল। যেমন এক পয়সা রৌপ্যের এক দশমাংশ ছিল. বাজারী পরিভাষায় এ সম্পর্কের পরিবর্তনকেই পয়সার মূল্যের মধ্যে কম বেশী হওয়ার দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। তাই যখন পয়সা স্বর্ণ রৌপ্যের সাথে সম্পৃক্ত এবং দিরহাম ও দিনারের রেজগীর মত তখন ঈমাম আবু ইউসুফ (রাঃ) পয়সার মূল্য পরিশোধকে জরুরী সাব্যস্ত করেন।

নোটের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ইহা স্বয়ং সম্পূর্ণ পারিভাষিক মূল্যমান। তার নিজস্ব একটি মূল্য আছে। স্বর্ণ রৌপ্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই।

বর্তমান যুগে পয়সা ও নোটের মধ্যে আরেকটি পার্থক্য দেখা যায়। তা হলো পয়সার মূল্য জানার জন্য একটা পরিষ্কার স্বর্ণ রৌপ্যের মাপকাঠি মওজুদ ছিল। যাকে সামনে রেখে পয়সার প্রকৃত মূল্য জানা যেত। কিন্তু বর্তমানে নোট সমূহের আনুমানিক মূল্য জানা যায়। প্রকৃত মূল্য জানা সম্ভব নয়। যেমন মূল্য সূচকের আলোচনার দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে।

৩. তৃতীয় মত যা জোরালো ভাবে পেশ করা হয়। তা হলো Indexation অর্থাৎ পরিশোধকে (Price index) সূচকের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে। এই মতের প্রমাণে বলা হয় যে, নোট মূলতঃ কিছু নয়। ইহা سلة البضائع (Basket of Goods) অর্থাৎ যা কিছু পণ্যের ঝুঁড়ি ক্রয় ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে। তাই কাউকে কিছু নোট ঋণ দেয়ার অর্থ সে তাকে سلة البضائع Basket of Goos ঋণ দিল। الْاَقْرَاضُ تَقْضِى بِاَمْثَالِهَا। অর্থাৎ ঋণকে তার সাদৃশ্য দ্বারাই পরিশোধ করতে হয় এই নীতির আলোকে Basket Goods পরিশোধ করতে হবে। যার পদ্ধতি হবে, এই পরিশোধ কেও Price Indenx মূল্য সূচকের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হবে। অর্থাৎ পরিশোধের সময় মুদ্রাস্ফিতির হার অনুযায়ী বেশী পরিশোধ

করতে হবে। যেমন একশত টাকা ঋণ দিলে পরিশোধের সময় মুদ্রাস্ফিতিতে শতকরা দশ ভাগ বৃদ্ধি পেলে একশত দশ টাকা পরিশোধ করতে হবে। ফেক্বার দৃষ্টি কোন থেকে এই মতবাদ কয়েকটি কারণে ত্রুটিপূর্ণ।

প্রথম কারণ ঃ যদি নোটের পিছনে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত কিছু বস্তু থাকতো তাহলে বলা যেত যে নোট আসলে Basket of Goods এর প্রতিনিধিত্ব করে।

কিন্তু পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, এই Basket of Goods কোন নির্ধারিত জিনিস নয়। বরং ইহা মুদ্রাস্ফিতির কারণে পরিবর্তিত হয় এবং অনুমান ছাড়া একে নির্দিষ্ট করার কোন বিকল্পও নাই। তাই Basket of Goods কোন নোটের বাস্তবতা নয় বরং তার দ্বারা অর্জিত মুনাফা। কাউকে নোট প্রদানের অর্থ Basket of Goods দেয়া নয় বরং বিনিময়ের এমন হাতিয়ার প্রদান করা যার মাধ্যমে পণ্যের ঝুড়ি (Basket of Goods) ক্রয় করা যায়।

দ্বিতীয় কারণ ঃ এই মতের সার কথা হলো পরিশোধের মধ্যে সদৃশ্যতা প্রকৃত মূল্য (Real Value) হিসাবে হওয়া উচিত। শুধু লিখিত মূল্যের (Face Value) মধ্যে সদৃশ্যতা গ্রহণযোগ্য নয়।

শরয়ী দৃষ্টিকোন থেকে পর্যবেক্ষণ করলে এর উল্টা প্রমাণিত হয়। শরীয়তে ঋণ পরিশোধে পরিমাণের মধ্যে সাদৃশ্যতা গ্রহণীয়। যেমন কেউ গম ঋণ নিলেপরিশোধের সময় এলে গমের এই পরিমাণই পরিশোধ করতে হবে মূল্য যাই হোক। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) এর হাদীস। তিনি "নকী" নামক স্থানে উট বিক্রয় করতেন। দিরহামের উপর বিক্রয় হতো কিন্তু দিনার দ্বারা পরিশোধ করা হত। কখনো দিনারের উপর বিক্রয় হতো কিন্তু পরিশোধ করা হতো দিরহাম দ্বারা। এ সম্পর্কে রাসুল (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এ শর্তের সাথে অনুমতি দিলেন যে, পরিশোধের দিনের মূল্য অনুযায়ী হতে হবে। (আবু দাউদ, কিতাবুল বুয়ু' পৃ-২৫)

বুঝা গেল, বিক্রিত দ্রব্যের সমপরিমান পরিশোধ করা ওয়াজিব। পরিশোধের সময় ঐ দিনের দাম অনুযায়ী আদান প্রদান হতে পারে। এক কথায় ঋণের মধ্যে তার পরিমাণ পরিশোধ করা ওয়াজিব, মূল্য নয়। যদি মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হত তাহলে ওয়াজিবের দিনের মূল্য হিসাবে আদান প্রদান হতো।

তৃতীয় কারণ ঃ সুদী পণ্যগুলোতে শরীয়ত প্রকৃত সাদৃশ্যতা আবশ্যক করে দিয়েছে। এজন্য শরীয়ত সুদী পণ্যতে অনুমানকে বৈধ করেনি। পরিশোধকে "মূল্য সূচকের" (Price index) সাথে সম্পৃক্ত করলে অনুমান অবশ্যক হয়ে পড়ে। কেননা মূল্য সূচক (Price index) অনুমানিক হয়। এবার ঐ কথা যে, নোটের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেলে ঐ পরিমান নোট ফেরৎ দেয়া যে পরিমাণ নিয়েছিল ঋণ দাতার উপর জুলুম। এর উত্তরের জন্য নিম্ন বর্ণিত কথাগুলো স্মরণ রাখা উচিত।

ক. টাকার মান কম হওয়ার মধ্যে ঋণী ব্যক্তির কোন হস্তক্ষেপ নাই। তাই এ দায়িত্বভার তার উপর অর্পণ করা তার প্রতি জুলুম।

খ. কাউকে টাকা প্রদানের উদ্দেশ্য হয়তো তার লভ্যাংশে অংশীদার হওয়া নতুবা সহানুভূতি, লভ্যাংশেঅংশীদার হওয়ার পদ্ধতি ঋণ নয় বরং শিরকত অথবা মুদারাবা। আর সহানুভুতির জন্য কাউকে ঋণ দেয়া এমনই যেমন নিজের কাছে টাকা সংরক্ষণ রাখা। যদি ঋণ দাতা নিজের কাছে টাকা সংরক্ষণ করতো তখন মূল্য হ্রাস পেলে কেহই দায়ী ছিল না। এখানেও কেউ দায়ী থাকবে না।

গ. যদি Indexation কে বিশুদ্ধ মূলনীতি মনে করা হয় তাহলে ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্টেও তা চালু হওয়া উচিত। অথচ সেখানে কেউ চালু করে না। মুদ্রাস্ফিতির সময় যতটুকু বেশী পরিশোধ জরুরী মনে করা হয় মুদ্রা সংকোচনের সময় পরিশোধ করতে সেই পরিমাণ কম করা উচিত। অথচ কেউ এর প্রবক্তা নয়। তবে হ্যাঁ, যেখানে কারেন্সীর মূল্য এই পরিমাণ হ্রাস পায় যে, পড়তি বাজারে পরিণত হয়। যেমন বৈরুতে হয়েছে। তার হুকুম ভিন্ন। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য তা হলো মুদ্রার মূল্য কখনো সরকার নিজেই কমিয়ে দেয়ার কারণে হ্রাস পায় যাকে Devaluation বলে। এমতাবস্থায় প্রথমে দেখতে হবে এই হ্রাস করাকে এমন ব্যাখ্যা দেয়া যায় কিনা যে, সরকার প্রথম মুদ্রাকে বাতিল করে নতুন মুদ্রা চালু করেছে যার মূল্য প্রথম মুদ্রা অপেক্ষা কম?

যদি এমন ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে বলা হবে যে ঋণ পরিশোধে পূর্বের মুদ্রার কম মূল্যের নতুন মুদ্রা পরিশোধ করতে হবে। যেমন কেউ ১০০ টাকা চারডলারের সমান থাকতে ঋণ নিয়েছিল পরে সরকার ১০০ টাকার মূল্য কমিয়ে তিন ডলারের সমান করে দিয়েছে। যেন সরকার এমন একটি নতুন মুদ্রা চালু করেছে যা প্রথম মুদ্রার তুলনায় শতকরা ৩৩ ভাগ কম। এখন এই নতুন মুদ্রার দ্বারা ঋণ পরিশোধ করলে ১৩৩ টাকা পরিশোধ করতে হবে। বিষয়টি আলেমদের জন্য চিন্তার বিষয়। কিন্তু এর সামাধান দেয়ার সময় মনে রাখতে হবে যে, সরকারের পক্ষ থেকে অর্থের মূল্য হ্রাস করার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া বৈদেশিক কারেন্সীর বিনিময় হারের উপর পড়ে। অভ্যন্তরীণ লেনদেনে তার প্রতিক্রিয়া পরোক্ষ ভাবে হয়।

দ্বিতীয়ত ঃ বাস্তবোচিত নতুন মুদ্রা চালু করা যায় না। বরং পুরাতন মুদ্রা বা নোটের মুল্যই পরিবর্তন করে দেয়া হয়। কিন্তু নোটের মূল্যমান মেনে নেয়া হেতু সরকারের ঘোষণার দ্বারা সদৃশ্যগত ভাবে সে নোট পরিবর্তন হয়।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ব্যাংকিং (Banking)

ব্যাংকের সংজ্ঞা ঃ ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা জনগণের অর্থ একত্রিত করে ব্যবসায়ী, শিল্পী ও অন্যান্য দরকারী ব্যক্তিদের ঋণ প্রদান করে। বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংক এসব ঋণের উপর সুদ গ্রহণ করে। এবং আমানতদারদের স্বল্প হারে সুদ প্রদান করে। সুদের মধ্য অবস্থাই ব্যাংকের মুনাফা। ব্যাংকের উৎপত্তি ঃ মুদ্রা ব্যবস্থার ক্রম বিকাশের উপর আলোচনা করলে দেখা যায় যে, পূর্বে মানুষ তাদের স্বর্ণ স্বর্ণকারকের কাছে আমানত রাখতো। তারা এর রসিদ লিখে দিত। ক্রমান্বয়ে ঐ রশিদসমূহের মাধ্যমেই লেনদেন শুরু হলো। মানুষ আর তেমন স্বর্ণ নিতে আসে না। এ অবস্থা দেখে স্বর্ণকারগণ স্বর্ণ ঋণ দেয়া আরম্ভ করলো। অত:পর যখন তারা দেখল যে, সাধারণত জনগণ রসিদ দ্বারাই লেনদেন করে তখন স্বর্ণকারগণও ঋণ গ্রহীতাদের স্বর্ণের পরিবর্তে রসিদ প্রদান আরম্ভ করলো। এক পর্যায়ে তা ব্যাংকের রূপ ধারণ করল। পরবর্তীকালে একেই একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের রূপ দেয়া হয়েছে।

ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ঃ

ব্যাংক মূলত যৌথ মূলধনী কারবার। তাই যৌথ মূলধনী কারবার পদ্ধতি হলো ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি। ব্যাংক জনগণকে নিজ নিজ আমানত জমা করানোর আহ্বান জানায়। (ফিক্বাহর দৃষ্টিতে যা করজ বা ঋণ) যাকে বাংলায় আমানত, আরবীতে "ودائع" আর ইংরেজিত Deposits বলা হয়। আমানত কয়েক প্রকারের হতে পারে। current Account অর্থাৎ চলতি আমানত যাকে আরবীতে الحساب الجارى বলে। এই প্রকার আমানতে গচ্ছিত অর্থের উপর সুদ প্রদান করা হয় না। আমানতদারগণ যে কোন সময় যে কোন পরিমাণ অর্থ কোন বাধ্যবাধকতা ছাড়াই উঠাতে পারেন।

২. Saving Account অর্থাৎ সঞ্চয়ী আমানত। যাকে আরবীতে حساب التوفير বলে। এ আমানতের অর্থ উঠানোর জন্য বিভিন্ন বাধ্যবাধকতা আছে। এর উপর ব্যাংক সুদ প্রদান করে।

৩. Fixed Deposit অর্থাৎ স্থায়ী আমানত। যাকে আরবীতে ودائع ثابتة বলে। এ আমানতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে অর্থ উঠানো যায় না। এর উপর ব্যাংক সুদ প্রদান করে। সুদের পরিমাণ মেয়াদ হিসেবে কমবেশী হয়ে যাকে। দীর্ঘ মেয়াদে সুদের হার বেশী হয়। স্বল্প মেয়াদে কম হয়। এই তিন প্রকার আমানতের মাধ্যমে ব্যাংকের কাছে পুজি জমা হয় আবার ব্যাংকের এই পুজির একটি নির্দিষ্ট অংশ তরল আকারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা করতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এই পুজি সাধারণত সরকারী ঋণ পত্রের আকারে হয়ে

থাকে যা সহজেই নগদ অর্থে রূপান্তরিত করা যায়। এর উপর কিছু সুদও পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকই সিদ্ধান্ত দেয় যে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো নিজ নিজ আমানতসমূহের শতকরা কত অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা করবে। অবস্থার পরিবর্তনে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়। বর্তমানে আমানতের প্রায় ৪০ ভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা করতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল ব্যাংককে এ ব্যাপারে বাধ্য করে। কারণ ব্যাংকে অসংখ্য মানুষের অর্থ থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি দায়িত্ব হলো ডিপোজিটারদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। তরল পুজির অর্থ যা নগদ হয় অথবা দ্রুত নগদে রূপান্তরযোগ্য হয় একে আরবীতে السيولة এবং ইংরেজিতে (Liquidisty) বলে। ক্যাশ, অন্যান্য ব্যাংকের একাউন্ট, রূপান্তরযোগ্য ঋণ পত্র এর অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাংকের কার্যাবলী

ব্যাংক পুজি জমা করার পর বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে।

১. পুজি বিনিয়োগ ২. মুদ্রা সৃষ্টি ৩. আমদানি রপ্তানিতে মাধ্যম হওয়া ইত্যাদি। এখন এসব কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হচ্ছে।

বিনিয়োগ (Financing)

ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো মানুষের প্রয়োজনাদী বিশেষভাবে ব্যবসা সংক্রান্ত প্রয়োজনাদীর জন্য ঋণ প্রদান করা। ব্যাংক কখনো দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদান করে যাকে আরবীতে ائتمان طويل الاجل ও ইংরেজীতে Long Term Credit বলে। কখনো স্বল্প মেয়াদী ঋণ প্রদান করে যা সাধারণত ৩ মাস বা ৬ মাসের জন্য হয়। একে আরবীতে ائتمان قصر الاجل ও ইংরেজীতে Short Term Credit বলে।

ব্যাংক থেকে মানুষ তিন ধরনের ঋণ গ্রহণ করে।

১. দৈনন্দিনের বাণিজ্যিক প্রয়োজনাদীর জন্য ঋণ নেয়া হয়। যেমন বিল অথবা বেতন আদায় করার জন্য ঋণ গ্রহণ করা হয়। একে Over Head Expenses বা ভোক্তার ঋণ বলে।

২. কারবারের ব্যয় প্রবাহ যেমন ঃ ব্যবসার আসবাবপত্র ক্রয়, কাঁচামাল ইত্যাদির ক্রয় করার জন্য ঋণ, একে আরবীতে رأس المال العامل, ইংরেজীতে Working captital বলে।

৩. বড় বড় প্রতিষ্ঠানের জন্য ঋণ নেয়া হয়। একে আরবীতে تمويل المشاريع ইংরেজীতে Project Financing বলে।

ঋণ প্রদানের পদ্ধতি ঃ

ব্যাংক সীমাহীন যেখানে যে পরিমাণ ইচ্ছা ঋণ প্রদান করতে পারে না। বরং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে একটি সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এর আওতাধীন ব্যাংক ঋণ প্রদান করে। এই সীমাকে আরবীতে سقف الاعتماد ও ইংরেজিতে Credit Ceiling ও বাংলায় সংরক্ষিত জমা বলে। যেমন বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আদেশ হলো ব্যাংক তার সমস্ত আমানতের শতকরা ৪০ ভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখবে। যাকে আরবীতে احتيالى السيولة ও ইংলিশে Liguidity Reserve বলে। শতকরা ৫ ভাগ নগদ অর্থ (Cash) ব্যাংক নিজের কাছে রাখে। শতকরা ৩০ ভাগ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে। অবশিষ্ট ২৫ ভাগ দ্বারা সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করে অথবা সরকারী প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে।

সংরক্ষিত জমার অনুপাত سقف الاعمال (Credet Ceiling নির্ধারণে কয়েকটি জিনিসের প্রভাব থাকে। যেমন কোন বিশেষ দপ্তর যথা কৃষি বা শিল্পতে অধিক পুজি যোগানের প্রয়োজন হয় তখন ব্যাংকের ঝুকি এদিকে করে দেয়া হয়। কখনো মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। কারণ ব্যাংকের বেশী ঋণ প্রদানের দ্বারাও মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পায়। সামনে "মুদ্রা সৃষ্টি" শিরোনামের পাতায় পরিস্কার আলোচনা হবে।

কখনো প্রচলিত করের দ্বারা রাষ্ট্রের ব্যয় পূর্ণ হয় না। অতিরিক্ত কর আরোপ করাও কষ্ঠসাধ্য। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক Reserve বা সংরক্ষিত জমার অনুপাত বৃদ্ধি করে। অন্যান্য ব্যাংককে সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করতে বাধ্য করে জনসাধারণের অর্থের মোটা অংশ সরকার ঋণ নেয়। Credit Ceiling এর আওতায় থেকে ব্যাংক সমূহের ঋণ প্রদানের পদ্ধতি হলো সর্বপ্রথম ব্যাংক জরিপ করে যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক সে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে পারবে কিনা? তার জমিজমা ও মালিকানাধীন সম্পদ কি পরিমাণ? জরিপ করার পর ব্যাংক একটি সীমা ঠিক করে যে, আমরা এই মেয়াদ পর্যন্ত এই পরিমাণ ঋণ প্রদানে প্রস্তুত যা প্রয়োজনানুযায়ী গ্রহণ করা যেতে পারে। ঋণের সীমা নির্ধারণ করাকে আরবীতে تحديد السقف ও ইংরেজিতে Sanction Of The Limit বলে। এই সীমা নির্ধারণের পর ঋণগ্রহিতার জন্য ব্যাংকে একাউন্ট খুলে দেয়া হয়। সে একাউন্ট থেকে চাহিদা মত ঋণ নিতে পারে।

একাউন্ট খোলার উপর ব্যাংক স্বল্প হারে সুদ গ্রহণ করে (যেমন শতকরা ৫ ভাগ বা ১ ভাগ) এবং যখন সে ঋণ গ্রহণ করে তখন ব্যাংক নিয়মিত সুদ গ্রহণ করে। এই সময়ের মধ্যে সাধারণত এমন হয় যে, একবার ব্যাংক থেকে অর্থ গ্রহণ করার পর যা বেচে যায় তা পূনর্বার ব্যাংকে ফেরত দেয়া হয়। এভাবে অর্থ আদান প্রদানের ধারা চলতে থাকে। মেয়াদ শেষে ব্যাংক হিসাব করে কি পরিমাণ অর্থ কত দিন তার কাছে ছিল। সে হিসাবে তার থেকে সুদ গ্রহণ করে।

ব্যাংকের প্রকারভেদ ঃ

ব্যাংকের বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। কিছু ব্যাংক বিশেষ কোন প্রকল্পে পুজি বিনিয়োগ করে। কিছুব্যাংক ব্যাপকভাবে পুজি বিনিয়োগ করে। এ হিসেবে ব্যাংককে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১. কৃষি ব্যাংক যাকে আরবীতে المصرف الزرعى এবং ইংরেজিতে Agricultural Bank বলে। ২. শিল্প ব্যাংক যাকে আরবীতে المصرف الصناعى এবং ইংরেজিতে Industrial Bank বলে। এ ব্যাংক শিল্প ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদান করে। ৩. উন্নয়ন ব্যাংক যে ব্যাংক যেকোন প্রকল্পে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ঋণ প্রদান করে। একে আরবীতে بنوك التنمية এবং ইংরেজিতে Development Bank বলে। ৪. সমবায় ব্যাংক যাকে ইংরেজিতে Cooperative Bank ও আরবীতে المصرف التعاونى বলে। এ ব্যাংক সমবায়ের ভিত্তিতে স্থাপিত হয় এবং এর কার্যক্রম সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সদস্যরাই আমানত রাখে এবং তাদেরকেই ঋণ প্রদান করা হয়। ৫. ইনভেষ্টম্যান্ট ব্যাংক (Investment Bank) আরবীতে بنك الاشتمار বলে। যে ব্যাংকে শুধু স্থায়ী আমানতের হিসাব খোলা হয় এবং নির্ধারিত মেয়াদের জন্য ঋণ প্রদান করে। ৬. বাণিজ্যিক ব্যাংক যে ব্যাংক ব্যাপকভাবে পুজি বিনিয়োগের কাজ করে বিশেষ কোন প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট নয়। একে ইংরেজীতে Commercial Bank ও আরবীতে البنك التجارى বলে।

আমদানি রপ্তানিতে ব্যাংকের ভূমিকা

ব্যাংক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের (আমদানি রপ্তানির) এক আবশ্যকীয় মাধ্যম।

ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব ও পরিচিতি ছাড়া আমাদানি রপ্তানি সম্ভব নয়।

বিদেশ থেকে কোন কিছু আমদানি করতে গেলেই বৈদেশীক ব্যাবসায়ীরা চাহিদামত পণ্য ক্রেতার কাছে পাঠানোর পূর্বে মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা চায়।

আমদানিকারক রপ্তানিকারককে নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য ব্যাংক থেকে এক গ্যারাণ্টি পত্র গ্রহণ করে। সেখানে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে যদি আমদানিকারক রপ্তানিকারকের প্রেরিত পণ্যের মূল্য পরিশোধ না করে তবে ব্যাংকই উক্ত মূল্য পরিশোদের জন্য দায়ী থাকবে। তাকে আরবীতে الخطاب الضمان বা خطاب الاعتماد ইংরেজিতে Latter of credit সংক্ষেপে (L/C) বলা হয়। এ গ্যারান্টিপত্র গ্রহণ করাকে L.C খোলা এবং فتح الاعتماد বলে।

ব্যাংক L.C খোলার পর রপ্তানিকারকের ব্যাংকে পৌছিয়ে দেয়। রপ্তানি কারকের ব্যাংককে Nagoiiating Bank বলে। L.C পৌছার পর সেখান থেকে পণ্য জাহাজে বুক করা হয়। জাহাজ কর্তৃপক্ষ পণ্য বুক হওয়ার রসিদ প্রদান করে। রসিদকে আরবীতে بوليصة الشحن ও ইংরেজিতে Bill of Lading, বাংলায় বহনপত্র বা চালানি রশিদ বলে। রপ্তানি কারকের ব্যাংকের মাধ্যমে Bill of Lading ও সংক্রান্ত দলিলপত্র L.C ব্যাংকে পাঠিয়ে দেয়।

আমদানিকারক নিজ ব্যাংক থেকে কাগজ পত্র সংগ্রহ করে এলসির সাথে মিল করে। চালান মালের যে বিবরণ দেয়া হয়েছে তা অর্ডারের বিপরীত হলে দলিলপত্র ফিরিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে দলিলপত্র এলসির অনুযায়ী হলে দলিল দেখিয়ে বন্দর থেকে মাল সংগ্রহ করে। সাধারণত ব্যাংক আমদানিকারককে মূল্য পরিশোধ করার পরই দলিলপত্র প্রদান করে।

মূল্য পরিশোধ করার ব্যাপারে ব্যাংক এবং আমদানিকারকের মাঝে বিভিন্ন চুক্তি হয়। কখনো আমাদানিকারক এলসি খোলার সময়ই পুরো মূল্য পরিশোধ করে। একে পরিভাষায় ফুল মার্জিনে (Full Margin) এল সি খোলা বলে। আরবীতে فتح الاعتماد بغطاء الكامل বলে। কখনো ব্যাংক থেকে দলিলপত্র উঠানোর সময় মূল্য পরিশোধ করে। একে জিরো মার্জিনে এল, সি খোলা বলে। কখনো এল সি খোলার সময় সামান্য মূল্য পরিশোধ করা হয় তাকে সম্পূর্ণ মূল্যের শতকরা যে পরিমাণ পরিশোধ করা হয়েছে শতকরা ততটুকু মার্জিনে এল সি খোলা বলে। যেমন সম্পূর্ণ মূল্যের শতকরা ২৫ ভাগ প্রদান করা হলে বলা হবে শতকরা ২৫ ভাগ মার্জিনে এল সি খোলা হয়েছে। কখনো এমনও চুক্তি হয় যে দলিল পত্র আসার পর ব্যাংক নিজের থেকে মূল্য পরিশোধ করবে তা আমদানি কারকের দায়িত্বে ঋণ হিসাবে প্রবর্তিত হবে। যার উপর সাধারণত সুদ নেয়া হয়।

এল. সি. এর উপর ফিস ঃ

এল সি খোলার মাধ্যমে ব্যাংক যে সেবা প্রদান করে এর পরিবর্তে ব্যাংক আমদানিকারকের কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করে। ব্যাংক আমদানিকারককে তিনটি সেবা প্রদান করে।

১. প্রতিনিধিত্ব (Agency) অর্থাৎ ব্যাংক আমদানিকারকের প্রতিনিধি হয়ে রপ্তানি কারকের সাথে লেনদেন করে। তার দলিলপত্র রপ্তানিকারকের নিকট পাঠায় এবং রপ্তানিকারকের পাঠানো দলিলপত্র আমদানি কারককে পৌছিয়ে দেয়।

২. জামিন হওয়া (Guarantee) অর্থাৎ ব্যাংক আমাদানিকারকের পক্ষ থেকে জামিন হয় যে যদি সে মূল্য পরিশোধ না করে তাহলে আমি পরিশোধ করবো।

৩. ঋণ (Crdit) অর্থাৎ যখন আমদানিকারক তাৎক্ষণিক মূল্য পরিশোধ না করলে ব্যাংক নিজের পক্ষ থেকে পরিশোধ করে। এই অর্থ আমদানিকারকের দায়িত্বে ঋণ হয়। ব্যাংক প্রথম দুই সেবার জন্য বিনিময় ও তৃতীয় সেবার জন্য সুদ গ্রহণ করে। এ ঋণ দুই প্রকার হতে পারে। কখনো নিয়মতান্ত্রিক ঋণ নেয়া হয় যখন চুক্তি হয় ব্যাংক এখন মূল্য পরিশোধ করবে পরে আমদানিকারক ব্যাংককে পরিশোধ করবে। এটা একটা ভিন্ন চুক্তি এলসির ফিসের সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই। এর উপর নিয়মতান্ত্রিক হারে সুদ নেয়া হয়। কখনো নিয়মতান্ত্রিকভাবে ঋণ গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু লেনদেনের মধ্যে এমনিতেই এল সি গ্রাহকের দায়িত্বে ঋণ হয়ে যায়। যখন কিছুই পরিশোধ না করে বা সামান্য পরিশোধ করে এল সি খোলা হয় তখন দলিল পত্র আসার পর ব্যাংক মূল্য পরিশোধ করে দেয় তবে শর্ত হলো পণ্যের দলিল পত্র কোন প্রকার বিপরিত না হয়ে এলসির শর্তানুযায়ী হতে হবে। কিন্তু আমদানি কারকের পক্ষ থেকে যে কোন কারণে পরিশোধ করতে কয়েক দিন দেরী হয়ে যায়। যেমন ব্যাংকের থেকে সম্পর্ক করতেই দেরী হয়ে গেল। এমতাবস্থায় এমনিতেই আমদানিকারক ঋণী হয়ে যায় ও এ ঋণের উপর সুদ নেয়া হয়। অপর দিকে রপ্তানিকারকের ব্যাংক কোন জিনিসের জামিন হয় না। এখানে ব্যাংকের দুটিই কাজ। যার উপর ব্যাংক বিনিময় গ্রহণ করে।

১. প্রতিনিধিত্ব ২. ঋণ।

এখানে ঋণ হওয়ার কারণ হলো "এল সিতে দলিল পত্র এলেই মূল্য পরিশোধ করতে হবে" এমন চুক্তি হলে তাকে (L.C at Sight) বলে। এমতাবস্থায় রপ্তানিকারকের ব্যাংককে কোন ঋণ দিতে হয় না। কখনো চুক্তি হয় যে, দলিলপত্র আসার পর নির্ধারিত দিনে ক্রেতার পক্ষ থেকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। তখন যদি রপ্তানি কারকের ব্যাংক তাকে তাৎক্ষণিক মূল্য পরিশোধ করে দেয় তাহলে রপ্তানি কারকের ব্যাংক ঋণ প্রদান করল। আমদানি কারকের কাছে কখনো আমদানির করার অর্থ থাকে না অথবা থাকলেও সে অর্থকে আমদানিতে লাগাতে চায় না, তখন সে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আমদানি করে আমদানি করার জন্য ব্যাংক যে ঋন দেয় একে আরবীতে تمويل الواردات ও ইংরেজিতে Import financing বলে। ঠিক তেমনি রপ্তানি করার জন্যও ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া হয়, যেমন কোন ব্যবসায়ীর কাছে বিদেশ থেকে পণ্য ক্রয়ের অর্ডার হলো কিন্তু সে পণ্য তৈরী ও প্রস্তুত করার জন্য তার অর্থের প্রয়োজন হয়। তখন সে ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়। ব্যাংক রপ্তানিকারককে যে ঋণ প্রদান করে একে আরবীতে تمويل الصادرات ও ইংরেজিতে Export Financing বলে।

প্রত্যেক সরকার রপ্তানি কারককে সহযোগিতা করে যেন দেশের পণ্য বিদেশে বিক্রয় হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হয়। পাকিস্তানে রপ্তানিতে সহায়তাকল্পে ষ্টেটব্যাংক অব পাকিস্তান একটি স্কিম চালু করেছে যাকে Export Refinancing বলে। পূর্বে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে আদেশ প্রদান করতো যে রপ্তানির জন্য প্রদানকৃত ঋণের উপর সুদের হার কম করতে হবে। সাধারণ ঋণের সুদের হার শতকরা ১৫ ভাগ হলে রপ্তানি ঋণের সুদের হার শতকরা ৮ ভাগ। তেমনি বাণিজ্যিক ব্যাংক রপ্তানি খাতে যে পরিমাণ ঋণ প্রদান করবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সমপরিমাণ অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাংকে প্রদান করবে এবং শতকরা ৮ ভাগ সুদের ৫ ভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিবে, বাকী ৩ ভাগ বাণিজ্যিক ব্যাংকের অর্থ থাকবে। এমতবস্থায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নিজস্ব পুজি ব্যবহার করা ছাড়াই শতকরা ৩ ভাগ সুদ লাভ করতো।

বর্তমানে এই পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংককে অর্থ প্রদানের পরিবর্তে ব্যাংকের নামে সমপরিমাণ অর্থের ডিপোজিট একাউন্ট খুলে দেয়। এর উপর ট্রেজারী বিলের হিসাবে বাণিজ্যিক ব্যাংককে সুদ প্রদান করে যা সাধারণত শতকরা ১৪ বা ১৫ ভাগ হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংক শতকরা ৮ ভাগ সুদ ঋণ গ্রহণকারীর নিকট থেকে আদায় করে এর মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাংককে প্রদান করে এতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছে শতকরা ৩ ভাগ সুদ অবশিষ্ট থাকে। এবং শতকরা ১৪/১৫ ভাগ সুদ কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে পায়। এর উদ্দেশ্য রপ্তানিতেপুজি বিনিয়োগের ব্যাপারে সহায়তা প্রদান করা। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে অর্থ সংস্থাপনের জন্য ঋণ বৃদ্ধির পদক্ষেপ গৃহিত হয়েছে। ক্রেডিট কার্ড প্রদান করা হচ্ছে। বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ঋণের সুদের হার হ্রাস করা হয়েছে এবং রপ্তানি ঋণ তত্ত্বধানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি বিশেষ রপ্তানি কোষ চালু রয়েছে। ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছর থেকে কাঁচামাল, পাটজাত দ্রব্য ও চা ব্যতীত সকল রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে ৫০% হারে আয়কর রেয়াত প্রদান করা হচ্ছে। [এছাড়াও কতিপয় পণ্যের ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের সময় সীমা বর্ধিত করা হচ্ছে। (অনুবাদক)]

বিনিময় বিল (Bill of Exchange)

বিনিময় বিল একটি বিশেষ প্রকারের প্রমাণ পত্র। যখন কোন ব্যবসায়ী নিজের পণ্য বিক্রয় করে। তখন ক্রেতার নামে বিল তৈরী করে। আগামী কোন তারিখে সে বিল পরিশোধ করতে হয়। এ বিলকে প্রমাণ পত্রের রূপ দেয়ার জন্য ঋণ গ্রহিতা এ মর্মে তার উপর দস্তখত করে দেয় যে, আমার উপর সময়ান্তে

নির্দিষ্ট তারিখে এ বিল পরিশোধ করা আবশ্যক। একে আরবীতে كمبيالة এবং বাংলায় হুন্ডি বা বিনিময় বিল ও ইংরেজিতে Bill of Exchange বলে। বিল অব এক্সচেঞ্জ আদায় করার যে তারিখ নির্ধারিত করা হয় সে তারিখ আসাকে আরবীতে نضج الكمبيالة ও ইংরেজিতে Maturity বলে এবং পরিশোধ করার তারিখ কে Maturity date বলে। বিনিময় বিলে লিখিত ঋণ পরিশোধের তারিখ এলেই ঋণ গ্রহিতার নিকট থেকে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু পাওনাদারের এই মূহূর্তে টাকার প্রয়োজন হলে তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে সে বিল প্রদান করে টাকা নিয়ে বিলের অপর পৃষ্ঠায় দস্তখত করে তার অধিকার তৃতীয় ব্যক্তির দিকে ফিরিয়ে দিতে পারে। তৃতীয় ব্যক্তি সে বিলের উপর লিখিত টাকার মধ্যে কিছু বাদ দেয়। যেমন বিনিময় বিলের উপর এক হাজার টাকা লেখা আছে। সে ৯৯৫ টাকা দেয়। এ কাজকে আরবীতে خصم الكمبيالة ইংরেজিতে Discounting of the Bill of Exchange বাংলায় বাট্টা ধার্য করা বলে। বিনিময় বিলের অপর পৃষ্ঠায় যে দস্তখত থাকে একে আরবীতে تظهير ইংরেজিতে Endorsement বলে। বিনিময় বিলের উপর বাট্টা ধার্য করার হার Maturity বা পরিশোধের তারিখ আসার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। পরিশোধের তারিখ যত নিকটবর্তী হয় বাট্টা ধার্য করার হারও কম হয়। ব্যাংক সাধারণত বিল অব এক্সচেঞ্জের বাট্টা ধার্য করে। ইহা ব্যাংকের স্বল্প মেয়াদী ঋণের অন্তর্ভূক্ত। এজন্য বিল অব এক্সচেঞ্জ সাধারণত ৩ মাসের মধ্যে পরিশোধযোগ্য।

মুদ্রা সৃষ্টি ঃ

ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যার উল্লেখ অতীব প্রয়োজন মনে করি তাহলো ব্যাংক প্রথম থেকেই মজুদ মুদ্রায় বৃদ্ধি করে মুদ্রার বিস্তৃতি ঘটায় এবং মুদ্রার যোগানে বৃদ্ধির কাজ আঞ্জাম দেয়। একে تخليق زر বা মুদ্রা সৃষ্টি বলে। নিচে এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো। মানুষের কাছে যে অর্থ আসে এর খুব কম অংশই তারা নিজের কাছে রাখে। বেশীর ভাগ অংশই ব্যাংকে রাখে। যখন ব্যাংক থেকে ঋণ নেয় তখন নগদ অর্থ নেয়া প্রয়োজন মনে করে না। সাধারণত ব্যাংক তার নামে একাউন্ট খুলে দিয়ে একটি চেক বই প্রদান করে। যেন সে প্রয়োজন মত চেকের মাধ্যমে টাকা উঠাতে পারে। যেমন কেউ ব্যাংক থেকে একলক্ষ টাকা নিল। তখন ব্যাংক নগদ একলক্ষ টাকা দেয়ার পরিবর্তে তার নামে একলক্ষ টাকার একাউন্ট খুলে চেক বই প্রদান করে। যখন তার প্রয়োজন হয় তখন সে চেক দিয়ে উঠিয়ে নেয়। এ দুটি কথাকে সামনে রেখে চিন্তা করলে দেখা যায় ব্যাংকের যা টাকা মজুদ থাকে তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী উপকার ভোগ করা হয়। যেমন- কোন ব্যাংকের কাছে কিছু নোট এলো তখন ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংরক্ষিত জমার অনুপাত (Reserve Ratio) বের করে অবশিষ্ট

টাকা মানুষদেরকে ঋণ প্রদান শুরু করবে। ঋণী ব্যক্তিদের একাউন্ট খোলার দ্বারা যে নতুন ডিপোজিট ব্যাংকের কাছে এলো এর থেকেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংরক্ষিত জমার অনুপাত বের করে বাকী অর্থ আগামীতে ঋণ দেবে। যে ঋণ নিবে সে হয়তো সে ব্যাংকেই রাখবে। তাহলে এর দ্বারা মুদ্রা আরো অতিরিক্ত হলো এভাবে মুদ্রায় কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাবে। যেমন কেউ ব্যাংকে ১০০ টাকা জমা রাখলো। এর মধ্যে ব্যাংক শত করা ২০ টাকা হারে অর্থাৎ ২০ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংককে দিয়ে অবশিষ্ট ৮০ টাকা কাউকে ঋণ দিল। সে এই ৮০ টাকা আবার এ ব্যাংকেই জমা রাখলো। তাহলে ব্যাংকের মোট ১৮০ টাকার ডিপোজিট হলো। এর মধ্যে শতকরা বিশ টাকা হারে মোট ৩৬ টাকা (১০০ টাকায় ২০ টাকা + ৮০ টাকায় ১৬ টাকা) কেন্দ্রীয় ব্যাংককে দিয়ে অবশিষ্ট ৬৪ টাকা আবারো কাউকে ঋণ দিবে সে আবার এ ব্যাংকে জমা রাখবে তাহলে ব্যাংকের ডিপোজিটে ৬৪ টাকা অতিরিক্ত হয়ে সর্বমোট ২৪৪ টাকা হবে। এ অর্থের শতকরা বিশ টাকা হারে অর্থাৎ ৪৮.৮০ (৩৬ টাকা পূর্বে দেয়া হয়েছে + অতিরিক্ত ৬৪ টাকায় ১২.৮০ টাকা) কেন্দ্রীয় ব্যাংককে প্রদান করে অবশিষ্ট ৫১.২০ টাকা পুনরায় ঋণ প্রদান করবে। এখন ব্যাংকের কাছে ২৯৫.২০ টাকার ডিপোজিট হবে।

এভাবেই ব্যাংক একের পর এক ঋণ দিতে থাকে এক পর্যায়ে অর্থ শেষ হয়ে যায়। এ উদাহরণে ব্যাংকের কাছে ১০০ টাকা ছিল। কিন্তু তার দ্বারা ২৯৫ টাকার উপকার ভোগ করা হচ্ছে। প্রত্যেক ডিপোজিট হোল্ডার (আমানতদার) নিজ নিজ ডিপোজিটের ভিত্তিতে চেক জারী করতে পারে তাহলে এখানে ২৯৫ টাকার চেক জারী হতে পারে। মূলত ১০০ টাকা ছিল। অতিরিক্ত ১৯৫ টাকা ব্যাংকের সৃষ্ট। ব্যাংকের এ পদ্ধতিকে মুদ্রা সৃষ্টি বলে। উল্লেখিত উদাহরণে একটি ব্যাংক ধরে বলা হয়েছে যে, ঋণ গ্রহণকারী ঐ ব্যাংকেই টাকা জমা রাখবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় কখনো ঐ ব্যাংক ছাড়াও অন্য ব্যাংকে টাকা জমা রাখে এর ফলে অন্য ব্যাংকে ডিপোজিট বৃদ্ধি পায়। যাইহোক ব্যাংক থেকে নেয়া প্রত্যেক ঋণের ফলে কোন না কোন ব্যাংকে ডিপোজিট বৃদ্ধি পায় এমতাবস্থায় দেখা যায় ব্যাংক সামগ্রীকভাবে মুদ্রা সৃষ্টির কাজ করে।

ব্যাংকের মুদ্রা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে আরেকটি জিনিসের অন্যতম ভূমিকা আছে। যাকে পরিভাষায় Float বলে। ব্যাংকের কাছে যে অর্থ ডিপোজিট হিসেবে আছে এর উপর ব্যাংককে সুদ দিতে হয়। এ সুদ ঐ ডিপোজিটের Cost বা খরচ। কিন্তু কখনো অর্থ স্বল্প মেয়াদের জন্য রাখা হয়। সে মেয়াদে ব্যাংকের ডিপোজিটের অর্ন্তভুক্ত হয় না এবং এর উপর ব্যাংককে সুদও দিতে হয় না। ইহা ব্যাংকের এমন মুদ্রা যার উপর কোন Cast আদায় করতে হয় না। কয়েক অবস্থায় এমন হয়। যেমন

১. ব্যাংকের পক্ষ থেকে অন্য ব্যাংকের নিকট চেক জারী করা হয়। তখন এক ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকে অর্থ পরিবর্তন হতে কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়। সে সময় পর্যন্ত উক্ত অর্থ ব্যাংকের Floot। ২. ব্যাংক কাউকে ড্রাফট (Draf) প্রদান করলে ঐ ড্রাফট ক্যাশে রূপান্তরিত না করা পর্যন্ত তা ব্যাংকের নিকট Flat হিসেবে থাকে। ৩. ব্যাংক এল সি খোলে। খোলার সময়ই গ্রাহক অর্থ পরিশোধ করে দেয়। কিন্তু ব্যাংক দলিলপত্র এলে টাকা পরিশোধ করে। এ সময় পর্যন্ত কোন খরচ ছাড়াই ঐ অর্থ ব্যাংকের নিকট থাকে। ৪. রেলওয়ে ছাড়পত্র বিল্টিতে কাগজপত্র ব্যাংকে আসে। ব্যাংককে টাকা পরিশোধ করে কাগজ পত্র গ্রহণ করে বিল্টি মুক্ত করতে হয়। এখন কাগজ পত্র ব্যাংক থেকে নিয়ে মুল্য ব্যাংককে পরিশোধ করা হয়। কিন্তু বিল্টি প্রেরণকারীর নিকট টাকা পৌছতে দেরী হয়। এটাও ব্যাংকের Float. ৫. হজ্জের আবেদনের ক্ষেত্রেও এমন হয়। যাবার আগেই টাকা জমা দিতে হয়। এটাও ব্যাংকের Float.

এ ছাড়াও অনেক প্রকারের Float আছে। Float এর মাধ্যমে ব্যাংকের যথেষ্ট পুজি অর্জন হয়। অপরদিকে ব্যাংক ডিপোজিটারদের যে সুদ প্রদান করে, ব্যাংকের খরচ তার চেয়েও কম। অর্থাৎ ব্যাংক শতকরা ৮ টাকা সুদ দিলে ব্যাংকের খরচ শতকরা ৮ টাকারও কম। কেননা ব্যাংকের কাছে অনেক এমন অর্থও থাকে যার উপর সুদ দিতে হয় না বরং শুধু লাভই ভোগ করে। যেমন Floet ও কারেন্ট একাউন্টের অর্থ। অর্থাৎ ব্যাংক যে লাভ ভোগ করে এর শতকরা ৮ ভাগেরও কম জনগণ পায়। তাই ব্যাংকের লাভের দিক জনসাধারণের দিকে কম, পুজিপতিদের দিকেই বেশী।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank)

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যা সমস্ত বাণিজ্যিক (Commercil) ব্যাংকের অভিভাবক। দেশের অর্থনীতিতে এ ব্যাংকের ভূমিকা অপরিসীম। এ প্রতিষ্ঠানকে আরবীতে البنك الرئيس বা المصرف الرئيس এবং ইংরেজিতে Central Bank বাংলায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন পাকিস্তানে 'ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান, ইংল্যাণ্ডে "ব্যাংক অব ইংল্যান্ড", ভারতে "রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া" এবং বাংলাদেশে "বাংলাদেশ ব্যাংক"। **কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী (Functionsof a Central Bank)** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণত নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে।

১. ইহা সরকারের ব্যাংক। এখানে সরকারের নগদ অর্থ জমা থাকে। কিন্তু সরকারের অর্থের উপর সরকারকে সুদ দেয়া হয় না। প্রয়োজনে সরকারকে ঋণ দেয়া হয় এবং এর উপর স্বল্প হারে সুদ গ্রহণ করা হয়।

২. কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করে।

৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা বিনিময়কে নিয়ন্ত্রণ করে, মুদ্রাকে সংরক্ষণ করে প্রয়োজনে তা চালু করে।

৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দুইটি। এক. সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং এর শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা বহাল রাখা। যেন এগুলোর দ্বারা আর্থিক উপকারসমূহ লাভ করা সম্ভব হয় এবং ক্ষতিকর দিক বন্ধ হয়ে যায়। এ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বহুমুখী কাজ করে থাকে। যেমন ঃ-

(ক) কোন ব্যাংক স্থাপন করার পূর্বে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনুমোদন দেয়ার পূর্বে তার সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদী পর্যবেক্ষণ করে।

(খ) অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেখানে পুজি বিনিয়োগের প্রয়োজন বেশী কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে সে মুখী করে দেয়। যেমন কোন বিশেষ এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজের প্রয়োজন হলে অথবা কোন বিশেষ প্রকল্পে পুজি বিনেয়োগ প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে ঐ এলাকায় বা প্রকল্পে ঋণ দেয়ার ব্যাপারে বাধ্য করে।

(গ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিপোজিটারদের টাকা সংরক্ষণের জন্য নিয়মনীতি তৈরী করে। যেমন ঃ অর্থের নির্দিষ্ট পরিমাণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা দিতে হবে, নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যাংক নিজের কাছে সংরক্ষণ করবে ইত্যাদি।

(ঘ) এদিকেও দৃষ্টি রাখে যেন আর্থিকভাবে ব্যাংকের সার্বিক অবস্থা দৃঢ় হয় এবং নিজ দায়িত্বে অধিকার আদায়ের যোগ্যতা ও সামর্থ রাখে।

(ঙ) বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরস্পরের মাঝে লেনদেনের শুদ্ধিও কেন্দ্রীয় ব্যাংক করে থাকে। এরজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকে একটি বিভাগ আছে যাকে আরবীতে غرفة المقاصة এবং ইংরেজিতে Clearing House বাংলায় নিকাশ ঘর বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে যে লেনদেন হয়, একে অপরের কাছে যে ড্রাফট বা চেক পাঠায় প্রতিদিন নিকাশ ঘরে তা হিসাব করা হয়।

(চ) বানিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণও প্রদান করে।

কোন ব্যাংকের কাছে টাকা উঠানোর জন্য বিপুল পরিমাণে চাহিদা আসলে যখন নিজের তরল পুজি দিয়ে চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় না তখন ব্যাংকের শেষ আশ্রয়স্থল হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করা হয়। এ জন্যই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণ প্রদানের শেষ আশ্রয়স্থল (Lender of the last Resort) বলা হয়।

৫. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ দুটি দায়িত্বের দ্বিতীয়টি হলো দেশের মুদ্রার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা। অর্থাৎ যদি দেশে মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা বেড়ে যায় তখন এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা যেন মুদ্রা সংকোচিত হওয়া আরম্ভ হয়। আর যদি মুদ্রা সংকোচনের অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন এমন কাজ করা যেন মুদ্রার বিস্তার বৃদ্ধি পায়।

মুদ্রার সংকোচন ও বিস্তারের কয়েকটি পদ্ধতি আছে ঃ

(ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে যে হারে সুদের উপর ঋণ প্রদান করে একে ব্যাংক রেট (Bank Rate) ও আরবীতে سعر البنك বলে। একে Official Rate ও আরবীতে السعر الرسمى ও বলে। ব্যাংক রেটও মুদ্রার মূল্যের উপর প্রতিক্রিয়াশীল হয়। যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার (Bank Rate) বেশী করে তখন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে বেশী সুদের উপর ঋণ নিতে হয়। ফলে নিজেও জনসাধারণকে বেশী সুদের উপর ঋণ দেয়। সুদ বেশী হওয়ায় মানুষ ঋণ নিতে কম আসে। ফলে ব্যাংকে মুদ্রা সৃষ্টির কাজ কমে যায়। এর বিপরীত যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার কমিয়ে দেয় তখন বাণিজ্যিক ব্যাংকও কম সুদে ঋণ দেয়। ফলে মানুষ বেশী ঋণ নেয় ও মুদ্রা সৃষ্টির কাজও বেশী হয়ে মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি পায়।

রাজ কোষ বিল (Treasury bill)

(খ) দ্বিতীয় পদ্ধতিকে Open Market Operation এবং আরবীতে عمليات السوق المفتوحة বলে। এই পদ্ধতি বুঝার পূর্বে রাজ কোষ বিল বুঝা প্রয়োজন। সরকারের অর্থের প্রয়োজন হলে সরকার বিভিন্ন প্রমাণপত্র চালু করে। যাকে সরকারী ঋণ পরিশোধের অঙ্গিকার পত্র বলে। পূর্বে এর আলোচনা হয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ থেকে অর্থ সংগ্রহ করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক এক প্রকার বিল চালু করে একেই ইংরেজীতে Treaswry Bill এবং আরবীতে سندات الخزينة বলে। একটি বিলের লিখিত মুল্য (Face Value/قيمة اسميه) একশ টাকা। এ বিল নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য চালু করা হয় ও নিলামে বিক্রয় করা হয়। এর প্রথম ক্রেতা শুধু বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোই হয়ে থাকে। অন্যান্য লোক ব্যাংক থেকে ক্রয় করে। বিক্রয় পদ্ধতি হলো ঃ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রথমে এ বিলের ঘোষণা দেয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ নিজ নিজ চাহিদা প্রকাশ করে। বর্তমানে এর রেট সাধারণত শতকরা ১৩/১৪ ভাগ। অর্থাৎ একশত টাকার বিল সাধারণত ৮৬/৮৭ টাকায় বিক্রয় হয়। ব্যাংকসমূহকে তাদের চাহিদা মাফিক বিল দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। এখন যে ব্যাংক এই বিল উদাহরণত ৮৬ টাকায় কিনলো মেয়াদ পুরা হলে সে পুরা টাকা উসুল করবে।

১৪ টাকা তার সুদ বা লাভ হবে। এ বিলের মেয়াদ আসার পূর্বে কেন্দ্রীয় ব্যাংকেই বা স্ট্রক এক্সচেঞ্জে (Stock Exchange) এই বিলের (হুন্ডির মত) বাট্টাও ধার্য করা (Discount) যেতে পারে।

Open Market Operation এর ব্যাখ্যা হলো মুদ্রার মূল্যকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলির উপর কোন প্রকারের বাধ্যবাধকতা আরোপ করার স্থলে নিজেই ট্রেজারী বিল ক্রয় বিক্রয়ের জন্য খোলা বাজারে এসে মুদ্রার যোগান এবং এর মূল্যের উপর প্রতিক্রিয়াশীল হয়। অর্থাৎ মুদ্রার বিস্তার রোধ করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ট্রেজারী বিল স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করার প্রবণতা দেখায়। ফলে বানিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের পুজি দিয়ে বিল ক্রয় করে এবং ব্যাংকগুলোর মুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে প্রত্যাবর্তন শুরু হয়। ফলে তাদের পুজি কমে যায় এবং ঋণের পরিমাণ কমে মুদ্রা সৃষ্টির কাজ কমে যায়। অপর দিকে মুদ্রার বিস্তার বৃদ্ধি করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ট্রেজারী বিল বেশী মূল্যে বিক্রয়ের জন্য খোলা বাজারে এসে যায়। মানুষেরা বিল বিক্রয় করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে অর্থ গ্রহণ করে। তখনই মুদ্রা বিস্তার হয়ে যায়।

(গ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংরক্ষিত জমার অনুপাত কম বেশী করেও মুদ্রার যোগানে প্রতিক্রিয়াশীল হয়। অনুপাত কম হলে ব্যাংকগুলো বেশী ঋণ প্রদানের সুযোগ পায় এবং মুদ্রা সৃষ্টির কাজ বৃদ্ধি পায়। অনুপাত বৃদ্ধি পেলে ব্যাংকগুলো অল্প ঋণ প্রদান করে ফলে মুদ্রা সৃষ্টির কাজও কমে যায়। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রার বিস্তারের জন্য সংরক্ষিত জমার অনুপাত কম করে দেয় আর মুদ্রার বিস্তার কম করার জন্য সংরক্ষিত জমার অনুপাত বৃদ্ধি করে দেয়।

(ঘ) সুদের হার কমবেশী করেও মুদ্রার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সুদের হার বৃদ্ধি করার জন্য বাধ্য করে তখন মানুষ ঋণ কম গ্রহণ করে ও মুল্য কমে যায়। আর যদি সুদের হার কমানোর জন্য বাধ্য করে তখন মানুষ ঋণ বেশী নেয় ও মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পায়।

(ঙ) ঋণ প্রদানের সীমা রেখা তৈরী করে অথবা বিভিন্ন প্রকল্পের কোটা নির্ধারণ করেও মুদ্রার মূল্য কম করা যায়। যেমন নীতি নির্ধারণ করে দেয়া হলো যে, ব্যাংক তার আমানতের শুধু শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত ঋণ দিতে পারবে অথবা আমানতের শতকরা ২৫ ভাগ নির্দিষ্ট প্রকল্পে ঋণ দিতে হবে। এমন বাধ্যবাধকতার কারণে ব্যাংক অল্প ঋণ প্রদান করতে পারবে এবং মুদ্রা সৃষ্টিতে হ্রাস পাবে।

(চ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট প্রচলন করেও মুদ্রার মূল্যের উপর প্রতিক্রিয়াশীল হয়।

৬. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আরেকটি কাজ হলো ব্যাংকগুলোর জন্য ঋণ প্রদানের এমন নীতি নির্ধারণ করা যেন মানুষের ক্ষতি না হয় এবং দেশের অর্থনীতিতে অথবা ব্যাংকের নিজস্ব আর্থিক অবস্থার মধ্যেও দুর্বলতা সৃষ্টি না হয়। ৭. বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ব্যাংক ছাড়াও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান
Non-Banking Financial Institutions

কিছু প্রতিষ্ঠান মানুষের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ ও পুজির বিনিয়োগের ব্যাপারে ব্যাংকেই মতই। কিন্তু ব্যাংকের অন্যান্য কার্যাদী সম্পাদন করে না। এর মধ্যে ব্যাংকের মত কারেন্ট একাউন্ট ও সেভিং একাউন্ট হয় না। শুধু ফিক্স্ট (Fixed) একাউন্ট থাকে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাংকের মত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেরও মাধ্যম হয় না। এমন প্রতিষ্ঠানকে আরবীতে المؤسسات المالية غير المصرف: এবং ইংলিশে Non-Banking Financial Institutions বলে। এসব প্রতিষ্ঠান কয়েক প্রকারের আছে। এখানে যার আলোচনা করা হলো।

১. **Development Financial Institution -** যাকে সংক্ষেপে D. F. I.বলে। এটি এমন প্রতিষ্ঠান যা দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থাকে কাজ করার জন্য পুজি প্রদান করে। প্রথমত এ সংস্থাগুলো আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারা এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাহায্য পাঠাচ্ছিল এবং এ প্রতিষ্ঠান গুলো উন্নয়ন খাতে পুজি বিনিয়োগ করছিল।

২. Agriculture Development Bank of Pakistan সংক্ষেপে A.D.B.P এ প্রতিষ্ঠান কৃষিখাতে উন্নয়নের জন্য পুজি বিনিয়োগ করে। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক এর পুজি যোগান দেয়।

৩. Co-operative Society এ প্রতিষ্ঠান পারস্পারিক সহায়তার জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এ প্রতিষ্ঠান শুধু সদস্যদের কেই ঋণ প্রদান করে।

৪. N.I.T (National Investment Trust) বিভিন্ন দেশেই ইউনিট ট্রাস্টের পরিকল্পনা আছে। তাহলো একটি ফাণ্ড প্রতিষ্টা করা হয় যার মধ্যে মানুষদের থেকে পুজি সংগ্রহ করা হয়। পরে ঐ ফাণ্ডের টাকা থেকে নিজের জন্য কারবার করার স্থলে বিভিন্ন কল্যাণ মূলক কাজে লাগানো হয়। এর দ্বারা সামগ্রীক ভাবে যে মুনাফা অর্জন করা হয়। তা মানুষের মাঝে বন্টন করা হয়। N.I.T একটি প্রতিষ্ঠান যা এ ধরণের ফাণ্ডের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। ফাণ্ডের ইউনিট তৈরি করা হয়। ইউনিট বিক্রয়ের মাধ্যমে মানুষের অর্থ সংগ্রহ করে পুজি

বিনিয়োগ করা হয়। সাধারণত এর পুজি শেয়ারের মাধ্যমে সংগ্রহ হয়ে থাকে। যখনই কোন কোম্পানীর শেয়ার চালু হয় তখন N.I.T কে প্রাধান্য দেয়া হয়। শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত শেয়ার তাদের দেয়া হয়।

৫. I. C. P - Investment Corporation of Pakistan - এ প্রতিষ্ঠান কয়েকটি কাজ করে।

ক. N.I.T এর মত একটি ফাণ্ড চালু করে। যাকে I.C.P মিউচাল ফাণ্ড বলে। মানুষ এ ফাণ্ডে অর্থ বিনিয়োগ করে। N.I.T এর মত এ অর্থ দ্বারা পুজি বিনিয়োগ করে লাভ্যাংশ বণ্টন করা হয়। N.I.Tও I.C.P এর ফাণ্ডের মধ্যে পার্থক্য হলো N.I.T এর ইউনিট ক্রয় করে ইচ্ছামত N.I.T এর কাছেই দ্বিতীয় বার বিক্রয় করা যায়। কিন্তু I.C.P এর শেয়ার ক্রয় করে তার কাছে দ্বিতীয় দফায় বিক্রয় করা যায় না। তবে কোম্পানীর শেয়ারের মত অন্যের কাছে বিক্রয় করা যায়। I.C.P এর দ্বিতীয় কাজ হলো যারা প্রবাসী তারা I.C.P তে নিজের অর্থের একাউন্ট খোলে। এখানে দু প্রকারের একাউন্ট হতে পারে। এক. যেখানে I.C.P এর ইচ্ছামত যে কোন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করতে পারে। দুই. এমন একাউন্ট যা I.C.P এর ইচ্ছাধীন নয়। বরং একাউন্টার নিজেই নির্ধারণ করে দেয় যে, অমুক কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করতে হবে। I.C.P এর তৃতীয় কাজ হলো কাউরো অধিক ঋণের প্রয়োজন হলে এই প্রতিষ্ঠান কয়েকটি ব্যাংককে একত্রিত করে সমষ্টিগত ভাবে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করে।

সুদী ব্যাংকিং এর বিকল্প নীতি

এতক্ষণ ব্যাংকিং এর প্রচলিত নীতির আলোচনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, প্রচলিত নীতির মূল হলো সুদ। এখানে প্রশ্ন হয়, যদি সুদ নির্মূল করে দেয়া হয় তাহলে ব্যাংকিং এর নীতি পরিচালনা করার বিকল্প পদ্ধতি কি হবে? এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত যা প্রস্তাব এসেছে এর আলোচনা করা হলো। সুদী ব্যাংকের বিকল্প নীতির উপর আলোচনা করার পূর্বে কয়েকটি মৌলিক ধারণা অন্তঃস্থিত করা আবশ্যক।

১. সুদী ব্যাংকিং এর বিকল্প সন্ধানের উদ্দেশ্য এমন হওয়া অনুচিত যে, প্রচলিত ব্যাংক যেভাবে যত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সে সমস্ত কাজ কমবেশী সে ভাবেই চালিয়ে যেতে হবে এবং তার উদ্দেশ্যে কোন পার্থক্য হতে পারবে না। কেননা এখন যা হচ্ছে যদি তাই হতে থাকে তাহলে বিকল্প পদ্ধতির কোন প্রয়োজনীয়তাই অবশিষ্ট থাকে না। বরং বিকল্পের উদ্দেশ্য হলো ব্যাংকের যে কাজ বর্তমানের বাণিজ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রয়োজন ও উপকারী তার সমাধার

জন্য এমন কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে যা শরীয়তের নীতির গণ্ডিভূক্ত এবং যার মাধ্যমে শরীয়তের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যপূর্ণ হয়। যে কাজ শরয়ী নীতি অনুযায়ী প্রয়োজন ও উপকারী নয় এবং শরয়ী নীতি অনুযায়ী সাজানো যায় না সেগুলো থেকে দৃষ্টি ফিরাতে হবে।

২. যেহেতু সুদের নিষিদ্ধতার ফলাফল সম্পদ বন্টনের পুরো নীতির উপর পড়ে এজন্যে এমন আশা করা ভুল হবে যে, সুদের শরয়ী বিকল্পকে চূড়ান্ত প্রয়োগের দ্বারা এ সংশ্লিষ্ট সকল শাখার লভ্যাংশের সাদৃশ্য বর্তমানের সুদনীতির মতই হবে। বাস্তবে যদি ইসলামী আহকামের সঠিক পরওয়ানা নেয়া হয় তাহলে এই সাদৃশ্যতায় ব্যাপক মৌলিক পরিবর্তন আসতে পারে। বরং এ পরিবর্তন একটি আদর্শিক ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার জন্য আবশ্যকীয় চাওয়া।

৩. বর্তমানে ব্যাংক যে সেবা প্রদান করছে এর মধ্যে এই দিকটা উপকারী বরং বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থাকে সামনে রাখলে আবশ্যক তা হলো মানুষের কাছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সঞ্চয়কে একত্রিত করে সেগুলোকে শিল্প ব্যবসায় ব্যবহার করার মাধ্যম হওয়া। যদি এ সঞ্চয়গুলো প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ সিন্ধুকে পড়ে থাকতো তাহলে এর দ্বারা শিল্প ও ব্যবসার উন্নয়নে কোন উপকার আসতো না। এটাই প্রকাশ্য যে, অতিরিক্ত সম্পদের স্তুপ পড়ে থাকা শরীয়তেরও চাহিদা নয়, জ্ঞান ও অর্থব্যবস্থার আলোকেও কাম্য নয়। কিন্তু ঐ সঞ্চয়গুলোকে শিল্প ও ব্যবসায় ব্যয় করার জন্য প্রচলিত ব্যাংকগুলো ঋণ প্রদানের পথ অবলম্বন করেছে। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানগুলো পুজিবাদীদেরকে অন্যান্যদের গচ্ছিত পুঁজি এমনভাবে ব্যবহার করার প্রতি উৎসাহিত করে যেন তার দ্বারা সৃষ্ট সম্পদের বেশীর ভাগ অংশ তাদের কাছেই থাকে।

পুজির মূল মালিকদের আত্মপ্রকাশের তেমন সুযোগ মেলে না। সুতরাং প্রচলিত ব্যাংকিং নীতিতে ব্যাংকের অবস্থান শুধু এমন একটি প্রতিষ্ঠানের যা টাকার লেনদেন করে। একথার সাথে তার সম্পর্ক নাই যে এ টাকার দ্বারা যে লেনদেন করা হচ্ছে তা কেমন লাভজনক? এর দ্বারা কার লাভ আর কার ক্ষতি হচ্ছে? ইসলামী নীতির আলোকে ব্যাংক এমন অবস্থানে টিকে থাকতে পারে না যার কাজ শুধু টাকার লেনদেন। এর পরিবর্তে একে এমন একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তৈরী করতে হবে যা অনেক মানুষের সঞ্চয়কে একত্রিত করে তাকে সরাসরি কোন কারবারে লাগাবে। এবং এ সমস্ত লোক যাদের সঞ্চয় একত্রিত করা হয়েছে সরাসরি ঐ কারবারে অংশীদার হবে। তার লাভ ক্ষতি করবারের লাভ ক্ষতির সাথে সম্পৃক্ত হবে যা তার পুজি দ্বারা সম্পাদন করা হচ্ছে। এখানে সুদী ব্যংকিং এর বিকল্প হিসাবে যে ব্যবস্থা অনুমোদন করা হবে এর উপর এ প্রশ্ন না হওয়া উচিত যে ব্যাংক তার পূর্বের অবস্থান নস্যাৎ করে দিয়েছে এবং সে

নিজেই একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। কেননা এ ছাড়া ঐ প্রয়োজন পুরা হতে পারবে না যার কারণে বিকল্প নীতির অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

৪. চতুর্থ কথা হলো শতাব্দী কাল থেকে চলমান কোন নীতিকে পরিবর্তন করে তার স্থলে নতুন এক নীতি চালু করার মধ্যে সর্বদা জটিলতা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি নীতির পরিবর্তন অবশ্যক হয় তাহলে শুধু ঐ জটিলতার কারণে নতুন নীতিকে বাস্তবতার অনুপযোগী সাব্যস্ত করা কোন ভাবেই ঠিক হতে পারে না। এমন স্থানে জটিলতার সমাধান সন্ধান করা হয়। জটিলতার ভয়ে অগ্রসর হওয়া বন্ধ করা হয় না।

ইসলামী শরীয়তের আলোকে ব্যাংকিং পদ্ধতি ঃ

এ ভূমিকার পর এখন ঐ সমস্ত প্রস্তাব পেশ করা হচ্ছে যা শরীয়তের নীতি অনুসারে ব্যাংকিং পরিচালনা করার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথমে জানা উচিত যে, ব্যাংকের সম্পর্ক দ্বিমুখী হয়। একদিকে এর সম্পর্ক ঐ সমস্ত লোকদের সাথে যারা নিজেদের অর্থ ব্যাংকে আমানত রাখে। অপর দিকে ব্যাংকের সম্পর্ক ঐ সমস্ত লোকদের সাথে ব্যাংক যাদেরকে পুজি বিনিয়োগ করে। উভয় প্রকারের সম্পর্কের উপর পৃথক পৃথক আলোচনা করা হচ্ছে।

ব্যাংক এবং ডিপোজিটারের সম্পর্ক ঃ

প্রচলিত নীতিতে ব্যাংকে যে অর্থ জমা রাখা হয় ব্যাংকিং এর পরিভাষায় একে আমানত বলে। কিন্তু ফেক্বাহর দৃষ্টিতে বস্তুত উহা ঋণ। যদি ব্যাংক ইসলামী পদ্ধতিতে পরিচালনা করা হয় তাহলে আমানতদারদের সাথে ব্যাংক অংশীদারিত্ব অথবা মুদারাবার (লাভ লোকসানের চুক্তিতে ভাগ বাটোয়ারার ভিত্তিতে ব্যবসার) লেনদেন করবে। এ পদ্ধতিতে সে অর্থ ঋণ হবে না। বরং এতে টাকা জমাকারী 'রববুল মাল' বা বিনিয়োগ কারী। ব্যাংক মুজারিব বা শ্রমদাতা আর লগ্নিকৃত পুজি 'রা'সূল মাল বা পুজি হবে যার উপর ব্যাংক কোন বিশেষ হারে লভ্যাংশ প্রদানে বাধ্য থাকবে না। বরং যা লাভ হবে তা পূর্বের শর্তানুযায়ী বণ্টন হবে। কারেন্ট একাউন্ট বা চলতি আমানতে ডিপোজিটারদেরকে বর্তমানেও কোন সুদ দেয়া হয় না। ইসলামী পদ্ধতিতেও আমানতে কোন লাভ দেয়া হবে না।

কারেন্ট একাউন্টে রক্ষিত অর্থ ডিপোজিটারদের পক্ষ থেকে ব্যাংককে বিনা সুদে ঋণ প্রদান করা হয়েছে বলে পরিগণিত হবে। অন্যান্য লাভজনক হিসাব মুদারাবা (লাভ লোকসানের চুক্তিতে ভাগ বাটোয়ারার ভিত্তিতে ব্যবসা) বা শিরকতের (অংশিদারিত্ব) হিসাবে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। তবে ঐ সমস্ত হিসাব মুদারাবা বা শিরকতে রূপান্তরিত করার মধ্যে কিছু কার্যগত সমস্যা থেকে যায়।

যেমন শিরকতের সাধারণ নীতি হলো সমস্ত ব্যক্তির হিসাবের অর্থ এক সঙ্গে অংশীদার হিসাবে আসবে এবং একই সময়ে লাভ ক্ষতি হিসাব করে অংশীদারদের মাঝে বিতরণ করা হবে। কিন্তু ব্যাংকে তা সম্ভব হয় না। কারণ এখানে মানুষের অর্থ জমা করা ও উঠানোর ধারা স্বতন্ত্রভাবে চালু থাকে।

ফিক্সড (Fixed) ডিপোজিটে যদিও উঠানোর সময় নির্ধারিত কিন্তু জমার সময় নির্ধারিত নয়। প্রত্যেকে প্রতিদিন Fixed ডিপোজিটের হিসাব খুলতে পারে। সেভিং একাউন্টে জমা দেয়ারও সময় নির্ধারিত নাই উঠানোরও সময় নির্ধারিত নাই। এ সমস্যার একটি সমাধান হলো প্রচলিত নীতি পরিবর্তন করতে হবে এবং গ্রাহকদেরকে একটি নির্দিষ্ট তারিখে অর্থ জমা দেয়ার ও একটি নির্দিষ্ট তারিখে অর্থ উঠানোর উপর বাধ্য করা হবে। অংশীদারিত্বের মেয়াদ তিনমাস বা ছয় মাস নির্ধারণ করতে হবে। প্রত্যেক মেয়াদান্তে লাভ ক্ষতির হিসাব করে তা বন্টন করতে হবে। কিন্তু সমাধানের এ পদ্ধতিতে প্রথমত ঃ মানুষর জন্য ব্যাংকে টাকা রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে। কারণ একই তারিখে জমা করা ও একই তারিখে উঠানোর দ্বারা ব্যাংকের উপর চাপ পড়বে। এর ফলে অনেক সঞ্চয়কে কাজে লাগানো সম্ভব হবে না। তাই ব্যাংকের শিরকত ও মুদারাবায় লাভ বন্টনের আরেকটি পদ্ধতির ব্যাপারে অনেক মহল থেকে প্রস্তাব দেয়া হচ্ছে যাকে একাউন্টেন্ডের পরিভাষায় الحساب اليومى। বা দৈনন্দিন উৎপাদনের উপর মূল হিসাব (Daily Producit Basis) বলে।

এ প্রস্তাবের সারমর্ম হলো- অংশীদারদেরকে যথাযথ নীতি অনুসারে ব্যাংক থেকে অর্থ উঠানোর এবং জমা করার স্বাধীনতা দেয়া হবে। কিন্তু যখন অংশীদারিত্বের একটা মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে যে, এই মেয়াদের মধ্যে কি পরিমাণ অর্থ কত দিন ব্যাংকে ছিল? এবং প্রতিদিন প্রতি টাকার লাভের গড় কত? অতঃপর যে ব্যক্তির যে পরিমাণ অর্থ এ মেয়াদের মধ্যে ব্যাংকে ছিল সে হিসাবে লাভ বণ্টন করা হবে। শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এর উপর প্রশ্ন হতে পারে যে এ পদ্ধতিতে লাভের বন্টন আনুমানিক হয়। কাউরো বাস্তবিক লভ্যাংশের কিছু অংশ অন্যের কাছে চলে যাওয়ার আশংকা থাকে। যেমন ছয় মাস পর লভ্যাংশ বন্টন হলো। এ ছয় মাসের মধ্যে প্রথম তিনমাস লাভ বেশী হয়েছে এবং শেষ তিন মাসে লাভ কম হয়েছে। এ ছয় মাসে যায়েদের অর্থ ছয় মাস ব্যাংকে ছিল, ওমরের ছিল শেষ তিন মাস। অথচ প্রতিদিনের লাভ সমানভাবে পাবে। তাহলে যায়েদের প্রকৃত লভ্যাংশের কিছু অংশ উমরের কাছে এসে যাবে। লভ্যাংশ বন্টনের উল্লেখিত অবস্থায় নিঃসন্দেহে এ প্রশ্ন উত্থাপন হয়।

কিন্তু এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, অংশদারিত্বে অংশীদারদের সম্পদ অনির্দিষ্টভাবে মিশে যায়। তাই লভ্যাংশ বন্টন করার সময় প্রত্যেকের পুজির

প্রকৃত লভ্যাংশ দেখা হবে না। বরং একত্রিত সমস্ত পুজির দ্বারা যে সামগ্রীক লাভ অর্জন হলো তা বণ্টন করা হবে। অথচ এমন সন্দেহ বর্তমান যে, এদের পুজি দ্বারা লাভ অর্জিত হয়েছে। অপরের পুজির দ্বারা একেবারেই লাভ হয় নি। বুঝা গেল প্রকৃত লাভের বন্টন অংশীদারিত্বে উদ্দেশ্য নয় বরং অনুমানিক বন্টনই যথেষ্ট। তবে শর্তহলো সমস্ত অংশীদার এর উপর সন্তুষ্ট হতে হবে। তাই প্রচলিত পদ্ধতিতে লভ্যাংশ বন্টনের শরয়ী অবকাশ বুঝা যাচ্ছে। বিশেষ করে যখন অর্থ রাখার সময়ই প্রত্যেকে ব্যাপারটি সম্পর্কে অবগত হয় যে, লভ্যাংশ আনুমানিক পদ্ধতিতেই বন্টন হবে। তখন পরস্পরের সন্তুষ্টিতে লভ্যাংশ বন্টনের একটি হিসাবী পদ্ধতিকে গ্রহণ করায় কোন অসুবিধা না হওয়া উচিত। এ সমস্ত ব্যাখ্যা ঐ সময় যখন কোন ব্যক্তি মেয়াদের মধ্যে ব্যাংকে প্রবেশ করে ও টাকা উঠায় আবার রাখে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি মেয়াদের মধ্যে ব্যাংক থেকে সমস্ত টাকা একবারে উঠিয়ে নেয়। তখন এ সমাধান চলবে না। তাই উত্তম ব্যাখ্যা হবে যে, ব্যাংক এখন তাকে লভ্যাংশ বণ্টন করে দিচ্ছে না। বরং এই ব্যক্তি কারবারে তার অংশ বিক্রয় করে দিচ্ছে এবং ব্যাংক তা ক্রয় করে নিচ্ছে। এ অংশ ক্রয় করার জন্য ব্যাংক লাভ ক্ষতির অবস্থা বুঝে তার অংশের মূল্য নির্ধারণ করে।

ইসলামের বিনিয়োগ পদ্ধতি ঃ

এ যাবৎ পর্যন্ত ইসলামী নীতিতে ব্যাংক এবং টাকা জমা রাখা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এখন ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ পুজি বিনিয়োগের ইসলামী পদ্ধতি সমূহের উপর আলোচনা করা হচ্ছে। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এর কয়েকটি পদ্ধতি হতে পারে।

১. শিরকত ও মুদারাবাত ঃ

সুদের বিশুদ্ধ ইসলামী বিকল্প শিরকত ও মুদারাবা পদ্ধতি। যা সুদ থেকে অনেকগুণ উত্তম ফলাফলের বাহক। বিনিয়োগের আদর্শ ও ন্যায় সঙ্গত পদ্ধতি সম্পদ বণ্টনের উপর যার অত্যন্ত ভালো প্রভাব পড়ে। এর দ্বারা ব্যাংকের এ পরিকল্পনাও নস্যাৎ হতে পারে যে, ব্যাংক কারবারের কাজকর্ম থেকে পৃথক থেকে শুধু পুজি বিনিয়োগের মাধ্যম মাত্র।

শিরকত ও মুদারাবা নীতি চালু হলে ব্যাংকের নাম ব্যাংক থাকলেও ব্যাংকের এই অবস্থান শেষ হয়ে যাবে। তখন ব্যাংক নিয়মতান্ত্রিক ভাবে কারবারে প্রবেশ করবে। শিরকত ও মুদারাবার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো শিরকতে অংশীদারগণ পুজির মধ্যেও শরীক হয় এবং কাজের মধ্যেও শরীক হতে পারে। কিন্তু মুদারাবায় রব্বুল মালের (বিনিয়োগকারী) পুজি হয় আর মুদারিব কাজ করে। রব্বুল মাল কাজের মধ্যে শরীক হয় না। এখানে শিরকত ও মুদারাবার

কয়েকটি মূল নীতি বর্ণনা করা হচ্ছে। শিরকত ও মুদারবার লেন দেন করতে সেগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী।

১. পুজি হিসাবে লভ্যাংশ নির্ধারণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। লভ্যাংশ নির্ধারণ করার বিশুদ্ধ শরয়ী পদ্ধতি হলো বাস্তব লাভের শতকরা অংশ নির্ধারণ করা হবে।

২. লাভের পরিমাণ পরস্পরের সন্তুষ্টিতে নির্ধারণ হতে পারে যেমন কাউরো পুজি শতকরা ৪০ ভাগ তার জন্য শতকরা ৬০ ভাগ লভ্যাংশের শর্ত লাগানো যেতে পারে। অন্যের পুজি শতকরা ৬০ ভাগ তার জন্য ৪০ ভাগ লভ্যাংশের শর্ত করা যেতে পারে। এতে অসুবিধার কিছু নাই। লভ্যাংশের বন্টন পুজির পরিমাণ হিসাবে হওয়া জরুরী নয়। বিভিন্ন অংশীদারের জন্য লভ্যাংশের বিভিন্ন হার নির্ধারণ করা যেতে পারে। যাকে বর্তমানের পরিভাষায় Weightage ওজন দেয়া বলে। অর্থাৎ বিভিন্ন অংশীদারদের বিভিন্ন ওজন দেয়া যেতে পারে। তবে যে অংশীদার কাজ না করার শর্ত করেছে তার লভ্যাংশ পুজির অনুপাত থেকে বেশী হতে পারবে না।

৩. লভ্যাংশে বিভিন্ন অংশীদারদের বিভিন্ন ওজন দেয়া যেতে পারে কিন্তু ক্ষতির ব্যাপারে এমন নয়। ক্ষতি সর্বদাই পুজির অনুপাতে হবে।

ফুকাহায়ে কিরাম যার ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ

اَلرِّبْحُ عَلٰى مَا اصْطَلَحُوْا عَلَيْهِ وَالْوَضِيْعَةُ بِقَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ –

লাভ আলোচনার ভিত্তিতে আর ক্ষতি মূলধনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

শিরকত ও মুদারাবার সমস্যা সমূহঃ

শিরকত ও মুদারাবা চালু করার মধ্যে সাধারণত দুপ্রকারের সমস্যার কথা বলা হয়।

১. আজকাল দ্বীনদারী ও আমানতদারীর মাপকাঠি অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছে। কাউকে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পুজি প্রদান করলে সে কখনো প্রকৃত লাভ বলে না। বরং লাভের স্থলে ক্ষতি দেখায়। তাই শিরকত ও মুদারাবার উপর কাজ করা বড়ই কঠিন। এর উত্তর হলো সত্যিই লেনদেনে বদদ্বীনির অবস্থা দুংখজনক কিন্তু বদদ্বীনির কারণে কোন কাজ বন্ধ হয় না। বিভিন্ন পদ্ধতিতে বদদ্বীনি দুরীকরণের চেষ্টা করা হচ্ছে। যেমন অডিট নীতি, একাউন্টস নীতি, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি। মুশারিকাও মুদারাবাতে ও এধরনের কর্মসূচী গ্রহণকরা যেতে পারে।

তাছাড়া যে ব্যক্তি বা সংস্থার ব্যাপারে একবার বদদ্বীনি প্রমানিত হবে তাকে সমস্ত ব্যাংক (Black list) কালো তালিকার অন্তর্ভুক্ত করবে। যার অর্থ হবে এমন ব্যক্তি ভবিষ্যতে কোন ব্যাংক থেকেই পুজি সংগ্রহ করতে পারবে না। যদি একে নীতিনির্ধারণ করে কার্যকর হিসাবে চালু করা হয় তাহলে মানুষ বদদ্বীনি করতে ভয় পাবে এবং ব্যাপক ভাবে এ কুকর্মের ফটক বন্ধ হয়ে যাবে। এছাড়াও আরো অনেক কর্মসূচী আইনগত কর্মসূচী হতে পারে। হাঁ যদি শুধু এক ব্যাংক এমন কাজ করে তাহলে অবশ্যই তার জন্য সমস্যাজনক। কিন্তু যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু হয় এবং সমস্ত ব্যাংকের নীতি তার মোতাবেক হয় তাহলে বদদ্বীনির পথ বন্ধ হতে পারে।

২ . দ্বিতীয় সমস্যা হলো ইনকাম ট্যাক্স বা আয়কর নীতির কারণে। সাধারণত ব্যবসায়ীরা দু'ধরনের খাত তৈরী করে। আয় করের জন্য একটি খাত আরেকটি বাস্তব খাত। এমতবস্থায় মুদারাবা ও মুশারাকার ভিত্তিতে পুজি গ্রহণকারী যদি বাস্তব লাভ দেখায় তাহলে আয়কর গ্রহণকারী ধরে বসে আর যদি বাস্তব লাভ না দেখায় তাহলে লাভের প্রকৃত বন্টন হয় না।

এর উত্তর হলো যখন রাষ্ট্রিয় ভাবে এ সমস্যার উপর চিন্তা করা হবে তখন মুশারাকা ও মুদারাবাকে কার্যকর করার জন্য কর নীতির শুদ্ধিও আবশ্যক হবে। করকে আয়ের সাথে সম্পৃক্ত করার স্থলে রাষ্ট্রিয় প্রয়োজনে করের এমন কোন নিয়ম চালু করা যেতে পারে যাতে বদদ্বীনির এই পথ বন্ধ হয়ে যায়। বিনিয়োগের অনেক মেয়াদ এমন আছে যেখানে শিরকত ও মুদাবারায় লম্বা চওড়া হিসাব কিতাবের প্রয়োজন হয় না। যেমন আমদানির বিনিয়েগে প্রথম থেকেই আমাদনিকৃত দ্রব্যের খরচও সম্ভাব্য অর্জিত মূল্য জানা থাকে। তাই এর মধ্যে শিরকত অথবা মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা করায় ধোকার সম্ভাবনা খুব কম।

এমনি ভাবে ব্যাংক ব্যবসায়ীর পুরো কারবারে শরীক হওয়াও আবশ্যক নয়। সে কারবারের নিদিষ্ট একটি অংশে শরিক হতে পারে যেখানে লভ্যাংশের নির্ধারণ বেশি কষ্ট কর নয়। তাছাড়া যেহেতু ব্যাংকের জন্য ব্যবসায়ীর সার্বক্ষনিক শরীক থাকা আবশ্যক নয় বরং ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিরা নিজ নিজ বিল্ডিং মেশিনারীজ ইত্যাদি প্রথম থেকেই লাগিয়ে রেখেছে ব্যাংক ছয় মাস বা একবছর মেয়াদে তার সাথে অংশীদারিত্বের লেনদেন করতে পারে। এজন্য পরস্পরের সন্তুষ্টিতে এমনও হতে পারে যে, নির্ধারিত এবং সীমিত অংশীদারিত্বে কারবারের শুধু সরাসরি ব্যায়গুলো (Direct Expenses) মেনে নেয়া হবে। আর মোটমাট লাভ (Gross profit) উভয়ের মাঝে বন্টন হবে। যেহেতু জমাট আসবাব (ঘর, মেশিনারীজ) ব্যাবসায়ী সংগ্রহ করেছে এজন্য তার লভ্যাংশ বাড়িয়ে দেয়া হবে। কিন্তু ঐ আসবাব পত্রের খরচ ও পরোক্ষ খরচ অংশীদারিত্বের উপর অর্পন করা যাবে না।

এভাবে হিসাব কিতাবেও সহজ হয়ে যাবে এবং বদদ্বীনির আশংকা কমে যাবে। কর নিরেট লাভের উপর আরোপিত হয় এজন্য করের সমস্যার সমাধানও বের হয়ে যাবে। শিরকত ও মুদারাবা কে কোন কোন প্রকারের বিনিয়োগে ব্যবহার করা যেতে পারে এর বিশদ আলোচনা ইনশাআল্লাহ্ সামনে আসবে। মুশারাকা ও মুদারাবাই ইসলামের মৌলিক পদ্ধতি। কিন্তু কোন কোন অবস্থায় মুদারাবা ও মুশারাকা সম্ভব হয় না। যেমন কোন কৃষকের পাওয়ার টিলার ক্রয়ের জন্য পুজির প্রয়োজন হলো- এখানে শিরকত ও মুদারাবা সম্ভব নয়। এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অন্যান্য পদ্ধতি আছে যা এখন বর্ণনা করা হচ্ছে।

ইজারা ঃ

এটাও বিনিয়োগের একটি শরয়ী পদ্ধতি। যাকে Leasing বলে। এর ব্যাখ্যা পূর্বে কোম্পানীর জন্য পুজির যোগান শিরোনামের মধ্যে করা হয়েছে। এখানে একথা স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, শুধু ইজারা শব্দ দেখে যে কোন লেনদেনকে শরয়ী মনে না করা উচিত। কেননা আজকাল সাধারণত ইজারার নামে যে লেনদেন হচ্ছে এগুলোর মধ্যে ইজারার বাস্তবতা নাই। ইজারার বাস্তবতা হলো ইজারা দাতা (Lesser) যে মেশিনারী ইত্যাদি ইজারার ভিত্তিতে প্রদান করছে সে তার মালিক ও জিম্মাদার । কিন্তু বিনিয়োগের ইজারায় বর্তমানে কার্যত তা হয় না। ইজারা দাতা (lessor) মেশিনারীর কোন প্রকার দায়িত্ব নেয় না। যদি মেশিনারীর ক্ষতি হয় তাহলে ইজারা গ্রহিতার (lessee) ক্ষতি বুঝা হয়। এমন কি কোন দুর্ঘটনায় মেশিনারী ধ্বংশ হলেও ইজারা গ্রহিতা ভাড়া দিতে থাকে। ইজারা দাতার সম্পর্ক ঐ মেশিনারীর সাথে শুধু এতটুকু যে অনাদায়ে ঐ মেশিনারী বিক্রি করে নিজের ঋণ উসুল করে নেয়।

তাই বর্তমানে প্রকৃত ইজারা হয় না। মূল উদ্দেশ্য সুদের উপর ঋণ প্রদান করা কিন্তু করের মধ্যে ফাকি দেয়ার জন্য ইজারার নাম দেয়া হয়। এমন লেনদেন শরীয়তে বৈধ নয়। তবুও যদি বাস্তবেই ইজারা দাতা মেশিনারীর মালিক হয় এবং সে তার দায়িত্ব গ্রহণ করে ইজারা দেয় তাহলে বৈধতার অবকাশ আছে। ভাড়া নির্ধারণ করতে গিয়ে যদি মেশিনারীর মূল্য সহ কিছু লাভও হয়ে যায় তবুও এতে কোন শরয়ী অসুবিধা নাই। কিন্তু চুক্তিতে এমন শর্তারোপ করা যাবে না যে, ইজারার মেয়াদ শেষ হবার পর মেশিনারী একা একাই ইজারা গ্রহিতার মালিকানায় এসে যাবে।

কেননা এমতাবস্থায় صفقة في صفقة এর রূপ নেয়। অর্থাৎ একের মধ্যে আরেক চুক্তি যা শরীয়তে নাজায়েয। তবে পুর্বের শর্তছাড়া মেয়াদ শেষ হবার পর তার দিকে মালিকানা প্রত্যাবর্তনের অবকাশ আছে। 'মুরাবাহা মুআজ্জালাহ' লাভসহ বাকী বিক্রয় এটা বিনিয়োগের একটি শরয়ী পদ্ধতি হতে

পারে। যার সারকথা হলো যখন কোন ব্যক্তি ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে আসবে তখন ব্যাংক তাকে জিজ্ঞাসা করবে, যে কোন জিনিস ক্রয় করার জন্য ঋণ প্রয়োজন? ব্যাংক তাকে টাকা দেয়ার পরিবর্তে ঐ জিনিস ক্রয় করে লাভ সহ বাকী বিক্রয় করবে। সমতার সাথে লাভ সহ যে কোন মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। কিন্তু লাভের একটা হার নির্ধারণ করে মুরাবাহা এজন্য করা হয় যেন নীতি এক থাকে এবং সবার থেকে লাভ একই হারে উসুল হয়। লাভের যে হার নির্ধারণ করা হয় একে মার্ক আপ (Mark up) বলে। এটি বিনিয়োগের একটি বৈধ পদ্ধতি তবে শর্ত হলো সঠিক ভাবে প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর সাথে সম্পাদন করতে হবে। কেননা বাকীর কারণে দাম বৃদ্ধি করা ফুকাহাদের সর্বসম্মতি ক্রমে জায়েজ।

ইসলামী ব্যাংক সমূহে এ পদ্ধতি অত্যন্ত প্রশস্ততার সাথে কার্যকর হচ্ছে। কিন্তু ইহা একটি অত্যন্ত নাজুক পদ্ধতি যার মধ্যে সামান্য অসাবধানতা সুদী নীতির সাথে মিলিয়ে দেয়। বর্তমান ব্যাংক সমূহে مرابحه লাভ সহ বাকী বিক্রয় এর বাস্তবতা বুঝা ও প্রয়োজনীয় শর্তবলীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা ছাড়াই এর উপর কাজ করা হচ্ছে। যার ফলে অনেক অবৈধতা সৃষ্টি হচ্ছে। এখানে সে ভূল যা সাধারণত মুরাবাহা করতে গিয়ে ব্যাংক সমূহ করে থাকে আলোচনা করা হলো। বিশুদ্ধ মুরাবাহা করতে এগুলো থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

প্রচলিত মুরাবাহায় শরয়ী ত্রুটি সমূহ ঃ

(১) মুরাবাহার বিশুদ্ধ রূপ হলো ব্যাংক কোন জিনিস ক্রয় করে লাভের উপর (Markup) বিক্রয় করবে। পাকিস্থানের ব্যাংক সমূহে এমনও দেখা যায় যে জিনিসের উপর মুরাবাহা চুক্তি করা হচ্ছে ঐ জিনিস প্রথম থেকেই ঐ ব্যক্তির কাছে উপস্থিত থাকে। ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে আসে, ব্যাংক তার থেকে সে জিনিস নগদ কম মূল্যে ক্রয় করে লাভ সহ আবার তার কাছেই বিক্রয় করে। একে (Buy Back) বলে। এমনি ভাবে প্রকৃত মুরাবাহার স্থলে লাভ (Mark up) কে বাইবেকের (By Back) সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছে। যা শরীয়তের দৃষ্টিতে একেবারে অবৈধ। কেননা একই ব্যক্তি থেকে কম মূল্যে ক্রয় করে তাৎক্ষনিক তার কাছেই বেশী মূল্যে বাকীতে বিক্রয় করে দেয়া বাস্তবে সুদী ঋণেরই একটি রূপ। যখন ক্রয়ের সময়ই এমন শর্তারোপ করা হয় যে, উহাকে দ্বিতীয় বার বিক্রয় করে দেয়া হবে।

(২) প্রকৃত পক্ষে (By Back) এর বাহানাও সম্ভব নয়। কারণ সাধারণত ইহা শুধু কাল্পনিক কর্মসূচী। অনেক সময় এমন কোন সামগ্রী পাওয়া যায় না যার উপর (By Back) করা হয়। এমনকি প্রতিষ্ঠানের এমন ব্যয় যার দ্বারা কোন দ্রব্য ক্রয় করা যায় না। যেমন বেতন, বিল আদায় ইত্যাদির জন্যও ব্যাংক থেকে মুরাবাহা হিসাবে ঋণ পাওয়া যায়।

(৩) যদি (By Back) নাও হয় বরং প্রকৃতই যদি মুরাবাহা হয় তবুও যে বস্তু কে মুরাবাহা হিসাবে বিক্রয় করা হচ্ছে তা প্রথমে ব্যাংকের আয়ত্বে আনার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয় না। অথচ মুরাবাহা সহী হওয়ার জন্য ঐ বস্তু প্রথমেই ব্যাংকের আয়ত্বাধীন আসা আবশ্যক।

(৪) ব্যাংকের কাছে যখন কোন ব্যক্তি পুজি নেয়ার জন্য আসে তখন ব্যাংক বিনিয়োগের সীমা নির্ধারণ করে দেয় যে, ব্যাংক এই পরিমাণ পুজি মুরাবাহা করতে প্রস্তুত। চুক্তিতে (Agreements) দস্তখত করিয়ে নেয়া হয়। সে সময় ব্যাংক তাকে পন্য কেনার উকিলও বানিয়ে দেয় কিন্তু তখন কোন ক্রয় বিক্রয় সম্পাদন হয় না। বরং শুধু পারস্পারিক চুক্তি হয় যে, ব্যাংক প্রয়োজন মত ঐ সমস্ত শর্তাবলীর ভিত্তিতে নিজ গ্রাহককে তার প্রয়োজনীয় পন্য ক্রয় করে যোগান দিবে। এখানে প্রয়োজন ছিল গ্রাহক তার প্রয়োজনীয় পণ্যের ব্যাপারে ব্যাংককে বলবে। এরপর ব্যাংক পন্য নিজের মাধ্যম দ্বারা ক্রয় করে নিজের আয়ত্বে আনবে, অতঃপর গ্রাহক মুরাবাহা হিসাবে ক্রয় করবে। কিন্তু যদি ব্যাংক নিজে ক্রয় করা ছাড়া ঐ গ্রাহককেই ক্রয়ের জন্য উকিল বানায় তাহলে এখানে প্রয়োজন ছিল গ্রাহক প্রথমে ঐ পন্য ব্যাংকের উকিল হিসাবে ক্রয় করে ব্যাংককে অবগত করা। তার পর ইজাব কবুলের (প্রস্তাব গ্রহণ) মাধ্যমে নিজের জন্য ক্রয় করা। গ্রাহকের দুটি অবস্থানের একটিকে অপরটি থেকে পৃথক রাখা আবশ্যক।

প্রথমে সে ব্যাংকের পক্ষথেকে উকিল। যতক্ষণ সে এই অবস্থানে থাকে তার উপর উকালতের (প্রতিনিধিত্বের) আহকাম চালু থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত পন্যের উপর তার আয়ত্ব ব্যাংকের পক্ষথেকে উকিল হিসাবে হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ পন্য ব্যাংকের মালিকানাধীন থাকবে ও ব্যাংকের দায়িত্বে থাকবে। এ সময়ের মধ্যে যদি ঐ পন্য উকিলের কোন হস্তক্ষেপ ছাড়া নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ব্যাংকের ক্ষতি হবে। কিন্তু যখন সে ব্যাংককে অবগত করে তার থেকে পন্য নিজের জন্য ক্রয় করে নেবে তখন পন্য গ্রাহকের মালিকানায় ও তার দায়িত্বে চলে আসবে।এর পর নষ্ট হলে গ্রাহকের ক্ষতি হবে। গ্রাহকের উভয় অবস্থান পরিপূর্ণ ভাবে একটি অপরটি থেকে পৃথক হওয়া অত্যন্ত জরুরী।

কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ ব্যাংক এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ রাখে না। বরং বিনিয়োগের পরিমাণ (Limit) অনুমোদন করার সময় মুরাবাহার চুক্তিতে যে দস্তখত হয় একেই যথেষ্ট মনে করা হয়। এরপর গ্রাহক নিজেই পন্য ক্রয় করে ব্যবহার শুরু করে দেয়। ব্যাংক থেকে ক্রয়ের জন্য অন্য কোন ইজাব কবুল (প্রস্তাব ও গ্রহণ) হয় না। যার ফলে ইহা শুধুমাত্র শৈল্পিক কর্মসূচীতে পরিণত হয়েছে। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় ব্যাংক গ্রাহককে টাকা প্রদান করে এবং মেয়াদান্তে অতিরিক্ত অর্থ উসূল করে। পন্য ব্যাংকের দায়িত্বে আসা, এর মালিকানা গ্রাহকের

৯—

দিকে প্রত্যাবর্তন হওয়া এবং এ উদ্দেশ্যে ইজাব কবুল ইত্যাদি কিছুই হয় না। এ পদ্ধতি একেবারে হারাম ও না জায়েয।

(৫) এমন ভুলও হয় যে, বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ করার চুক্তিতে সাক্ষর করার সময় ঐ ব্যক্তি থেকে হুন্ডি (Bill of Exchange) বা প্রতিশ্রুতি পত্রে (Promissory Note) স্বাক্ষর করে নেয়। এটা এ জন্য ভূল যে, হুন্ডির উপর স্বাক্ষর ঐ সময়ই হতে পারে যখন কোন ব্যক্তি ঋণী হয়ে যায়। এ ব্যক্তি এখানে ব্যাংকের কাছে ঋণী হয় নাই। কেবল মাত্র আগামীতে বাকী মুরাবাহা করার প্রস্তুতির চুক্তি হলো। গ্রাহক ব্যাংকের কাছে ঋণী ঐ সময় হবে যখন সে পণ্য ব্যাংক থেকে নিজের জন্য ক্রয় করবে। তাই প্রতিশ্রুতি পত্র বা হুন্ডিতে স্বাক্ষর করাও সে সময় হওয়া উচিত।

(৬) সুদী নীতিতে ঋণ আদায়ের সময় এলে ঋণী ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে সামর্থ না হলে অথবা এখন পরিশোধ করতে না চাইলে প্রথমত সুদ ঋণের মধ্যে শামেল হয়ে যায় এবং এর উপর অতিরিক্ত সুদ লাগিয়ে পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। একে (Rull Over) রুল ওভার বলে। মুরাবাহতেও এ পদ্ধতি শুরু করা হয়েছে। মুরাবাহার মুল্য পরিশোধ করার সময় পরিশোধ করতে সামর্থ না হলে এখানেও ঋণ কে (Rull Over) করে দেয়া হয়। অথচ ইহা একটি বিক্রয় পদ্ধতি মাত্র। এখানে পণ্যের একটি মূল্য নির্ধারিত ছিল। এ মুরাবাহার উপর অতিরিক্ত মুরাবাহা করা যাবে না। মুরাবাহার বাস্তবতা এবং শর্তাবলীকে সন্নিবেশিত না করার কারণে এ ধরণের অসুবিধা সৃষ্টি হয়ে যায়।

ফলে শরীয়তের দৃষ্টিতে এ মুআমেলা বৈধ থাকে না। এজন্য মুরাবাহার উপর আমল করতে তার শর্তাবলী অনুসরণ করা প্রয়োজন। এখন মুরাবাহারে মুআজ্জালাহ' বাকী মুরাবাহা সংক্রান্ত কয়েকটি মাসআলা পেশ করা হলো ঃ-

ঋণের প্রমান পত্র

বাকী মুরাবাহায় পন্যের দাম ক্রেতার দায়িত্বে ঋণ হয়ে যায়। তাই ব্যাংক প্রমান হিসাবে জমানত অথবা বন্ধক দাবী করতে পারে। বর্তমানে বন্ধকের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। এর শরয়ী আহকামের বিস্তারিত আলোচনা লেখকের احكام البيع بالتقسيط নামক আরবী গ্রন্থে উল্লেখ আছে। এখানে সংক্ষিপ্ত সার আলোচনা করা হলো। মূল্যের পরিপক্কতার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. বিক্রিত পণ্যকেই দলিল হিসাবে নিজের কাছে রেখে দেবে। মূল্য পরিশোধ করার জন্য বিক্রিত পণ্যকে আটকে রাখা বৈধ নয়। কেননা বাকী বিক্রয়ে বিক্রেতার জন্য বিক্রিত পণ্যটিকে রাখার কোন অধিকার নাই। (হিন্দীয়া,

৩য়খন্ড, পৃষ্টা ১৫; ক্রয় বিক্রয় অধ্যায়) তবে বন্ধক হিসাবে বিক্রিত পন্য নিজের কাছে রাখা যেতে পারে ক্রেতা বিক্রিত পন্য গ্রহণ করার পর নতুন ভাবে বন্ধক রাখার শর্তে। (রদ্দুল মুখতার মা'আ দ্দুররুল মুখতার খণ্ড, ৬ পৃষ্ঠা-৪৯৭ রেহেন অধ্যায়) বিক্রিত পণ্য ও বন্ধকের মধ্যে পার্থক্য হলো বিক্রিত পণ্যকে আটকে রাখলে পণ্য পরস্পরের মধ্যে নির্ধারিত দামের দায় বহন করবে এবং পণ্য নষ্ট হয়ে গেলে লেনদেন বাতিল হয়ে যাবে। আর বন্ধক হিসাবে থাকলে ঐ পণ্য বাজার দরের দায় বহন করবে এবং তা নষ্ট হলে লেনদেন বাতিল হবে না।

২. বর্তমানে প্রচলিত বন্ধকের একটি রূপ হলো বন্ধকী দ্রব্য রাহেন বা বন্ধক দাতার কর্তৃত্বে থাকে এবং সে তাকে ব্যবহার করে। মুরতাহিন বা বন্ধক গ্রহীতার সে দ্রব্যের উপর কোন কর্তৃত্ব থাকে না। তবে সময় মত ঋণ পরিশোধ না করলে তা বিক্রয় করে ঋণের টাকা উসুল করতে পারে। বন্ধক দাতা ঋণ পরিশোধ করার পূর্বে বন্ধকী দ্রব্য নিজে ব্যবহার করতে পারে কিন্তু অপরের মালিকানায় দিতে পারে না। একে (Simple Mortgage) সরল বন্ধক (الرحن السـاذ ج) বা (Floatiny Charge) الذمـه السـائـله বলে। এই বন্ধকের উপর প্রশ্ন হতে পারে যে এখানে বন্ধকী দ্রব্যের কর্তৃত্ব বন্ধক গ্রহীতার দিকে প্রত্যাবর্তন করে না। অথচ বন্ধক বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য বন্ধকী দ্রব্যের উপর তার কতৃত্ব আবশ্যক। কিন্তু কোন কোন অবস্থায় বন্ধকের এ পদ্ধতি বৈধ মনে হয়।

৩. ঋণের পরিপক্কতার আরেকটি রূপ হলো তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে জামিন বানানো। যাকে ফিক্বার পরিভাষায় কিফালাহ বলে এটাও বৈধ পদ্ধতি। এর বিশদ আলোচনা ফুকাহায়ে কিরাম লিখেছেন। কিন্তু এর উপর পারিশ্রমিক বা ফিস নেয়া শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নয়।

ঋণ পরিশোধ বিলম্বের জরিমানা ঃ

সুদী কারবারে আদায়ে বিলম্ব হলে একা একাই সুদ বৃদ্ধি পায়। যার ভয়ে ঋণী ব্যক্তি সময়মত আদায় ঋণ করে থাকে। কিন্তু মুশারাকা (যৌথকারবার) মুদারাবা (লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্বে একজনের পুজি ও আরেকজনের শ্রমের যৌথ কারবার) অথবা মুরাবাহায় (খরিদা দামের উপর কিছু মুনাফা সহ বিক্রয় করা) এমন হয় না। এজন্য মানুষেরা অযথা উপকার ভোগ করে পরিশোধ করতে দেরী করে। ইহা বন্ধের পদ্ধতি কি হতে পারে? এ সমস্যা বর্তমানের সচেতন উলামাদের আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এতটুকু কথা শতসিদ্ধ যে, পরিশেধে বিলম্ব যদি ঋণী ব্যক্তির অপরাগতার কারণে হয় তাহলে এর হুকুম কোরআন মজীদে স্পষ্ট উল্লেখ আছে وَإِنْ كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ

কিন্তু যদি অজুহাত সন্ধানী হয়, পুজি থাকা সত্ত্বেও বিনা কারণে দেরী করে এর ফটক বন্ধ হবে কিভাবে? এ ব্যাপারে কিছু সমসাময়ীক উলামায়ে কিরাম ঋণী

ব্যক্তির বিলম্বের অবস্থায় ক্ষতিপূরণ (Compensation) আরোপ করাকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অনেক ব্যাংকে এর উপর কাজ চালু হয়েছে। যার ফর্মূলা তৈরী করা হয়েছে যে, প্রথমে তাকে অজুহাত সন্ধানী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য এক মাস পর্যন্ত নোটিশ দিতে হবে। যদি এক মাসের নোটিশ দেয়া সত্ত্বেও সে পরিশোধ না করে তাহলে এখন দেখতে হবে যে, সে যতদিন বিলম্ব করেছে ব্যাংকের বিনিয়োগ একাউন্ট এই সময়ে লাভের পরিমান কত? সে হিসাবেই তার উপর ক্ষতিপূরণ সংযুক্ত করে দেয়া হবে। যা সরকার নয় বরং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যাংক পাবে। যেমন ব্যাংকের বিনিয়োগ একাউন্টে শতকরা পাঁচ ভাগ লাভ হলে ঋণের শতকরা পাঁচ ভাগ তার উপর ক্ষতিপূরণ হিসাবে সংযুক্ত করে দেয়া হবে। যদি ব্যাংকের এই সময়ের মধ্যে কোন প্রকার লাভ না হয় তাহলে তার থেকেও কিছু নেয়া হবে না। কিন্তু অধিকাংশ ওলামায়ে কিরাম ক্ষতিপূরণের প্রবক্তা নন। এর বৈধতার উপর যে প্রমানাদি পেশ করা হয় তা সন্দেহ যুক্ত।

এর ব্যাখ্যা লেখকের احكام البيع بالتقسيط নামক কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর বৈধতা সন্দেহ যুক্ত, কার্যতও উপকারী নয়। কেননা এর দ্বারা ঋণী ব্যক্তির উপর ঋণ পরিশোধে চাপ পড়বে না। কারণ বিনিয়োগ একাউন্টের লাভ সাধারণত কম হয়। পক্ষান্তরে মুরাবাহার হার বেশী হয়। তাই কোন ব্যক্তি দীর্ঘ মেয়াদে বেশী লাভের হারে মুরাবাহা করার স্থলে স্বল্প মেয়াদে মুরাবাহা করে আদায়ে বিলম্ব করবে।

আর ক্ষতি পুরণ বহন করবে। এতে নিজের উপর কোন চাপ থাকবে না। বরং লাভই মনে করবে। তাই বিলম্ব বন্ধের যুক্তি সঙ্গত কারণ হলো যা আমি প্রথমে পেশ করে ছিলাম পরবর্তীতে যথেষ্ট গ্রহণ যোগ্য হয়েছে।

তাহলো মুরাবাহা অথবা ইজারার চুক্তিতে (Agreement) ঋণ গ্রহিতা একথাও লিখবে যে, যদি আমি আদায় করতে দেরী করি তাহলে এত টাকা কোন কল্যাণ মূলক কাজে খরচ করবো। এ টাকা ঋণ অনুপাতেও নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ ফাণ্ড থেকে কাউকে সাহায্যও প্রদান করা যেতে পারে, বিনা সুদে ঋণ ও দেয়া যেতে পারে। কিন্তু এ অর্থ ব্যাংকের আয়ে গন্য হবে না। এ পদ্ধতি বেশি উপকারী। কারণ এ পদ্ধতিতে টাকার পরিমাণ নির্ধারিত নাই। বেশির থেকে বেশীও হতে পারে। এর দ্বারা ঋণ গ্রহিতার উপর চাপ পড়বে। এটাকা জরিপানাও নয়, সুদও নয় বরং ঋণ গ্রহিতার পক্ষ থেকে অবশ্যক করে নেয়া। যাকে يمين اللجاج বলে।

এ আবশ্যক করে নেয়ার আলোচনা تحرير الكلام فى مسائل الالتز ۲۱ নামক কিতাবে এভাবে বর্ণিত হয়েছে।

أَمَّا إِذَا الْتَزَمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِيْ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُوْفِهِ حَقَّهُ فِيْ وَقْتٍ كَذَا وَكَذَ افَلَهُ عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا فَهٰذَا لَا يَخْتَلِفُ فِيْ بُطْلَانِهِ لِأَنَّهُ صَرِيْحُ الرِّبَا إِلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا إِذَا الْتَزَمَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُوْفِهِ حَقَّهُ فِيْ وَقْتٍ كَذَا فَعَلَيْهِ كَذَا لِفُلَانٍ أَوْصَدَقَةٌ لِلْمَسَاكِيْنِ فَهٰذَا هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ الْمَعْقُوْدِ لَهُ هٰذَا الْبَابُ فَالْمَشْهُوْرُ أَنَّهُ لَا يَقْضِىْ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَالَ ابْنُ دِيْنَارٍ يَقْضِىْ بِهِ - (صفحة ١٧٦ بيروت)

যদি বিবাদী বাদীর জন্য আবশ্যক করে নেয় যে, অমুক সময়ে সে তার অধিকার আদায় না করলে এত টাকা দিতে বাধ্য থাকবে। এটা প্রকাশ্য সুদ হওয়ার মধ্যে কাউরো মতনৈক্য নাই। যদি বলে যে, তার অধিকার অমুক সময়ের মধ্যে আদায় না করে তাহলে অমুককে বা গরীবদের ছাদকা হিসাবে এত টাকা দিতে বাধ্য থাকবে। এতে ওলামাদের মতনৈক্য আছে। প্রসিদ্ধ মত হলো পরিশোধ করতে হবে না কিন্তু ইবনে দিনার বলেন পরিশোধ করতে হবে। এ থেকে বুঝা গেল যে এ আবশ্যক পরিশোধ করা নৈতিকতার দৃষ্টিতে জরুরী। কিন্তু আদালতের দৃষ্টিতে জরুরী হওয়ার মধ্যে মতনৈক্য আছে।

বর্তমানে প্রয়োজনের তাগীদে যারা আদালতের দৃষ্টিতেও জরুরী বলেন তাদের কথায় আমল করলে কোন অসুবিধা নাই। মেয়াদের পূর্বে পরিশোধ করলে ঋণের মধ্যে হ্রাস করা যদি ঋণ গ্রহিতা তার ঋণ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই পরিশোধ করে তাহলে সুদী কারবারে সুদ কম হয়ে যায়। এখানে প্রশ্ন, এমতাবস্থায় মুরাবাহার অর্থেও কি হ্রাস করা যাবে? এ সমস্যার দুটি দিক আছে।

১. যাকে ফুকাহায়ে কিরাম ضع وتعجل দ্বারা বর্ণনা করেন। অর্থাৎ ঋণ গ্রহিতা দাতাকে বলবে তুমি ঋণের মধ্যে হ্রাস করে সময়ের পূর্বেই উসুল করে নাও। এর হুকুমের মধ্যে ফুকাহায়ে কিরামের প্রসিদ্ধ মতনৈক্য আছে। অধিকাংশের মতে না জায়েয এবং এটিই বিশুদ্ধ।

২. পরবর্তীকালীন কিছু হানাফী ফুকাহা বাকী মুরাবাহায় মেয়াদের পূর্বে আদায় করলে মূল্যে হ্রাস করাকে বৈধ সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু ব্যাংককে এব্যাপারে উন্মুক্ত ছাড় দিলে মুরাবাহাও সুদী কারবারে কোন পার্থক্য থাকবে না। তাই সমীচীন হলো চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে না যে, মেয়াদের পূর্বে আদায় করলে

দাম কম হবে কিন্তু যদি কেহ মেয়াদের আগেই আদায় করে তাহলে তখন পূর্বে নির্ধারণ করা ছাড়া কমিয়ে দেয়া হয় তবে কোন অসুবিধা নাই।

ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতির প্রয়োগ ঃ

এতক্ষণ পর্যন্ত বিনিয়োগের ঐ সমস্ত পদ্ধতি মৌলিক ভাবে আলোচনা করা হয়েছে যা শরয়ী মৌলনীতি অনুযায়ী হতে পারে। এখন চিন্তার বিষয় হলো ঐ পদ্ধতি গুলো ব্যাংকের বিভিন্ন বিষয়ের উপর কিভাবে প্রয়োগ হতে পারে? যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাংকের প্রত্যেক খুটি নাটি বিষয়ের উপর ঐ পদ্ধতি গুলো প্রয়োগ না করা হবে ততক্ষণ কার্যত শৃংখলা ঠিক রাখা কষ্টকর। তাই এখন ব্যাংকের খুটি নাটি বিষয়ের উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো। একথা প্রথমেই (ব্যাংকের কার্যক্রম বর্ণনায়) বিস্তারিত বলা হয়েছে যে, ব্যাংকের বিনিয়োগের তিনটি পদ্ধতি আছে। বিনিয়োগের তিন পদ্ধতিকে শরীয়তের ফর্মূলায় ফেলার জন্য চিন্তা করতে হবে যে, এখানে কোন ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

تمويل المشارع-(Project Financing) প্রকল্প বিনিয়োগ ঃ- শিরকত, মুদারাবা, ইজারা এবং মুরাবাহা সকল পদ্ধতিতেই প্রজেক্ট বিনিয়োগ হতে পারে। ইজারা-মেশিনারী ক্রয় করে ব্যাংক ইজারায় দিয়ে দেবে। মুরাবাহা-মেশিনারী ক্রয় করে লাভের সাথে বিক্রয় করে দেবে। শিরকত ও মুদারাবা- দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগে ব্যবহার করা যেতে পারে।

تمويل رأس المال (Working Capital Financing) শিল্প কর্মে মূল ধন বিনিয়োগ ঃ

এ বিনিয়োগ বিশেষ লেনদেনের সীমা পর্যন্ত মুশারাকা ও মুদারাবা হতে পারে। যেমন ব্যাংক যে পুজি প্রদান করে তাদিয়ে তুলা ক্রয় করা হবে এর দ্বারা কাপড় ইত্যাদি বানিয়ে যে লাভ অর্জিত হবে এতে ব্যাংক অংশীদার হবে। কাচা মালের প্রয়োজন হলে এর মধ্যেও মুরাবাহা হতে পারে।

মাথা পিছু ব্যয় ঃ Over Head Expenses .

ঐ সমস্ত ব্যয় যা প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের সাথে সম্পর্ক রাখে না। যেমন বেতন, ভাড়া, বিল পরিশোধ ইত্যাদি। এর মধ্যে বিনিয়োগ খুব কঠিন। এখানে ইজারা ও মুরাবাহার সম্ভাবনা নাই। এখানে দুটোই পথ। একটি মুশারাকা পদ্ধতি। যত টাকা প্রয়োজন ব্যাংক তা দিয়ে কারবারের কোন অংশে অংশীদার হবে। যখন অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান অর্থ পেয়ে গেল তখন সে কারবারের যে কোন প্রয়োজনে খরচ করতে পারে। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো বিনা সুদে ঋণ প্রদান এতে ব্যাংক ঋণের হিসাব রাখার জন্য যে অর্থ ব্যয় হয় তা নিতে

পারে। এখানে মূল কথা হলো প্রকৃত ব্যয় নিতে পারবে কিন্তু প্রত্যেক ঋণের উপর প্রকৃত ব্যয় জানা প্রায় অসম্ভব। তাই এখানে ব্যাংকের জন্য ব্যবস্থাপনা কাজের প্রচলিত ভাড়া উসুল করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। প্রচলিত ভাড়া অতিক্রম করা চলবে না। যেমন ফৎওয়ার পারিশ্রমিক নেয়া বৈধ নয়। কিন্তু ফৎওয়া লিখার পারিশ্রমিক নেয়া বৈধ। এখানে ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন যে, লেখার পারিশ্রমিক প্রচলিত পারিশ্রমিক থেকে বেশি না হওয়া উচিত।

আমদানিতে ইসলামী ব্যাংকের ভুমিকা ঃ

প্রচলিত নিয়মে আমদানি রপ্তানিতে ব্যাংকের ভুমিকা অনেক। আমদানির (Import) ক্ষেত্রে ব্যাংক L. C. খুলে। এর উপর ব্যাংক নিজের সেবার পারিশ্রমিক, জামানতের পারিশ্রমিক, ঋণের মধ্যে সুদ নিয়ে থাকে। শরীয়তের দৃষ্টিতে জামানতের পারিশ্রমিক ও ঋণের সুদ নেয়া বৈধ নয়। তাই L.C এর বিকল্প দুটি জিনিস হতে পারে। প্রচলিত ইসলামী ব্যাংক সমূহে সাধারণত এল, সির লেনদেন মুরাবাহা হিসাবে সম্পাদন হয়। আমদানিকারক যে পন্যকে আমদানি করতে ইচ্ছুক ব্যাংক উকিল হওয়ার স্থলে নিজেই সে পণ্য কিনে আমদানি করে মুরাবাহা হিসাবে তাঁর কাছে বিক্রয় করে। এল সির ফিস ইত্যাদিকে মুরাবাহার হারের অন্তভুক্ত করে নেয়। মুরাবাহার শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখলে মৌলিক ভাবে এখানে কোন অসুবিধা নাই। তবুও কার্যত এ পদ্ধতি পছন্দনীয় মনে হয় না। কারণ

১. এ পদ্ধতির অনেক স্থানে মুরাবাহার শর্ত পুরণ করা মুশকিল। অনেক সময় কার্যত অনেক শর্ত পুরণ ও হয় না।

২. এখানে ব্যাংকের ঐ পণ্য ক্রয় করে মুরাবাহা করা একটি কৃত্রিম কর্মসূচী মাত্র। কেননা আমদানি কারক প্রথমে বিক্রেতার নিকট থেকে পুরা লেনদেন ঠিক করে নিয়েছে। শুধু চাওয়ার সময় ব্যাংক মাঝখানে আসছে। সরকারী কাগজ পত্রে এবং আইন গত ভাবে আমদানিকারক (Importer) ব্যাংককে বুঝা যাচ্ছে না। বরং মূল ক্রেতাকেই বুঝা যাচ্ছে। অন্যদেশ থেকে যে, পন্য বিক্রয় করছে সেও ব্যাংককে ক্রেতা বুঝছে না।

৩. মুরাবাহা বৈধ হওয়ার জন্য আবশ্যক যে, আমদানিকৃত পণ্য প্রথমে ব্যাংকের দায়িত্বে আসতে হবে। অথচ অধিকাংশ সময় এমন হয় না। তবুও যদি মুরাবাহার শর্তাবলী বিশুদ্ধ ভাবে শরীয়ত অনুযায়ী পাওয়া যায় তাহলে লেনদেন জায়েজ হবে। এল, সির সহি বিকল্প হলো- এই লেনদেন শিরকত অথবা মুদারাবার পদ্ধতিতে করতে হবে। যদি এল সি জিরো মার্জিনে হয়ে থাকে তাহলে মুদারাবা হবে। ব্যাংক রব্বুল মাল (যোগানদাতা), আমদানিকারক

মুদারিব (শ্রমদাতা) সাব্যস্ত হবে। যদি এল, সি খোলার সময় কিছু টাকা প্রদান করা হয় তাহলে শিরকত হবে।

মুশারাকা বা মুদারাবা হওয়াবস্থায় ব্যাংক আমদানিকারককে বলবে পণ্যের দাম আমি আদায় করে দিচ্ছি। বিক্রয় করলে যে লাভ পাওয়া যাবে তা নির্ধারিত পরিমাণ অনুপাতে বন্টন করে নেয়া হবে। এখানে এরূপ অবস্থাও বিবেচনা যোগ্য হতে পারে যে, ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য মুশারিকা করবে। ঐ মেয়াদের মধ্যে যদি পণ্য বিক্রি হয়ে মুল্য হাতে আসে তাহলে লভ্যাংশ চুক্তি অনুপাতে বন্টন করে নেয়া হবে। কিন্তু যদি বাজারে বিক্রয় না হয় তাহলে আমদানিকারক ব্যাংকের অংশ ক্রয় করে তার মূল্য পরিশোধ করে দেবে।

রপ্তানিতে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা

রপ্তানির ব্যাপারে ব্যাংকের ভুমিকা দুইটি ঃ

প্রথমত . সে রপ্তানি কারকের ব্যাংক (Negotiating Bank) হওয়া হিসাবে কয়েকটি সেবা সম্পাদন করছে। যেমন পন্যে পাঠানোর কাগজ পত্র (Bill of Lading) পাঠায়, আমদানি কারকের নিকট থেকে টাকা এবং ঐ সমস্ত সেবার পারিশ্রামিক উসুল করে ইত্যাদি। এর মধ্যে শরীয়তের কোন প্রশ্ন নাই কেননা এসমস্ত কাজ এমন যার পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয।

ব্যাংকের দ্বিতীয় ভুমিকা হলো, রপ্তানি কারকের (Exporter) পন্য ক্রয় করা অথবা তৈরী করার জন্য যে পুজির প্রয়োজন হয় ব্যাংক তা বিনিয়োগ করে থাকে একে تمويل الصادرات (Export Financing) বলে। ইহা আবার দুই প্রকার। উভয়কে বুঝে উভয়ের শরয়ী পদ্ধতি পৃথক পৃথক বুঝা উচিত।

বিনিয়োগের প্রথম প্রকার হলো - কোন ব্যক্তির কাছে বিদেশ থেকে অর্ডার এলো,কিন্তু তা ক্রয় করার বা তৈরী করার পুজি প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে ব্যাংক বিনিয়োগ করে। একে تمويل قبل الشحن / Preshiponent Financing (জাহাজ মাল বোঝাই করণের পূর্বকালীন বিনিয়োগ) বলে।

দ্বিতীয় প্রকার হলো রপ্তানি কারক ক্রয় করে বা তৈরী করে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু টাকা আসতে দেরী হবে বিধায় ব্যাংক থেকে সমপরিমান টাকা নিতে চাচ্ছে। একে تمويل بعد الشحن / Post shipment Financing(জাহাজে মাল বোঝাই করার পরবর্তী কালীন বিনিয়োগ) বলে। সুদী কারবারে উভয় অবস্থায় সুদের উপর ঋণ প্রদান করে। উভয় প্রকার বিনিয়োগের শরয়ী পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১ . অনেক ইসলামী ব্যাংক সমূহে এমন অবস্থা চলছে যে, ব্যাংক আমদানি কারকের কাছ থেকে ঐ মাল নিজে ক্রয় করে মূল্য পরিশোধ করে।

আমদানিকারক তার রপ্তানিকারকের কাছ থেকে যে মূল্য নির্ধারণ করে ছিল, ব্যাংক তার চেয়ে কম মূল্যে রপ্তানিকারকের নিকট থেকে মাল ক্রয় করে। রপ্তানি কারক বৈদেশিক ক্রেতার সাথে যে মূল্য নির্ধারণ করেছিল তার উপর সে মাল পাঠায়। মাঝখানে ব্যাংক লাভবান হয়। কিন্তু এ পদ্ধতিতে অনেকগুলো অসুবিধা আছে। তাহলো এ পদ্ধতিতে ক্রয় বিক্রয়ের শরীয়ত ভিত্তিক চাহিদা পূরণ হয় না। যেমন এখানে ব্যাংককে রপ্তানি কারক সাব্যস্ত করা উচিত। কিন্তু ব্যাংক মাল ক্রয় করার পরও গ্রাহককেই (যে ব্যাংক থেকে পুজি নিতে এসেছিল রপ্তানী কারক) বুঝা হয়। রপ্তানির সরকারী মনোযোগ তার দিকেই যায়। অন্য দেশের আমদানিকারক (Importer) ও ব্যাংককে বিক্রেতা বুঝে না। গ্রাহককেই বুঝে। এমন কি মালের মধ্যে দোষ ইত্যাদির দাবী সাধারণত গ্রাহকের উপরেই হয় ব্যাংকের উপর হয় না। তাই বুঝা গেল ব্যাংকের এই ক্রয় বিক্রয় একটি কৃত্রিম কর্মসূচী।

যদি এ সমস্ত খারাপি দুর করে সত্যই ক্রয় বিক্রয়ের বাস্তবতা পাওয়া যায় তাহলে এ পদ্ধতি গ্রহণ যোগ্য হতে পারে। এখানে পরিস্কার হওয়া দরকার যে, প্রচলিত নিয়মে মাল পাঠানোর কাগজ পত্র (Bill of Lading) ইত্যাদি ব্যাংকের নামে হয়ে থাকে। এর উপর লেখা থাকে To The Order Of The Bank. অর্থ ও কাগজ পত্রের উসুলও ব্যাংক করে থাকে এর দ্বারা এমন বুঝা ঠিক হবে না যে, চুক্তির অধিকার ব্যাংকের দিকে ফিরে গেছে। কারণ বাস্তবে চুক্তিকারী হিসাবে ব্যাংকের নাম লেখা হয় নাই। বরং ব্যাংকের নাম শুধু পরিপক্কতার জন্য লিখা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাংক এবং গ্রাহকের লেনদেন পরিস্কার হবে না ব্যাংক কাগজ পত্র দেবে না।

২. এই বিনিয়োগের উত্তম পদ্ধতি হলো ব্যাংক ও গ্রাহকের মাঝে শিরকত বা মুদারাবার চুক্তি হওয়া। যদি গ্রাহক কিছু পুজি বিনোয়োগ করে তাহলে শিরকত আর তা না করলে মুদারাবার চুক্তি হবে। গ্রাহক ব্যাংক থেকে পুজি নিয়ে মাল ক্রয় করবে বা তৈরি করবে এরপর বিদেশে পাঠাবে। যা লাভ হবে শর্তানুযায়ী তা বণ্টন হয়ে যাবে। এপদ্ধতিতে মুশারাকা ও মুদারাবা সহজ হয়ে যাবে। কেননা গ্রাহকের বিদেশী ক্রেতার (আমদানিকারক) সাথে চুক্তি হয়েছে পণ্য তৈরীর খরচের ও অনুমান আছে। তাই খুব সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, এই লেনদেনে কি পরিমাণ লাভ হবে? তবে এর মধ্যে একটি সমস্যা হতে পারে তা হলো গ্রাহক মাল কাংখিত গুণের বিপরীত পাঠিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে আমদানিকারক মাল গ্রহণ করেনি, তাহলে এতে ব্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর সমাধান এমন হতে পারে যে, মুশারাকা ও মুদারাবার চুক্তিতে ব্যাংক এমন শর্তারোপ করবে যে, মাল কাংখিত গুণ অনুযায়ী পাঠাতে হবে। তবুও যদি

কাংখিত গুণের পরিপন্থি মাল পাঠায় তাহলে তার জিম্মাদার গ্রাহক হবে। ব্যাংকের এ দায়িত্ব বর্তাবে না। কেননা শর্তের পরিপন্থি হওয়ায় ইহা গ্রাহকের পক্ষ থেকে সীমা লংঘন। সীমা লংঘনের অবস্থায় অংশীদার অথবা মুদারিব (শ্রমদাতা) কে জামিন বানানো যেতে পারে।

تمويل بعد الشحن/ Post Shipment Financing

এর পদ্ধতি Bill of Exchange বা হুণ্ডির বাট্টা ধার্য করার মত।

এক্সপোর্টার মাল পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন তার কাছে ঐ মালের বিল আছে। সে রিল কে ব্যাংকের কাছে সৌপর্দ করে দেয় আর ব্যাংক তার Maturity বা পরিপক্কতাকে সামনে রেখে এর মধ্যে বাট্টা ধার্য করে অবশিষ্ট অর্থ এক্সপোর্টারকে দিয়ে দেয়। এবং পরিপক্কতার (Maturity) তারিখ আসলে ব্যাংক এই অর্থ ইমপোর্টার থেকে গ্রহণ করে। যেমন বিল আব এক্সচেঞ্জের ডিসকাউন্ট সম্পর্কে আলোচনার দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে।

এখানে প্রথমে বিল অব এক্সচেঞ্জের ডিসকাউন্ডের শরয়ী হুকুমের উপর আলোচনা করা হচ্ছে। ডিসকাউন্ডের ফেক্বহী অবস্থান হলো, ঋণদাতা যার হাতে বিল আছে সে, বিলকে ঋণের বাট্টাধার্য কারীর কাছে সোপর্দ করে। এ সোপর্দ করা ঋণের থেকে কম হওয়ার তা অবৈধ। কেননা ইহা (ঋণের সম পরিমাণ না হাওয়ায়) সুদ হয়ে গিয়েছে। এ লেনদেনকে بيع الدين বা ঋণ বিক্রি বলা যায় না কারণ বিক্রয় ও সোপর্দ করার (হাওলা) মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। বিক্রয়ের পর ঋণদাতা মহাজন দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যায় এবং ঋণের সমস্ত অধিকার ঐ ব্যক্তির দিতে প্রত্যাবর্তন করে। যার থেকে ঋণ ক্রয় করা হয়। পক্ষান্তরে হাওলার মধ্যে মুহিল অর্থাৎ যে ঋণী ব্যক্তি আপন দায়ভার অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চায় সে ঋণীই থাকে দায়িত্ব মুক্ত হয় না। মুহতাল বা ঋণদাতা ঋণ না পেলে সে মুহিল অর্থাৎ ঋণীর কাছেই ফিরে যাওয়ার অধিকার রাখে।

বর্তমানে ডিসকাউন্ডের অবস্থা এমনই, বাট্টধার্যকারীর (Discounter) কাছে বিল উসুল না হলে মূল ঋণীর কাছে ফিরে যায়। তাই ইহা بيع الدين من غير من عليه الدين অর্থাৎ ঋণকে ঋণ মুক্ত মানুষের কাছে বিক্রয় করা নয়। বরং حوالة الدين بانقص من الدين অর্থাৎ ঋণকে ঋণের থেকে কমের দ্বারা হাওলা করা। এর বিকল্প অবস্থার জন্য প্রথম দিকে লেখক প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে এখানে দুটি লেনদেন পৃথক করা হবে।

একটি হলো বিলে বাট্টা ধার্য করার পর অবশিষ্ট অর্থ ঋণ নিবে।

দ্বিতীয় হলো তাকে ঋণ উসুলের উকিল বানিয়ে দেবে এবং ঐ উকালতের

পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে দেবে। এখন ব্যাংক উকিল হওয়া হিসাবে ঋণ উসুল করে এর মধ্যে নিজের পারিশ্রামিক নিয়ে নিবে এবং অবশিষ্ট অর্থ ঋণের বদলায় ধরে নেবে। যেমন একশ টাকার বিল হলে ব্যাংক নব্বই টাকা ঋণ দিয়ে দেবে এবং ব্যাংককে ঋণ উসুল করার উকিল বানানো হবে যার পারিশ্রামিক দশ টাকা। এখন ব্যাংক বিলের নির্ধারিত একশত টাকা উসুল করে এর মধ্যে দশ টাকা নিজের পারিশ্রামিক রেখে দেবে এবং নব্বই টাকা ঋণের বদলা ধরে নেবে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে দুটি কথা চিন্তার বিষয়।

এক. সাধারণত উকালতের পারিশ্রামিক বিলের অর্থের পরিমাণের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে। বিলের অর্থ বেশী হলে পারিশ্রামিক বেশী হবে, অর্থ কম হলে পারিশ্রামিক কম হবে।

দুই. পারিশ্রামিক কে মেয়াদের সাথেও সম্পৃক্ত করা হবে। বিলের পরিপক্কতা বেশী দিন পরে হলে পারিশ্রামিক বেশী হবে পরিপক্কতা অল্প দিনে হলে পারিশ্রামিক কম হবে। এখানে চিন্তার বিষয় হলো পারিশ্রামিক কে অর্থের পরিমাণের সাথে এবং পরিপক্কতার সাথে সম্পৃক্ত করা বৈধ কি না? পারিশ্রামিক কে অর্থের পরিমাণের সাথে সম্পৃক্ত করা বৈধ মনে হয় কেননা দালালীর পারিশ্রামিক মালের সাথে মিলানোর মধ্যে মতনৈক্য আছে, কিন্তু আল্লামা শামী বৈধতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (দুররুল মুখতার খন্ড ৬ পৃষ্ঠা ৬২)

অর্থাৎ দালাল বেশী দামের মাল বিক্রয় করলে বেশী পারিশ্রামিক, কম দামের মাল বিক্রয় করলে কম পারিশ্রামিক নিতে পারবে। এর যে কারণ আল্লামা শামী লিখেছেন এর সার হলো যদিও মালের কম বেশীতে দালালের শ্রম ও কাজ সমান কিন্তু পারিশ্রামিক নির্ধারণ করতে গিয়ে শুধু শ্রম ও কাজকে দেখা হবে না বরং কাজের মান ও প্রকারও দেখতে হবে।

কম দামের জিনিসের দালালীর মান কম, বেশী দামী জিনিসের দালালীর মান বেশী। সে হিসেবে পারিশ্রামিকের মধ্যেও কম বেশী হতে পারে।

(দুররুল মুখতার, খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ৭২)

এর উপর আন্দাজ করে উকালতের পারিশ্রামিক কে অর্থের পরিমাণের সাথে সম্পৃক্ত করার অবকাশ বের হয়। কিন্তু পারিশ্রামিককে মেয়াদ ও জামানার সাথে সম্পৃক্ত করার কোন বৈধতা বুঝা যায় না। বিনা সুদে ঋণ দিয়ে ঋণের মেয়াদের হিসাবে উকালতের পরিশ্রামিক উসুল করে নেয়া হয়েছে অর্থাৎ যে সুদ ঋণের উপর নেয়া সম্ভব নয় তা ওকালতের পারিশ্রামিক বৃদ্ধি করে উসুল করে নেয়া হয়েছে এ জন্য এ প্রস্তাব পছন্দনীয় নয়। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত تمويل بعد الشحن / Post Shipment Financing এর স্পষ্ট কোন শরয়ী রূপ রেখা সামনে না আসবে

ততক্ষন এ ধরনের বিনিয়োগ বন্ধ রাখা হবে। এবং সমস্ত লেনদেন تمويل قبل / الشحن। Pre Shiponent Financing এর ভিত্তিতে করা হবে। যদি রপ্তানির অর্থ পাওয়ার পূর্বেই রপ্তানিকারকের অর্থের প্রয়োজন হয় তখন সে ব্যাংক থেকে নতুন কোন মুশারাকা, মুদারাবা অথবা মুরাবাহা করতে পারে।

Export Refinancing Scheme / اعادة تمويل الصادرات এর হুকুম ঃ

আমদানি রপ্তানিতে ব্যাংকের ভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদানের জন্য একটি স্কিম চালু করেছে যাকে Export Refinancing Scheme /اعادة تمويل الصادرات বলে। ঐ স্কিমের দুটি পদ্ধতির পরিস্কার আলোচনাও করা হয়েছে। এখানে এর শরয়ী হুকুমের উপর আলোচনা করা হলো।ঐ স্কিমের প্রথম পদ্ধতি ছিল – কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহকে ঋণ দিত এবং এর উপর শতকরা ৫ টাকা হারে সুদ নিত। এর মধ্যে সুদ হওয়ায় চিন্তার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এ পদ্ধতি শেষ করে যে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে এর মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংককে নিয়মতান্ত্রিক ঋণ দেয় না। বরং তার নামে একাউন্ট খুলে দেয় যার থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের টাকা নেয়ার অধিকার থাকে না।

প্রকৃত পক্ষে ইহা ঋণের লেনদেন নয়। বরং একটি কাগজি কর্মসুচী (কৌতুক) মাত্র। এর উপর কেন্দ্রীয় ব্যাংক ট্রেজারী বিলের হিসাবে যে অর্থ বানিজ্যিক ব্যাংককে প্রদান করে। এর উপরও প্রশ্ন নাই। কেননা উহা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে রপ্তানির প্রতি উৎসাহ সৃষ্টির জন্য প্রাথমিক পুরস্কারের মত। কোন লেনদেনের ফলে নয়। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে শতকরা ৫ টাকা নিয়ে এই লাভ দেয় সাধারণত যা শতকরা ১৩ বা ১৪ ভাগ হয়। এতে অতিরিক্ত সুদের সন্দেহ আছে। তাই যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক শতকরা ৫ ভাগ নেয়া ছেড়ে দেয় এর স্থলে সে তার লাভের পরিমাণ কমিয়ে দেয় যা সে নিজে দিচ্ছে। যেমন শতকরা ১৩ ভাগের স্থলে ৮ ভাগ করে দেয় তবে তার অবকাশ বুঝা যায়। সবচেয়ে স্পষ্ট পদ্ধতি হল যেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য রপ্তানির প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্য ব্যাংককে সাহায্য (Subsidy) দেয়া। যেন সে অল্প লাভ রেখে রপ্তানিতে বিনিয়োগ করে। তাই এর জন্য সরাসরি সাহায্য করাই শ্রেয়।

নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শরয়ী হুকুম ঃ

এর পূর্বে Non Banking Financial Institutions المؤسسات المالية غير المصرفة। এবং এর প্রকার সমুহের সামান্য পরিচিতি বর্ণনা করা হয়েছে।

এ গুলোর মধ্যে অধিকাংশই সুদী প্রতিষ্ঠান। এ গুলোর মৌলিক কাজ পুজি

বিনিয়োগ। তাই সেগুলোকে শরীয়তের নীতি অনুযায়ী পরিচালনা করার পদ্ধতি ও এমন হবে যা ব্যাংকের ব্যাপারে পেশ করা হয়েছে। তবে এখানে ঐ চারটি প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে আলোচনা হওয়া উচিত যে গুলিকে "ইসলামী নযরিয়াতী কাউন্সিল" সর্ব প্রথম সুদ মুক্ত করার জন্য নির্বাচন করেছিল।

(1) N.I.T. (2) I.C.P. (3) H.B.F.C. (4) Small Industris Finance Corporation ইসলামী নয্রিয়াতী কাউন্সিল সর্ব প্রথম এ ব্যাপারে যে প্রস্তাব পেশ করে ছিল তা তুলে ধরা হল।

1. N.I.T.

প্রথমে বলা হয়েছে এই প্রতিষ্ঠান N.I.T.(National Investment Trust) দশ টাকার উপর লিখিত মূল্যের (Vace Value) ইউনিট চালু করে। মানুষ ইউনিট নিয়ে তাদের অর্থ জমা করে। এ সমস্ত অর্থের দ্বারা যে ফান্ড তৈরী হয় এর দ্বারা পুজি বিনিয়োগ করা হয়। লাভ হলে ইউনিট হোল্ডারদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়। এর নীতির উপর চিন্তা করলে দুটি বিষয় প্রশ্নের সম্মুখিন হয়। একটি হলো N.I.T. এর অধিকাংশ পুজিবিনিয়োগ শেয়ারদের মধ্যে হয়ে থাকে। এতে সব ধরনের কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করা হয়। ব্যাংক ও সুদী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার এবং এমন কোম্পানীর শেয়ারও নেয়া হয় যে গুলোর মৌলিক কারবার হারাম। এর সংশোধনের জন্য N.I.T.কে এ ব্যাপারে বাধ্য করা হয়েছে যে সুদী ও হারাম কারবারী প্রতিষ্ঠান সমুহ ও কোম্পানীর শেয়ার নেয়া হবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল N.I.T. এর ইউনিট হোল্ডার কে নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য সরকার দায়িত্ব নিয়ে ছিল যে যদি ক্ষতি হয় তাহলে সরকার আদায় করবে। বরং লাভ না হলে শতকরা আড়াই টাকা হারে সরকার লাভ দিবে। যখন সরকার নিজেও এন আই টিতে একজন অংশীদার। এক অংশীদার অন্যান্য অংশীদার দের জন্য লাভ ক্ষতির জামিন হওয়া বৈধ নয়। এ সমস্যার সমাধানে এ প্রস্তাব উথাপন করা হয়েছে যে সরকার N.I.T. থেকে তার অংশ নিঃশেষ করে দেবে। তাহলে আর অংশীদার হিসাবে জামিন থাকবে না। বরং তৃতীয় পক্ষ হিসাবে জামিন হবে। এখন আলোচনার বিষয় হলো তৃতীয় পক্ষ হিসাবে লাভ না হলে শতকরা আড়াই টাকা আর ক্ষতি হলে ক্ষতির জামিন হওয়া বৈধ কি না?

হানাফি ফেকার দৃষ্টিকোণ থেকে এর কোন অবকাশ নাই। কারণ

১. কাফালত, জামানত ঐ অধিকারের মধ্যে বৈধ যা নিজে আবশ্যক ও ক্ষতি পুরণীয় হয়। এ কারনেই وديعت (আমানত) এবং عاريت (ধার প্রদান) এর মধ্যে জামানত বৈধ নয়। শিরকত ও মুদারাবায় পুজি ক্ষতিপূরণীয় হয় না। তাই তার ক্ষতির জামানত কার্যকারী ও পালনীয় হবে না। এটি শুধু একটি অঙ্গিকার যা আদালতের দৃষ্টিতে পালনীয় নয়।

২. হিদায়া ইত্যাদি কিতাব আছে ضمان الخسران باطل যার সারকথা হলো কোন ব্যক্তি যদি কাউকে বলে যে তুমি এই চুক্তি বা কারবার কর। ক্ষতিগ্রস্থ হলে আমি জামিন হব। তাহলে জামানত বাতিল বলে গন্য হবে কার্যকারী হবে না। মালেকীদের মতে তৃতীয় ব্যক্তির এমন জামানত আদালতের দৃষ্টিতে পালনীয় হতে পারে। মালেকীদের মাযহাব হলো -এমন ওয়াদা যার কারণে ওয়াদা কৃত ব্যক্তিকে কোন দায়িত্বে প্রবেশ করানো হয়েছে বা কোন কাজে উৎসাহিত করা হয়েছে তা আদালতের দৃষ্টিতেও পালনীয় হয়ে যায়। এর আলোকে বলা যায় যে এখানে সরকার তৃতীয় পক্ষ হওয়া হিসাবে শতকরা আড়াই টাকা হারে লাভ ও ক্ষতি না হওয়ার জামানত দিয়ে জনসাধরণ কে N.I.T.তে অংশীদার হওয়ার দাওয়াত দেবে। এ জন্য এ জামানত আদালতের দৃষ্টিতে ও কার্যকারী হবে। তাই তৃতীয় পক্ষের জামানত কে কার্যকারী করে সরকারের অংশ N.I.T.থেকে শেষ করে দেয়া হয়েছে এবং ঐ জামানত কে কার্যকারী সাব্যস্থ করা হয়েছে। এ কারণেই N.I.T. এর ইশতেহারে লিখিত থাকে শতকরা আড়াই টাকা হারে লাভ নিশ্চিত। এই প্রস্তাবের আলোকে সরকারের পক্ষ থেকে আহকাম চালু করা হয়েছে , এবং প্রথমে এন,আই, টি, সে মুতাবিক কাজও করেছে কিন্ত পরবর্তীতে দেখ ভাল না হওয়ায় এন,আই,.টি, তে পরিবর্তন এসেছে। তা আবার শরীয়ত বিবর্জিত পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। এন,আই.টিতে .আস্তে আস্তে পুজির পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার বিনিয়োগ শুধু শেয়ারে যথেষ্ট হয়নি। তখন এন,আই, টি আরো কয়েকটি পদ্ধতি তে পুজি বিনিয়োগ আরম্ভ করেছে যা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। যেমনঃ-

১,মার্ক আপের (Mark up) উপর কারবার শুরু করে দিয়েছে এবং মার্ক আপের ঐ সমস্ত শরীয়ত বিবর্জিত পদ্ধতি গ্রহন করা হয়েছে যা ব্যাংক সমূহে চলে।

২,ব্যাংকের মত ইজারা আরম্ভ করে দিয়েছে যার মধ্যে ঐ সমস্ত শরয়ী বক্রতা আছে যা পুর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

৩,P.T.C. এর অবৈধ রূপ ধারণ করা হয়েছে। পি,টি.সির বাস্তবতা ও পটভুমি বুঝাও এখানে জরুরী। "ইসলামী নাযরিয়াতী কাউন্সিল " অর্থনীতিকে সুদ মুক্ত করার যে প্রস্তাব পেশ করেছিল এর মধ্যে P.T.C এর প্রস্তাব ও অর্ন্তভূক্তি ছিল। যার সারমর্ম হলো- পূর্বেই বলা হয়েছে যে কখনো কোম্পানীর পুজি বিনিয়োগের জন্য বন্ড চালু করতে হয় যা সুদ ভিত্তিক হয়। এর বিকল্প হিসাবে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল যে কোম্পানী মুদারাবা প্রমান পত্র চালু করবে। যার নাম Participation term certificate হবে। ইহা নিদিষ্ট সময়ের জন্য মুদারাবা সার্টিফিকেট। যে ব্যক্তি এ সার্টিফিকেট অর্জন করবে সে নিদিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত

কোম্পানীর আসবাব পত্রের শরীক হয়ে যাবে। প্রয়োজনে সে নিজের অংশ বিক্রয়ও করে দিতে পারে। এ প্রস্তাব পরবর্তীতে কোম্পানীর মৌলিক নিয়ম কানুনে পরিনত হয়েছে এবং বিভিন্ন কোম্পানী পি. টি. সি চালু করেছে। এন, আই, টি. ও চালু করা আরম্ভ করেছে। কিন্তু এর মধ্যে অনেক এলোমেলো পরিবর্তন করে চালু করেছে যার কারণে অবৈধ রূপ ধারণ করেছে।

৪. দীর্ঘ মেয়াদী পুজি বিনিয়োগের জন্য T.F.C.চালু করা হয়েছে অর্থাৎ P.T.C.এর সাথে মিলিত হয়ে প্রমান পত্র চালু করা হয়েছে যার নাম Term finane Certificate ছিল পরবর্তীতে N.I.T. এর কারবারে কিছু সংশোধন হয়েছে । যার মধ্যে মুরাবাহা এবং ইজারার চুক্তি সমুহ Agreements ঠিক করে দেয়া হয়েছে. P.T.C. শেষ করে দেয়া হয়েছে এবং T.F.C. মুরাবাহায় রূপান্তরিত করা হয়েছে তবে এখনো N.I. T. এর দুটি পথ অবৈধ আছে প্রথমটি হলো ব্যাংকগুলির P.L.S.একাউন্টে অর্থ সঞ্চয় করা হয় যার সুদ আসে । দ্বিতীয়টি হলো P.T.C.আগামীর জন্য শেষ করা হয়েছে বটেই কিন্তু প্রথম থেকে যা চালু হয়ে আসছে এগুলোর কিছুর পরিপক্কতা (Maturity) হয়নি অর্থাৎ তার মেয়াদ পুরো হয়নি।

এজন্য ফরমে এ দিকটাও রেখে দেয়া হয়েছে যে, "আমি P.L.S এবং P.T.C এর আয় নিতে ইচ্ছুক নই।" ফরমে একথা লিখার পর N.I.T ইউনিক নেয়ার অবকাশ সৃষ্টি হয়। কিন্তু এখনো কার্যত সঠিক হওয়ার কোন নিশ্চয়তা নাই। যতক্ষণ না রক্ষণাবেক্ষণের কোন ব্যবস্থা হয়।

(২) I.C.P (Invest corporation of pakistan) এর পরিচিতি প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে। এর পুজি বিনিয়োগ শুধু কোম্পানীর শেয়ার কেনায় হয়ে থাকে। নীতিগতভাবে একে বাধ্য করা হয়েছিল যে, শুধু এমন কোম্পানীগুলোর শেয়ার নেয়া হবে যার কারবার মৌলিকভাবে বৈধ। কিন্তু কার্যত তা হচ্ছে কি না? ব্যালেন্সসীট ইত্যাদি দেখে হুকুম বলা উচিত।

(৩) Small Industris Finance Corporation এ প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র শিল্পের পুঁজি বিনিয়োগের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রথমে সুদ ভিত্তিক ঋণ দিত। ইসলামী নযরিয়াতী কাউন্সিল মুরাবাহা ইজারা ইত্যাদিতে বিনিয়োগের সুপারিশ করেছে।

(৪) H.B.F.C (House Building Finace corporation) এ প্রতিষ্ঠান বাড়ী তৈরী বা ক্রয় করার জন্য পুজির যোগান দেয়। পশ্চিমা পন্থী প্রতিষ্ঠানগুলো সুদের ভিত্তিতে ঋণ দেয় এবং বাড়ী বন্ধক রাখে। ইসলামী নযরিয়াতী কাউন্সিল House Finaced এর জন্য যে প্রস্তাব পেশ করেছে তা একটি নতুন ধরনের চুক্তি যাকে شركة متناقصة (Decreasing partnership) ক্ষীয়মান অংশীদারিত্ব

বলে। সার কথা হলো বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এবং খদ্দের (Client) অর্থাৎ বাড়ী তৈরীতে ইচ্ছুক উভয়ের যৌথ পুজি দ্বারা বাড়ী তৈরী বা ক্রয় করা হবে। উভয়ের মাঝে নিজ নিজ পুজি অনুপাতে বাড়ীর মালিকানা হবে। যেমন ২৫ ভাগ পুজি মক্কেলের আর ৭৫ ভাগ প্রতিষ্ঠানের। তাহলে উভয়ে বাড়িটির ৪ ভাগে অংশীদার হবে। এক চতুর্থাংশ খদ্দেরের অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশ প্রতিষ্ঠানের হবে।

বাড়ী তৈরীর পর খদ্দের কর্পোরেশনের অংশের ভাড়াটিয়া হিসাবে থাকবে এবং কর্পোরেশনকে ভাড়া আদায় করবে। এর সাথে সাথে বিভিন্ন সময়ে কর্পোরেশনের অংশ অল্প অল্প করে ক্রয় করতে থাকবে। এ উদ্দেশ্যে কর্পোরেশনের অংশের বিভিন্ন ইউনিট বানানো হয়। যেমন কর্পোরেশনের অংশ ১০ ইউনিটে ক্রয় করা যাবে। এক একটি ইউনিট কেনার ফলে কর্পোরেশনের অংশ কম হতে থাকবে। এই অনুপাতে ভাড়াও কম হতে থাকবে। খদ্দের কর্পোরেশনের সমস্ত অংশ ক্রয় করে নিলে কর্পোরেশনের মালিকানা শেষ হয়ে যাবে এবং খদ্দের সমস্ত বাড়ীর মালিক হয়ে যাবে। এখন ভাড়াও আর দিতে হবে না।

ফেক্বার দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে তিনটি চুক্তি

(১) মালিকানার অংশিদারিত্ব

(২) ইজারা

(৩) বিক্রি

প্রত্যেকটি চুক্তি পূর্বের শর্ত ছাড়া পৃথক পৃথক হলে এর বৈধতার মধ্যে কোন সমস্যা নাই। কিন্তু কার্যত এখানে একটি চুক্তির মধ্যে তিন চুক্তি একটি অপরটির সাথে শর্তযুক্ত অথবা المعروف كالمشهور। প্রসিদ্ধ ব্যাপার শর্ত না করলেও শর্তের মতই এ নীতি অনুযায়ী শর্তযুক্ত। এমন চুক্তি ছাড়া কোন পথও নাই। এ ব্যাপারটি ফিক্বাহর দৃষ্টিতে চিন্তার বিষয়। এখানে বুঝা উচিত যে, এক চুক্তিতে আরেক চুক্তির শর্ত করা ঐ সময় অবৈধ যখন এক চুক্তির মধ্যে আরেক চুক্তির শর্ত করা হয়। কিন্তু যদি অবস্থা এমন হয় যে একবারে কয়েকটি চুক্তিকে এমন ভাবে একত্রিত করা হয়েছে যে এখানো কোন চুক্তি পুরা হয়নি বরং এখন পুরা হওয়ার চুক্তি হচ্ছে। অতঃপর ঐ চুক্তিগুলো নিজ নিজ স্থানে স্ব স্ব সময়ে পুরা হবে এবং এগুলোর মধ্যে কোন চুক্তি কার্যত হচ্ছে সে সময় অন্য চুক্তির কোন শর্ত হবে না। তাহলে এমতাবস্থায় صفقة فى صفقة অথবা بيع وشرط অর্থাৎ এক চুক্তির মধ্যে আরেক চুক্তির আহকাম জারী হবে না। এর উদাহরণ بيع بالوفاء (পুরা করে দেয়ার শর্ত) এর মত। যার ব্যাপারে ফুকাহাদের মধ্যে মতানৈক্য আছে বিশুদ্ধ কথা হলো وفاء এর শর্ত বিক্রয়ের মধ্যে হলে অবৈধ। কিন্তু যদি

বিক্রয় শর্তহীন হয় এবং وفاء এর চুক্তি ভিন্নভাবে করা হয় তাহলে বৈধ এবং وفاء এর চুক্তি আদালতের দৃষ্টিতেও আবশ্যক হবে, বিক্রয়ের পরে এর বৈধতা অনেক ফুকাহা লিখেছেন। বিক্রয়ের পূর্বে وفاء এর অঙ্গিকারের কার্যকারিতা

جامع الفصولين কিতাবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। এর দ্বারা জানা গেল যে এক চুক্তির মধ্যে আরেক চুক্তি করা বৈধ নয়। কিন্তু চুক্তির পূর্বে অথবা পরে অন্য চুক্তির চুক্তি করা বৈধ। শর্ত করা এবং অঙ্গিকারের মধ্যে পার্থক্য হলো চুক্তির মধ্যে শর্ত করার দ্বারা বিক্রয়ের বাস্তবায়নই অন্য চুক্তির সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ যদি অন্য চুক্তি বাস্তবায়ন হয় তাহলে বিক্রয় বাস্তবায়ন হবে। নতুবা বিক্রয় বাস্তবায়ন হবে না। অথবা বিক্রয় এমন চুক্তি যা অন্যের উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু ভিন্নভাবে অংগীকার করলে বিক্রয় অন্যের উপর নির্ভরশীল হয় না। এ আলোচনার ভিত্তিতে شركة متناقضة ক্ষীয়মান অংশীদারিত্বের বৈধতা বুঝা যায়। কেননা প্রথমে একবারে তিন চুক্তির চুক্তি হয়ে যায় অতঃপর প্রত্যেক চুক্তি স্ব-স্ব সময়ে কোন শর্তছাড়া সমাধা হতে থাকে। তাই উল্লেখিত প্রস্তাব অনুযায়ী যদি House Financed এর কাজ করা হয় তাহলে বৈধ হবে। কিন্তু এখানেও সার্বক্ষনিক তত্বাবধানের অভাবে কার্যত অনেক শরীয়ত ভিত্তিক অসুবিধা সৃষ্টি হয়। তাই House Building Finance Corporation বর্তমানে যেভাবে কাজ করছে এতে অনেক শরয়ী অসুবিধা বিরাজমান। House Financed কে আরবীতে التمويل العقارى বলে। এ শিরোনামে লেখকের ভিন্ন একটি প্রবন্ধ আছে যা

بحوث فى قضايا فقهية معاصرة নামে আরবী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। কানাডায় House Financed এর একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জনগণ এর সদস্য হয় এবং সদস্যরাই এর থেকে পুজি অর্জন করে বাড়ী তৈরী করে বা ক্রয় করে। এর উপকারিতা হলো সোসাইটির লাভ সদস্যরা পেয়ে থাকে এবং সদস্যরাই উপকৃত হয়।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ বীমা (Insurance)

বর্তমান কারবারে বীমা একটি বড় অংশ দখল করে আছে। কোন বড় ব্যবসা এর থেকে বাইরে নয়। বীমার সারমর্ম হলো–মানুষ ভবিষ্যতে যে বিপদের সম্মুখীন হয় কোন মানুষ বা দপ্তর এ মর্মে তার জিম্মাদারী গ্রহণ করে যে, অমুক বিপদের অর্থনৈতিক সংকটের ক্ষতি পূরণ আমি দেব। ইংরেজী ১৪ শতকের শুরুতে এর আবির্ভাব হয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্যে সামুদ্রিক জাহাজে মাল পাঠানো হতো। অনেক সময় জাহাজ ডুবে যেত। মালের ক্ষতি হতো। সামুদ্রিক জাহাজের ক্ষতি পূরণের জন্য প্রথমে বীমার সূচনা হয়।

আল্লামা শামী মুসতামিন" (নিরাপত্তা কামী) অধ্যায়ের سوكره এর নামে এতে উল্লেখ করেছেন। যে বিপদগুলোর বিপরীতে বীমা করা হয় সে বিপদগুলোর দিক লক্ষ্য করে বীমা তিন প্রকার ঃ

১. অস্থাবর সম্পদ বীমা تامين الاشياء যে কোন সামগ্রীর উপর বীমা করতে চায় সে নির্দিষ্ট শর্তানুসারে বীমা কোম্পানীকে ফিস দিতে থাকে যাকে প্রিমিয়াম -(Premium) বলা হয়। সাধারণত প্রিমিয়াম কিস্তিতে আদায় করা হয় এজন্য একে আরবীতে (قسط) বলা হয়। এ সামগ্রীর দুর্ঘটনা এসে গেলে কোম্পানী তার ক্ষতি পূরণ দেয়। যদি বীমাকৃত সামগ্রীর কোন দুর্ঘটনা না ঘটে তাহলে বীমাগ্রাহক আদায়কৃত প্রিমিয়াম ফিরে পায় না। তবে দূর্ঘটনা ঘটে গেলে বীমা গ্রাহক জমাকৃত প্রিমিয়াম পায় যার মাধ্যমে সে ক্ষতি পূরণ করতে পারে। জাহাজের বীমা, গাড়ীর বীমা, বাড়ীর বীমা ইত্যাদি এরই অন্তর্ভূক্ত।

২। তৃতীয় পক্ষ বীমা (تامين المسؤلية) যার উপর ভবিষ্যতে কোন দায়িত্ব আসতে পারে এ দায়িত্ব এড়ানোর জন্য বীমা করা হয়। যেমন, গাড়ী রোডে চললে কোন দুর্ঘটনায় অপরের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এমন অবস্থায় গাড়ী চালকের অর্থনৈতিক জরিপানা দিতে হয় এর বীমা করা যায়। দুর্ঘটনার সময় বীমা কোম্পানী এর জরিপানা আদায় করে। সাধারণত একে (Third Party Insurance) থার্ড পার্টি ইন্সুরন্স বলে। আমাদের দেশে গাড়ী রাস্তায় নামানোর জন্য এ ইন্সুরেন্স আইনগত ভাবে জরুরী।

কিছু কিছু পশ্চিমা দেশে এমনও আছে যেখানে কোন ব্যক্তির নিজ বাড়ীর সামনে বরফ পরিস্কার না করার কারণে অন্য কেহ পিছলে পড়ে শারীরীক ক্ষতিগ্রস্থ হলে বাড়ীর মালিকের উপর মুকাদ্দামা দায়ের করে মোটা অংকের জরিপানা আদায় করে। এ আশংকা থেকে বাঁচার জন্য বাড়ির মালিকগণ বীমা করে থাকে। ইহাও (تامين المسؤلية) এর এক প্রকার। এর মধ্যে জরিপানা আদায় করতে হলে বীমা কোম্পানী আদায় করে।

৩. জীবন বীমা تأمين الحياة (Life Insurance) বীমা কোম্পানী গ্রাহকের নিকট থেকে চুক্তি করে যে, যদি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে গ্রাহক মৃত্যুবরণ করে তাহলে বীমা কোম্পানী চুক্তিকৃত অর্থ তার উত্তরাধীকারীদের পরিশোধ করবে। এর বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে কোন অবস্থায় মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হয়। অর্থাৎ এর মধ্যে মৃত্যুবরণ করলে বীমার অর্থ উত্তরাধিকারীগণ পাবে। কিন্তু মৃত্যুবরণ না করলে মেয়াদ শেষ হওয়ায় বীমা শেষ হয়ে যাবে এবং সুদসহ মূল টাকা ফিরে পাবে। অনেক সময় মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হয় না অর্থাৎ যখনই মৃত্যুবরণ করবে বীমার অর্থ উত্তরাধিকারীগণ পাবে। অস্থাবর সম্পদ বীমা ও জীবন বীমার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো অস্থাবর সম্পদ বীমায় দুর্ঘটনা না ঘটলে আদায়কৃত প্রিমিয়াম ফিরে পায় না। জীবন বীমা নির্দিষ্ট মেয়াদে মৃত্যুবরণ না করলে সুদসহ জমাকৃত অর্থ ফেরৎ পায়। বীমা কর্ম পদ্ধতি ও গঠন প্রণালী হিসেবে আবার ৩ প্রকার।

১. التأمين الاجتماعي গ্রুপ বীমা ঃ

রাষ্ট্র এমন পদ্ধতি গ্রহণ করে যার মাধ্যমে নাগরিকদের কোন এক গ্রুপের নিজস্ব কোন দুর্ঘটনা বা বিপদে ক্ষতিপূরণ বা কোন উপকার করা সহজ হয়। একে গ্রুপ ইন্সুরেন্স বলে। যেমন কর্মচারীদের বেতন থেকে সামান্য কিছু প্রতি মাসে কেঁটে রেখে একটি ফান্ডে জমা করা হয়। এরপর কোন কর্মচারীর মৃত্যু বা বিপদে মোটা অংকের টাকা তার উত্তরাধিকারীদের বা কর্মচারীকেই আদায় করা হয়। এ পদ্ধতির বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে। সবার উপর এজমালী হুকুম দেয়া মুশকিল। কেননা প্রত্যেক অবস্থার হুকুম ভিন্ন ভিন্ন।

সাধারণ বীমা ঃ (Mutual Insurance) সাধারণ বীমা বলা হয় ঐ সমস্ত মানুষ যাদের দুর্ঘটনা একই প্রকারের হয়ে থাকে তারা পরস্পরে মিলে একটি ফান্ড তৈরি করে নেয় এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে আমাদের মধ্যে কাউরো কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেলে তার ক্ষতি পূরণ করা হবে। এ ফান্ডে শুধু সদস্যদের টাকা থাকে। ক্ষতি পূরণও শুধু সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বছর শেষে হিসাব করে যদি আদায়কৃত অর্থ ফান্ডের অর্থ থেকে বেড়ে যায় তখন সে হিসাবে সদস্যদের থেকে অতিরিক্ত অর্থ উঠিয়ে নেয়া হয়। আর যদি ফান্ডে অর্থ বেঁচে যায় তাহলে সদস্যদের ফেরৎ দেয়া হয় অথবা আগামী বৎসরের জন্য ফান্ডে জমা রাখা হয়।

৩. বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বীমা (Commercial Insurance) এর পদ্ধতি হলো—বীমা কোম্পানী বীমার মাধ্যমে ব্যবসা করার জন্য স্থাপন করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য বীমার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন। যেমন অন্যান্য কোম্পানী বিভিন্ন কারবার দ্বারা লাভবান হয়। এ কোম্পানী বিভিন্ন প্রকার বীমার স্কীম চালু করে, যে বীমার গ্রাহক হতে চায় তার সঙ্গে বীমা কোম্পানীর চুক্তি হয় যে, এই পরিমাণ টাকার এতগুলো প্রিমিয়াম আদায় করবেন এবং ক্ষতিগ্রস্থ হলে কোম্পানী আপনার ক্ষতি পূরণ

করবে। কোম্পানী প্রিমিয়াম নির্ধারণ করার জন্য হিসাব করে নেয়, যে দুর্ঘটনার বিপরীতে বীমা করা হচ্ছে তা কত বার হওয়ার সম্ভাবনা রাখে? যেন তার বিনিময় পরিশোধ করে কোম্পানীর লাভ থাকে। ইহা হিসেবের জন্য একটি ভিন্ন বিষয় আছে। এ বিষয়ের পন্ডিতকে একচুরী (Actury) (বীমা কিস্তি ইত্যাদির হার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি) বলে। এ ধরনের বীমার প্রচলনই বেশী। এর শরয়ী হুকুম নির্ধারণ সমসাময়িক ওলামাদের মধ্যে বিশেষ আলোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। এ সম্বন্ধে ওলামায়ে আরবদের মধ্যে শাইখ আবু জোহরা এবং মুস্তফা আজ্‌জুরকা উভয়ের মধ্যে প্রচন্ড মতনৈক্য হয়েছে। শাইখ আবু জোহরা এর অবৈধতার প্রবক্তা ছিলেন আর মোস্তফা জুরকা ছিলেন বৈধতার প্রবক্তা।

সে সময় ইসলামী বিশ্বের প্রসিদ্ধ প্রায় সকল উলামায়ে কিরামই অবৈধতার প্রবক্তা তবে প্রসিদ্ধ ওলামার মধ্যে শুধু দুজন বৈধ বলেছেন। একজন হলেন শাইখ মুস্তফা জুরকা দ্বিতীয়জন হলেন শাইখ আলী হাকীফ। অধিকাংশ ওলামার সূত্র হলো বীমায় জুয়া এবং সুদ আছে। জুয়া এজন্য যে, এখানে এক পক্ষের আদায় করা নির্দিষ্ট অপর পক্ষের সন্দেহযুক্ত। যে প্রিমিয়াম আদায় করা হয় সব গচ্ছাও যেতে পারে এর বেশীও পেতে পারে। একেই জুয়া বলে। আর সুদ এজন্য যে, টাকার বিনিময়ে টাকা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং এর মধ্যে কম বেশী হচ্ছে। অর্থাৎ কোম্পানীর পক্ষ থেকে অল্প অর্থ দেয়া হচ্ছে এবং সে বেশী পাচ্ছে তবে জীবন বীমার জুয়া নাই। কেননা সেখানে গ্রাহক অবশ্যই অর্থ ফেরৎ পাচ্ছে। তবে সুদ ও অনির্দিষ্ট বস্তুর ক্রয় বিক্রয় আছে। সুদ সাধারণ ভাবেই বোঝা যাচ্ছে। অনির্দিষ্ট বস্তুর ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাখ্যা হলো চুক্তির ভিত্তি অর্থাৎ কোন একটির অজানা হওয়া অথবা কোন অজানা ও অনির্দিষ্ট ঘটনার উপর নির্ভরশীল হওয়া। এখানে জানা নাই যে, কত টাকা ফিরে পাবে? এমনও হতে পারে যে, দুর্ঘটনার সময় বেশী অর্থ পেয়ে যাবে। মুস্তফা জুরকা এবং শাইখ আলী হাকীফের প্রমাণাদীর বিস্তারিত বিবরণ এখানে আলোচনা সম্ভব নয়। তবে তাঁদের প্রমাণাদীর মূল সার পেশ করা হলো ঃ

প্রথম প্রমাণ ঃ ১. জুয়া ও বীমার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। জুয়া নিয়মতান্ত্রিক চুক্তি নয়। শুধু ক্রীড়া ও কৌতুক মাত্র। পক্ষান্তরে বীমা নিয়মতান্ত্রিক চুক্তি ও গাম্ভীর্যপূর্ণ।

জবাব ঃ এ চুক্তি জুয়া, সুদ এবং ধোকা হওয়া পরিষ্কার। জুয়া হওয়ার জন্য ক্রীড়া, কৌতুক হওয়া অপরিহার্য নয়। গাম্ভীর্যপূর্ণ হলেও জুয়া হতে পারে।

দ্বিতীয় প্রমাণ ঃ এখানে ঐ টাকার উপর চুক্তি করা হয় না যা কোম্পানী দুর্ঘটনার সময় আদায় করে বরং নিরাপত্তার উপর চুক্তি করা হয় যা বীমার মাধ্যমে অর্জন হয়। নিরাপত্তার প্রতিদান দেয়া বৈধ। যেমন চকিদার। চকিদার নিরাপত্তা প্রদানের কারণে বেতন পায়।

জবাব ঃ এখানে নিরাপত্তার উপর চুক্তি হয় নাই বরং চুক্তি হয়েছে টাকার উপর তবে নিরাপত্তা এর ফল। চকিদারের উদাহরণে চকিদারের কাজের উপর

চুক্তি হয়। নিরপত্তা এর ফল মাত্র। চকিদারের কাজের উপর চুক্তি করা যায় বিধায় তা বৈধ। কিন্তু টাকার উপর চুক্তি করলে সমতা শর্ত যা বীমায় পাওয়া যায় না।

তৃতীয় প্রমাণ ঃ

সাধারণত বীমাকে (Mutual Insurance) সকল ওলামায়ে কিরামই বৈধ বলেন। বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বীমা (Commercial Insurance) উহারই একটি প্রশস্তরূপ। বড় মাপে মানুষদের সদস্য তৈরীর সুবাদে একটি প্রশস্ত দপ্তরের রূপ দেয়া হয়েছে এবং ব্যবস্থাকারীগণ ব্যবস্থাপনার বিনিময় লাভ করেন। বীমা কোম্পানী যে লাভ ভোগ করে তা ব্যবস্থাপনার বিনিময়। সার কথা হলো বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বীমাও সাধারণ বীমার মতই।

এর জবাবঃ সাধারণ বীমা একটি দান। আর ব্যবসা সম্বন্ধীয় বীমা পরস্পরের বিনিময়। দানে অনির্দিষ্ট বস্তুর ক্রয় বিক্রয় সহনীয়। কিন্তু বিনিময়ে তা সহনীয় নয়।

চতুর্থ প্রমাণ ঃ

বীমা একটি আধুনিক চুক্তি। চুক্তিতে লাভ হওয়াই স্বাভাবিক যতক্ষণ এতে শরয়ী কোন অবৈধতা অনুপ্রবেশ না করে। বীমার যে অর্থ আমরা করেছি এত কোন অবৈধতা নাই। তাই তা বৈধ।

উত্তর ঃ এর শরয়ী অবৈধতা জুয়া, সুদ, অনির্দিষ্ট বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। তাই এখানে স্বাভাবিকতার নীতি চলবে না।

বীমার বিকল্প

বীমার বিকল্প হিসাবে একটি হলো সাধারণ বীমা। (Mutual Insurence) যেখানে অংশীদারগণ স্ব-স্ব ইচ্ছানুযায়ী ফান্ডে টাকা জমা করে। সারা বৎসরে যাদের দুর্ঘটনা ঘটে এ ফান্ড থেকে তাদের সাহায্য করা হয়। বৎসর শেষে টাকা বেঁচে গেলে অংশীদারগণ যোগানের ভিত্তিতে টাকা ফেরৎ নেয়। অথবা আগামী সালের ফান্ডের জন্য চাঁদা হিসাবে রেখে দেয়। এছাড়াও ইসলামী বিশ্বের কয়েকটি দেশে তাকাফুল প্রকল্পের নামে বিভিন্ন কোম্পানী চালু হয়েছে। এগুলো ব্যবসায়ী বীমার পরিবর্তে স্থাপিত হয়েছে।

এগুলোর মৌলিক চিন্তা হলো প্রত্যেক বীমা কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার থাকে। কোম্পানী তার পুজি লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করে এর লভাংশ শেয়ার হোল্ডারদের মাঝে বন্টন করে এবং কোম্পানীর একটি সংরক্ষিত ফান্ড থেকে বীমা গ্রাহকদের ক্ষতি পূরণ দেয়া হয়। এখনো আমার ঐ সব কোম্পানী সম্পর্কে ফেক্বহী দৃষ্টি কোন থেকে চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ হয় নি। তাই এখন আমি এগুলো সম্পর্কে দায়িত্বশীল কথা বলতে পারবো না।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ সরকারী অর্থ ব্যবস্থা (Public Finacing)

এ শিরোনামের উদ্দেশ্য হলো দেশের সামগ্রীক ব্যয় কি? কিভাবে তা নির্ধারণ হয় এবং ব্যয়ের যোগান কিভাবে হয়? আইনানুযায়ী রাষ্ট্র কর আরোপ করে। পার্লামেন্ট ব্যয়ের সীমা নির্ধারণ করে অনুমোদন প্রদান করে। প্রতি বছর রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয় নির্ধারণ করার জন্য যে বিস্তারিত বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে বাজেট বলে। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট, প্রাদেশিক সরকারের বাজেট এবং স্থানীয় ব্যবস্থাপনার বাজেট আলাদা আলাদা হয়। কেন্দ্রীয় বাজেট এবং প্রাদেশিক বাজেটের সমন্বয়েও সামগ্রীক বাজেট তৈরি করা হয়। যাকে Consolidated Bndget বলে। বাজেটের দুটি অংশ থাকে। এক অংশে আগামী অর্থ বছরে বিভিন্ন খাতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হবে তার উল্লেখ থাকে। অন্য অংশে বিভিন্ন উৎস থেকে কিভাবে উক্ত অর্থ সংগ্রহ করে সে ব্যয় নির্বাহ করবে তার উল্লেখ থাকে। যে বাজেটে সরকারের ব্যয়ের চেয়ে আয় কম হয় তাকে ঘাটতি বাজেট বলে। যে বাজেটে ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশী হয় তাকে উদ্বৃত বাজেট বলে। যে বাজেটে আয়-ব্যয়ের পরিমাণ সমান থাকে তাকে সুষম বাজেট বলে।

সরকারী ব্যয় ঃ সরকারী ব্যয় দুই প্রকার।

১. চলতি ব্যয়। অর্থাৎ যার উপকারীতা স্বল্প মেয়াদী বাজেটের মেয়াদ পর্যন্তই সীমিত হয়। যেমন রাষ্টের যে সুদ প্রদান করতে হয় তা এ প্রকারেরই অন্তর্ভূক্ত।

২. উন্নয়ন মূলক ব্যয়।

অর্থাৎ যার উপকারীতা দীর্ঘ মেয়াদী, বাজেটের মেয়াদ পর্যন্ত সীমিত নয়। যেমন সড়ক, পুল, ইত্যাদিতে যে ব্যয় হয়। ২০০২-০৩ অর্থ বছরের বাংলাদেশের বাজেটের ব্যয় নিম্নরূপ। চলতি ব্যয়= ২৫,৬০০ কোটি টাকা। উন্নয়ন মূলক ব্যয়= ১৯,২০০০ কোটি টাকা। মোট ব্যয় =৪৪,৮৫৪ কোটি টাকা।

সরকারী আয় ঃ আয় দুই প্রকার ঃ

(১) করের মাধ্যমে আয়। (২) কর বহির্ভূত আয়।

করের মাধ্যমে আয় অর্থাৎ এমন আয় যা করের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

কর আবার দুই প্রকার–

(১) প্রত্যক্ষ কর (Direct tax) ঃ যে কর আরোপ করলে কর দাতা করের আর্থিক বোঝা নিজেই বহন করে, অন্যের ঘাড়ে চাপাতে পারে না তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে। যেমন আয়কর, বেতন কর, জমিজমার কর ইত্যাদি।

(২) পরোক্ষ কর (Indirect tax) ঃ যে করে দাতা প্রাথমিক পর্যায়ে করের আর্থিক বোঝা বহন করলেও শেষ পর্যন্ত সে আংশিক বা সম্পূর্ণ ব্যয় ভার অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয় তাকে পরোক্ষ কর বলে। যেমন দোকান ও কারখানার উপর আরোপিত কর। দোকান ও কারখানার মালিক পরে বর্ধিত দামের মাধ্যমে তার উপর আরোপিত করের বোঝা ক্রেতাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারে। অথবা সেল্‌স কর যা দোকানের মালিকের নিকট থেকে নেয়া হয় কিন্তু মালিক বিক্রয়ের সময় ক্রেতাদের থেকে এ কর আদায় করে নেয়। অর্থনীতিতে করের নীতিমালাও বর্ণনা করা হয়। কর আরোপ করার সময় ঐ সমস্ত নীতি ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত।

১. করের পরিমাণে অস্পষ্ট না থাকা। ২. করের আদায় নীতি সহজ হওয়া যেন কর আদায় করতে জনগণের কষ্টের সম্মুখীন হতে না হয়। ৩. কর সাধ্য মত হতে হবে। রাষ্ট্রের প্রয়োজনের থেকে কম বেশী না হতে হবে। ৪. কর এমন বেশী না হওয়া যেন জনগণ মনে করে আমাদের কারবারের লাভই হচ্ছে না। এর ফলে দেশে উৎপাদন কার্যে প্রভাব পড়ে। ৬. করের পরিমাণ নমনীয় হওয়া, দ্রব্যের দাম ও আয়ের উঠানামার দ্বারা একা একাই পরিবর্তন হবে। বার বার পরিবর্তন করতে হবে না যেমন কোন দ্রব্যের পরিমাণ নির্ধারণ করে কর আরোপ করা অনমনীয়। কিন্তু দামের শতকরা হিসেবে কর নির্ধারণ করলে নমনীয় হবে। দামের পরিবর্তনে করের পরিবর্তন হবে। ৭. করের নীতি এমন না হওয়া যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব সৃষ্টি করে।

কর বহির্ভূত আয় ঃ

কর বহির্ভূত আয় বলতে ঐ সমস্ত আয়কে বুঝায় যা সরকারী, আধাসরকারী দপ্তর থেকে অর্জন হয়। যেমন ঃ রেল, ডাক, ফোন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি থেকে অর্জিত আয়।

ঘাটতি ও ঘাটতি পুরণ

ব্যয় থেকে আয় বিয়োগ করে যা অবশিষ্ট থাকে তাই ঘাটতি। যেমন বাংলাদেশের ২০০২–০৩ সালের বাজেটে (অংক কোটি টাকা)

মোট আয়= ৩৩,০৮৪

ব্যয়= ৪৪,৮৫৪

ঘাটতি= ১১,৭৭০

এই ঘাটতি পূরণ করার জন্য পুজি একত্রিত করাকে ঘাটতি পূরণ বলে (Deficit Financing) বলে।

ঘাটতির যোগানের জন্য সরকার ঋণ গ্রহণ করে।

সরকারী ঋণকে (উৎসের ভিত্তিতে) দু'ভাগে ভাগ করা যায় ;

১. বৈদেশিক ঋণ (Foreign Loans)

২. অভ্যন্তরীণ ঋণ (Internal loans)

১. বৈদেশিক ঋণ (Foreign Loans) সরকার বিদেশী প্রতিষ্ঠান, বিদেশী নাগরিক অথবা অন্য দেশের সরকারের কাছ থেকে যে ঋণ গ্রহণ করেন তাকে বৈদেশিক ঋণ বলে।

২ অভ্যন্তরীণ ঋণ (Internal loans) সরকার দেশের ভেতরে কোন ব্যক্তির আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যে ঋণ গ্রহণ করেন তাকে অভ্যন্তরীন ঋণ বলে।

অভ্যন্তরীন ঋণ আবার দুই প্রকার ঃ

১. ব্যাংক সংক্রান্ত নয় (Non-Banking) অর্থাৎ এমন ঋণ যা জন সাধারণ থেকে গ্রহণ করা হয়। জন সাধারণ থেকে ঋণ নেয়ার জন্য "ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকার পত্র চালু করা হয়। বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সেভিং স্কীমসমুহ এ উদ্দেশ্যে চালু করা হয়েছে। সাধারণ জনগণ সরকারী ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকার পত্র ক্রয় করে। যেমন ঃ প্রাইজ বন্ড,

ন্যাশনাল ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট ঃ

বিশেষ ডিপোজিট সার্টিফিকেট ইত্যাদি। এ সমস্ত **ঋণ পরিশোধের** প্রমাণ পত্রের উপর জন সাধারণকে সুদ দেয়া হয়।

২. ব্যাংক সংক্রান্ত ঋণ (Banking Loan) একেই "নোট ছাপা" দ্বারাও বর্ণনা করা হয়। কিন্তু সরকার বাস্তবে কোন নোট ছাপায় না। কেননা আইনানুযায়ী নোট ছাপার অধিকার সরকারের নাই। এর অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। সরকার ট্রেজারী বিল চালু করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহন করে। এই পরিমাণ টাকা সরকারের একাউন্টে জমা করা হয়। সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকে দুটি প্রকৃতিতে তা পরিশোধ করে।

১. এ পরিমাণ মূল্যের অতিরিক্ত "ট্রেজারী বিল" চালু করা হয়।

২. সরকার বাংলাদেশ ব্যাংককে বলে দেয় যে, আমার একাউন্ট থেকে এ পরিমাণ অর্থ কমিয়ে দাও।

অতঃপর ঋণের তিনটি সীমা থাকে। যা বাজেটে লিখিত থাকে।

(১) স্থায়ী ঋণ (Permanant loan) ঃ ঐ সমস্ত ঋণ যা সরকার সরকারী ঋণ পরিশোধের অঙ্গিকার পত্র এর মাধ্যমে জন সাধারণের নিকট থেকে গ্রহণ করে।

যা পরিশোধ করা হয় না। বরং এই অঙ্গীকার পত্রগুলো দ্বিতীয় বাজারে (Secondary Market) বিক্রয় করা হয়। যেমন প্রাইজ বন্ড ইত্যাদি।

২. ভাসমান ঋণ (Floating Loase) ঐ সমস্ত ঋণ যা কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নেয়া হয়।

৩. স্বল্প মেয়াদী ঋণ (Unfunded Loan) এর দ্বারা ঐ সমস্ত প্রমাণপত্রকে বুঝায় যা স্বল্প মেয়াদের জন্য হয়। যেমন ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট, ন্যাশনাল ডিপোজিট সার্টিফিকেট ইত্যাদি। ঘাটতি পূরণে অভ্যন্তরীণ ঋণের ভূমিকা বেশী। বৈদেশিক ঋণের ভূমিকা তুলনামূলক কম। যেমন ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে যে ঋণ নেয়া হয়েছে তার তালিকা (অংক কোটি টাকা)

অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ঋণ = ১৩৫৮
অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ছাড়া ঋণ = ৪২৩৯
বৈদেশিক ঋণ = ৬১৭৩

মোট ঋণ (মোটঅর্থায়ন) = ১১৭৭০

সুদের মধ্যেও বেশী ভূমিকা অভ্যন্তরীণ ঋণের। বৈদেশিক সুদ এর তুলনায় অত্যন্ত কম। এখন পর্যন্ত সে সমস্ত ঋণ সরকারের দায়িত্বে আদায় আবশ্যক। এর বিস্তারিত বিবরণ (অংক কোটি টাকা)

মোট ঋণ = ১১৭৭০
অভ্যন্তরীণ = ৪,২৩৯
বৈদেশিক = ৬,১৭৩
ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ঋণ = ১,৩৫৮
অভ্যন্তরীণ ঋণের বিবরণ (অংক টাকা কোটি টাকা)
মেয়াদি ঋণ = ৩৯
টি.এন.টি বন্ড= ২০০
নিজস্ব অর্থায়ন = ২০০
প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব স্থানান্তর (নীট)=৩৮০০
বৈদেশিক ঋণের বিবরণ
বৈদেশিক অনুদান = ৩,০৪১
বৈদেশিক ঋণ = ৬১৩৯
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ = ৩০০৭

এ সমস্ত হিসাব নিকাশের দ্বারা বোঝা গেল যে, রাষ্ট্রের মোট আদায়যোগ্য ঋণের বৃহৎ অংশ অভ্যন্তরীণ এবং এককীয়দ্বাংশ বৈদেশিক।

ঘাটতি পূরণের বিকল্প পদ্ধতি

যখন সুদবিহীন অর্থ ব্যবস্থার কথা বলা হয় তখন বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশ সমুহে সবচেয়ে বড় সমস্যা মনে করা হয় যে, যদি সুদের উপর ঋণ নেয়ার পথ বন্ধ করে দেয়া হয় তাহলে বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্য যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ নেয়া হয় এর বিকল্প কি? কেননা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে শেয়ার ও মুদারাবার ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু সরকারের পক্ষে যে সমস্ত ব্যয়ের জন্য ঋণ নেয়ার প্রয়োজন হয় এর মোটা অংশ এমন কাজের জন্য যা লাভজনক নয়। যেমন রাস্তা, পুল, ড্রেন ইত্যাদি তৈরী করা, সামরিক বাহিনীদের জন্য নতুন অস্ত্র তৈরী এ ধরনের অন্যান্য বিভাগ যার উপকারীতা সমস্ত জাতি ভোগ করে। এগুলো থেকে সরকারী কোন আয় নাই। এ প্রশ্নের উত্তরে সর্বপ্রথম কথা হলো বাজেটের ঘাটতি কমানোর জন্য প্রথমে ঐ সমস্ত অপচয়মূলক ব্যয় বন্ধ করা প্রয়োজন যা সর্বদা রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদ থেকে হতেই চলেছে। কোন গরীব দেশে এগুলোর কোনই প্রয়োজন নাই।

তেমনি আমাদের দেশে জুয়াও অধার্মিকতার ভিত্তিতে মোটা অংকের টাকা নষ্ট হয়। যেগুলো বন্ধ করা প্রয়োজন। এর পরও কথা থাকে– যদি অপচয় মূলক ব্যয় সমূহ বন্ধ করা ও অধার্মিক কার্যকলাপ দূর করা সত্ত্বেও দেশের প্রয়োজনে বাজেটের ঘাটতি পূরণ করার জন্য ঘাটতি পূরণের অন্যান্য মাধ্যম অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকে। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে এ উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ সুদের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়। সুদ বন্ধ করলে সরকারের বিভিন্ন প্রয়োজনাদীর জন্য ঘাটতি পূরণের অন্যান্য পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে এগুলোর মধ্যে কয়েকটি বর্ণনা করা হলো।

১. রাষ্ট্রের যে সমস্ত দপ্তর লাভজনক যেমন–টেলিফোন, টেলিগ্রাম বিভাগ। এর ঘাটতি পূরণের জন্য মুদারাবা সার্টিফিকেট চালু করা যেতে পারে, অর্থাৎ যারা এ মুদরাবা সার্টিফিকেট ক্রয় করবে তারা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের লভাংশে যোগান দাতা হিসাবে অংশীদার হবে। এমনি ভাবে কোন রাজপথ অথবা ব্রীজ নির্মাণ করার ক্ষেত্রে এর ব্যবহারে টোল আরোপ করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে এ খাতও লাভজনক হবে এবং এর মধ্যেও মুদারাবা সার্টিফিকেট চালু করা যেতে পারে।

২. যে সমস্ত বিভাগ কোন অবস্থাতেই লাভজনক নয় এর ঘাটতি পূরণের জন্য এমন সুদবিহীন বন্ড চালু করা যেতে পারে যার কোন বিনিময় দেয়া হবে না। তবে এর বাহকদেরকে করের মধ্যে ছাড় দেয়া হবে। করের ছাড়া দেয়াকে বেশীর থেকে বেশী আকর্ষণীয় করে তোলা যেতে পারে। যেহেতু কর সরকারের

কোন ঋণ নয় তাই একে মাফ করে দেয়া বা কমিয়ে দেয়া সুদের আওতাভূক্ত হবে না। সরকার কর আরোপ করা ও কোন ডিপার্টমেন্টকে ছাড় দেয়ার মধ্যে বিভিন্ন কর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করে থাকে। যদি এ কাজকেও সামনে রাখা হয় তাহলে ক্ষতির কি আছে?

৩. এ পদ্ধতিও বিবেচনাধীন যে সরকারকে ঋণ দিয়ে সরকারী ঋণ আদায় অঙ্গিকার পত্র গ্রহণকারী দেরকে তাদের ঋণের উপর শর্ত ও চুক্তিকৃত অতিরিক্ত দেয়া হবে না তবে কখনো কখনো সাধ্যমত কিছু পুরস্কার দেয়া হবে। তবে আইনগত ভাবে কেউ তা দাবী করতে পারবে না। মালেশিয়ায় এ পদ্ধতির উপর কাজ হচ্ছে। যেহেতু এ পদ্ধতিতে পুরস্কার দেয়ার শর্ত করা হয় না, এর ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয় না, পাওয়াও নিশ্চিত নয় এবং ঋণ প্রদানকারীর পক্ষ থেকেও এর দাবী করা হয় না। এজন্য মতবাদ হিসেবে সুদের সংজ্ঞা এর উপর সত্যায়িত হয় না। কিন্তু ব্যাপারটি যখন প্রসিদ্ধ লাভ করবে তখন المعروف كالمشروط। অর্থাৎ কোন ব্যাপার প্রসিদ্ধ হয়ে যাওয়া চুক্তির মতই এ নীতির আওতায় পড়বে। তবে এখানে আরেকটি পদ্ধতি আছে তা হলো এই অতিরিক্ত আদায়কে রাষ্ট্রের সামগ্রীক জাতীয় উৎপাদনের সাথে একত্রিত করা হবে। অর্থাৎ ঋণের মেয়াদের মধ্যে সামগ্রীক জাতীয় উৎপাদনের যে পরিমাণ সংযোগ হবে সেই পরিমাণ সাধারণদের দেয়া হবে। যদি সংযোজন না হয় তাহলে বেশী দেয়া যাবে না। এ পদ্ধতির মধ্যে এখনো আমার ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন দিক পরিপক্ক নয়।

৪. রাষ্ট্রের নিজস্ব সরকারী কাজের জন্য এমনকি সামরিক বাহিনীর জন্যও অনেক মেশিনারীজ জিনিসের প্রয়োজন। এর ঘাটতি পূরণের জন্য ভাড়ার পদ্ধতিও সহজেই গ্রহণ করা যেতে পারে। অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঐ সমস্ত সম্পদ ভাড়ার ভিত্তিতে অর্জন করা যাবে।

৫. এ ছাড়াও বৃহৎ উদ্দেশ্য মূলক পদ্ধতি এমনও হতে পারে যে, সরকার তার ঘাটতি পূরণের জন্য একটি ব্যবসায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করবে। (এ প্রতিষ্ঠান পূর্ণ সরকারীও হতে পারে আধা সরকারীও হতে পার) এই সংস্থা। জনসাধারনের জন্য মুদারাবা সার্টিফিকেট চালু করবে এই সার্টিফিকেটের জন্য মাধ্যমে জনসাধারণের টাকায় সরকার বিভিন্ন কাজে শেয়ার, মুজরবা, ভাড়া এবং মুরা বাহার ভিত্তিতে ঘাটতি পূরণ করবে। যার বিস্তারিত বিবরণ ব্যাংকিং অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে। এর মাধ্যমে যে আয় হবে উহা মুদারাবা সার্টিফিকেট বাহকদের যোগান অনুযায়ী বন্টন করা হবে। এই মুদারাবা সার্টিফিকেট দ্বিতীয় বাজারে ক্রয়-বিক্রয় যোগ্যও হতে পারে। এভাবে সাধারণ জনগণও নিশ্চিত হতে পারে যে, প্রয়োজনে তারা দ্বিতীয় বাজারে বিক্রয় করতে পারে। আবার

সার্টিফিকেট রেখে অংশীদারও হতে পারে। সার কথা হলো বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে এবং উত্তম পদ্ধতি আবিস্কার করা যেতে পারে। এ ছাড়া অভ্যন্তরীন ঋণের এক বড় অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ হয়। এখানে সুদের লেনদেন কেবলমাত্র কাগজের জমা খরচ। একে শেষ করা কোন কষ্ট সাধ্য ব্যাপার নয়। এমনি কেন্দ্রীয় ও প্রদেশিক সরকারের ঋণের লেনদেনেও সুদের কারবার সহজেই বাদ দেয়া যেতে পারে এতে কষ্টের কিছুই নাই। বৈদেশিক ঋণের ব্যাপারে সরকার যদি গুরুত্বসহ চেষ্টা করে তাহলে অন্যান্য দেশ সমুহকেও ঘাটতি পূরণের ইসলামী পদ্ধতির ভিত্তিতে অর্থ যোগানের উপর উৎসাহিত করতে পারে। বৈদেশিক ঋণ প্রদানকারীদের মূল উদ্দেশ্য লাভবান হওয়া। লাভবান হওয়ার পদ্ধতি আদৌ কোন উদ্দেশ্য নয়। এর সাধারণ একটি উদাহরণ হলো–

বর্তমানেও অনেক দেশ ঋণ প্রদানের সময় শর্তারোপ করে যে, মালামাল আমাদের দেশ থেকে ক্রয় করতে হবে। যখন তাদের থেকেই মালামাল ক্রয় করতে হচ্ছে তখন ঋণের পরিবর্তে মালামালকেই মুরাবাহায়ে মুআজ্জালার ভিত্তিতে নেয়াতে ক্ষতি কি? বর্তমানে সমস্ত দুনিয়ায় ঘাটতি পূরণের ইসলামী পদ্ধতিগুলো পরিচিত হতে চলেছে। আই,এম,এফ (I.M.F) এবং বিশ্ব ব্যাংক এর উপর নিয়মতান্ত্রিক রিসার্স হতে চলেছে। এগুলোর মধ্যে কিছু পদ্ধতির সমর্থনে পশ্চিমা লেখকদের প্রবন্ধও প্রকাশ হচ্ছে। আই,এফ,সি, I.F.C (ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন) বিশ্বব্যাংকের সিস্টেমের একটি দপ্তর যা নিরেট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকসমূহ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতির ভিত্তিতে একা একাই লেনদেন করছে। এ সমস্ত অবস্থাবলীতে যদি ইসলামী দেশ সমূহ গুরুত্ব ও যত্ন সহকারে বর্হিদেশের সাথে এই ভিত্তিতে লেনদেন করার চেষ্টা করে তাহলে এর মধ্যে সফলতা কঠিন কিছু নয়।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلٰى نَبِيِّهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

সমাপ্ত